ইমাম আবু জাফর ত্বাহাবী (রহ.) কর্তৃক লিখিত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিস্তারিত আকিদা সম্বলিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ "আকিদাতুত্ ত্বাহাবী" এর প্রামাণ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ স্বরূপ লিখিত এক অনন্য সংকলন

নূরুল লাআ-লী শরহে আকিদাতুত্ ত্বাহাবী

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মাওলানা মুহাম্মদ নিয়ামত উল্লাহ

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

মুহসিন আল জাবির সম্পাদিত

লেখক, গবেষক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

আনোয়ার লাইব্রেরী

[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩; ০১৯১৩৬৮০০১০

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮ ইং, অষ্টম প্রকাশ : ২০১১ ইং

নূরুল লাআ-লী শরহে আকিদাতুত্ ত্বাহাবী

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ❑ মাওলানা মুহাম্মদ নিয়ামত উল্লাহ

প্রকাশক ❑ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব ❑ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ISBN: 978-984-33-3167-0

মূল্য : ১৮০.০০ টাকা

অর্পণ

"দারুল উলূম বরুড়া" কুমিল্লা এর সাবেক মুহাদ্দিস
মরহুম হযরত মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস রহ.

আমার জীবনের প্রথম উস্তাদ ও মুরব্বী। জীবন সত্বার প্রতিটি কনা· যার কাছে চিরঋণী। যিনি আমার মধ্যে বপন করেছেন ইলমী শাজারার বীজ। যাঁর কাছে গেলে মনে হতো 'আশ্রয়ে' এসেছি, যার কাছে বসলে মনে হতো আপন 'শান্তি নিকেতনে' আছি। যার শিক্ষা-দীক্ষা আর 'অনুশাসন' আমাকে গড়ে তোলার পেছনে নিরন্তর চেষ্টা করে গেছে। আর আমি তার প্রতিদানে কৃতজ্ঞ হয়েছি বহুবার। বক্ষমান গ্রন্থটি জান্নাতে দরজা বুলন্দির কামনায় তারই জন্য নিবেদিত।

বিনীত
প্রকাশক
আনোয়ার লাইব্রেরী

প্রকাশকের কথা

ইসলামে আকায়িদের গুরুত্ব কতটুকু তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশুদ্ধ ঈমান-আকিদাই হলো মুসলমানদের অমূল্য সম্পদ। এর ভিত্তিতেই মুসলমানরা পরকালে মুক্তির সনদ লাভ করবে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য স্বীয় ঈমান-আকিদা পরিশুদ্ধ করতঃ এর উপর অবিচল থাকা অবশ্য কর্তব্য। এ কারণেই যুগে যুগে উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থাদী সংকলন করেছেন। তার মধ্যেও ইমাম আবু জা'ফর ত্বহাবী (রহ.) এর 'আকিদাতুত্ ত্বাহাবী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) কর্তৃক সংকলিত আকিদাতুত্ ত্বাহাবীর মর্যাদা আলেম ওলামাদের কাছে লুকায়িত নয়। বৈষয়িক আবশ্যকতা, সামগ্রিক ভাবে গ্রন্থের মান বিবেচনা করে অনেক আগ থেকেই গ্রন্থটি ইসলামী বিশ্বের ইউনিভার্সিটি ও মাদরাসা সমূহের বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। "বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড"ও বালিকা শাখার ফযীলত জামাআতের আক্বীদার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রন্থটিকে সিলেবাসভুক্ত করেছে। এছাড়া বিভিন্ন পুরুষ মাদরাসায় গ্রন্থটি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জটিল বিষয় হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা ভালো ব্যাখ্যাগ্রন্থের অভাবে কেতাবের মর্ম উদ্ধার করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে দেখা যায়। বিষয়টি লক্ষ্য করে স্বনামধন্য মুহাক্কিক আলেম, বহু গ্রন্থ প্রণেতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ সাহেব বাংলা ভাষায় অত্যন্ত চমৎকার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তিনি এতে কোরআন হাদিসের আলোকে প্রতিটি আকিদা দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা আনোয়ার লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করার দায়িত্ব পেয়ে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছি। আশা করি গ্রন্থটি ছাত্র/শিক্ষক সকলের উপকার বয়ে আনবে। বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
শিক্ষক, জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম
ফরিদাবাদ, ঢাকা।

আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তা'লীম এর সম্মানিত সভাপতি, শায়খুল মাশায়িখ, হযরত আল্লামা আব্দুল করীম (শায়খে কৌড়িয়া) সাহেব (দা.বা.) এর

বাণী ও দোয়া

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

বিশুদ্ধ ঈমান আকিদাই মুসলমানদের পরকালে নাজাতের একমাত্র ওসিলা। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য সর্বপ্রথম নিজ নিজ ঈমান আকিদা ঠিক করিয়া নেওয়া এবং তার ওপর অনড় থাকা।

আদিকাল হইতেই মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এসম্পর্কে অনেক কেতাবাদি লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) লিখিত "আকিদাতুত্ ত্বাহাবী" খুবই মূল্যবান এক কেতাব।

উমরপুর জামিআ ইসলামিয়া আনোয়ারুল উলূম এর মুহাদ্দিস মাওলানা নিয়ামত উল্লাহ সাহেব কর্তৃক লিখিত উক্ত কেতাবের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আশা করি ইহাতে সকল স্তরের মুসলমানরাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিস্তারিত আকিদার ওপর অবগত হইতে পারিবেন।

দোআ করি, আল্লাহ পাক মাওলানার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাহাকে আরো অধিক দীনী খেদমত করার তাওফিক দান করুন। আর এগুলোকে পরকালে নাজাতের ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করুন। আমিন।

আহকর মুহাম্মদ আব্দুল করীম

২৯-১১-১৪১৮ হিজরী

উপমহাদেশের প্রখ্যাত শায়খুল হাদিস, আলেমকুল শিরোমনি, কুদওয়াতুস্ সালেকিন, যুবদাতুল আরেফিন, উস্তাযুল মুহাদ্দিসিন, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের সম্মানিত সভাপতি, শায়খুল হাদিস আল্লামা নূর উদ্দীন আহমদ গহরপুরী সাহেব (দা.বা.) এর

বাণী ও দোয়া

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

ইসলাম ধর্মে আকিদা ঠিক হওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সর্বাগ্রেই স্বীয় আকিদা ঠিক করে নেয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ বিষয় সম্পর্কে ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) এর "আকিদাতুত্ ত্বাহাবী" খুবই মূল্যবান একখানা কেতাব। আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা মুহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ কর্তৃক উক্ত কিতাবে বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখে আমি আনন্দিত হলাম। আশা করি উক্ত গ্রন্থখানা বাংলাভাষা-ভাষী (সর্বস্তরের) মুসলমানদের জন্য খুবই উপকারী হবে।

দোআ করি আল্লাহ পাক তার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন ও তাকে আরো অধিক দীনী খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফিক দান করুন এবং তার এ খেদমতকে পরকালে নাজাতের উসিলা হিসাবে গ্রহণ করুন। আমিন।

আরজগুজার

মোঃ নূর উদ্দীন আহমদ

খাদেম, জামেয়া ইসলামিয়া হুসাইনিয়া

গহরপুর, সিলেট

তাং ২৯/০১/১৯৯৮ ইং

সরকারী আলিয়া মাদরাসা সিলেট এর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, সহকারী অধ্যাপক, হাফেজ মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব এর

মূল্যবান অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

বিশুদ্ধ ঈমান-আকিদাই হলো মুসলমানদের অমূল্য সম্পদ, এর ভিত্তিতেই তারা পরকালে নাজাতের সনদ লাভ করবে, তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য নিজ নিজ ঈমান-আকিদা বিশুদ্ধ করে এর ওপর অটল থাকা এবং অন্তরে কোনো ধরনের বাতিল আকিদার স্থান না দেয়া। এ কারণে প্রত্যেক যুগেই সত্যিকারের আলিমগণ এ বিষয় সম্পর্কে অনেক মূল্যবান কেতাবাদি লিখে গেছেন, তার মধ্যে ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) এর "আক্বীদাতুত্ ত্বাহাবী" অত্যন্ত মূল্যবান একখানা কেতাব।

উমরপুর মাদরাসার মুহাদ্দিস, মাওলানা নিয়ামত উল্লাহ সাহেব উক্ত কেতাবের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোরআন-হাদিসের মাধ্যমে প্রত্যেকটি আকিদাকে নির্ভুল প্রমাণিত করেছেন। দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আমি মনে করি এতে তিনি বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানগণকে অত্যাধিক উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আশা করি এ থেকে সর্বস্তরের মুসলমানগণ খুবই উপকৃত হবেন।

দোয়া করি আল্লাহ পাক মাওলানার প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং আরো অধিক দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দেয়ার সুযোগ দান করুন এবং এগুলোকে পরকালে নাজাতের ওছিলা হিসেবে গ্রহণ করুন। আমিন।

হাফেজ মোঃ জিল্লুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক
সরকারী আলিয়া মাদরাসা, সিলেট

তাং ০৮/০২/১৯৯৮ ইং

জামেয়া ইসলামিয়া আনওয়ারুল উলূম উমরপুর এর শায়খুল হাদিস, গহরপুর জামেয়ার উজ্জ্বল নক্ষত্র সমূহের অন্যতম এক নক্ষত্র হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হবিগঞ্জী এর

সুচিন্তিত মতামত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى

سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

মানুষের জন্য আখেরাতে নাজাত ও মুক্তির একমাত্র পাথেয় হলো বিশুদ্ধ আকিদা, অর্থাৎ প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা পোষণ করা। উক্ত আকিদা সম্পর্কে আমাদের ইমাম আবু হানীফা (রহ.) "ফিকহে আকবার" নামক কেতাব লিখেছেন। অতঃপর আবু মনছুর মাতুরুদী ও আবুল হাসান আশয়ারী (রহ.) এর যুগ হতে অনেক কেতাবাদি লেখা হয়েছে। তার মধ্যে ফিরকায়ে নাজিয়া (নাজাতপ্রাপ্ত দল) এর আকিদার উল্লেখযোগ্য ও অন্যতম কেতাব ইমাম আবু জাফর ত্বাহাবী (রহ.) কর্তৃক লিখিত "আকিদাতুত্ ত্বাহাবী"।

এই কেতাবের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উমরপুর জামেয়ার অন্যতম মুহাদ্দিস জনাব মাওলানা নিয়ামত উল্লাহ্ সাহেব কর্তৃক লিখিত গ্রন্থখানা দেখে অত্যন্ত খুশি হলাম। আশা করি এর দ্বারা উলামা ও তালাবা এবং বাংলা ভাষাভাষী জন সাধারণের বিশেষ ফায়দা হবে।

আল্লাহ পাক মাওলানা সাহেবের উক্ত খেদমতকে কবুল করুন এবং এরূপ আরও দীনী খেদমতের তাওফিক দান করুন। আমিন।

মাওলানা আব্দুল মালেক হবিগঞ্জী
খাদেমুল হাদিস
জামেয়া আনওয়ারুল উলূম
উমরপুর বাজার, বালাগঞ্জ সিলেট

তাং ১৫/০২/১৯৯৮ ইং

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَلَّغَ جَمِيْعَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ الَّذِيْنَ قَامُوْا عَلَى الْهِدَايَةِ وَالْيَقِيْنِ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ.

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতিকে সর্বশ্রেষ্ট ও সম্মানিত বানিয়েছেন। আবার এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এ স্বীকৃতি প্রদানের একমাত্র কারণ, তাদের অন্তরে বিশুদ্ধ ঈমান-আকিদা বিদ্যমান থাকে। আর এটাই মুসলমানদের অমূল্য সম্পদ। যেহেতু এর বিশুদ্ধতার ভিত্তিতেই পরকালে জান্নাতের ফয়সালা হবে। একমাত্র নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা (রা.) তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঈমান-আকিদাই বিশুদ্ধ।

অতএব প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য, স্বীয় ঈমান-আকিদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রা.) তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ঈমান-আকিদা মুতাবেক গঠন করা এবং এর ওপর অটল থাকা।

এ কারণে ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) প্রায় এগারশতো চল্লিশ বছর আগে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিস্তারিত আকিদা স্বীয় কেতাব 'আকিদাতুত্ ত্বাহাবী' তে লেখে গেছেন। কেতাবটি আকারে অতি ছোট হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান যুগে মুসলমানদের ঈমান-আকিদার ওপর চতুর্দিক থেকে আক্রমণ আসছে। তাই এ নাজুক সময়ে উক্ত কেতাবখানা পড়ে বুঝে নেয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত কর্তব্য হেতু আমাদের সচেতন উলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দীন এই কেতাবখানা কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের পাঠ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও মঙ্গল দান করুন।

উল্লেখিত কেতাবটি আরবি ভাষায় রচিত হওয়ায় বাংলা ভাষা-ভাষী সর্বস্ত রের মুসলমানদের জন্য (এ থেকে) উপকৃত হওয়া খুবই দুষ্কর। তাই আমি নগণ্য উক্ত কেতাবের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লেখে ইসলাম এবং মুসলমানদের

দীনি খেদমতে শরিক হতে চাই এবং পরকালে নাজাতের ওছিলা হিসেবে আল্লাহর দরবারে পেশ করতে চাই। আল্লাহ তায়ালা আমি অধমের এ নগণ্য খেদমতকে কবুল করুন।

ইতিপূর্বে এ কেতাবখানা বোর্ডের পাঠ্য সূচিতে না থাকায় অনেক আলেম সাহেবান উক্ত কেতাবের নামই শোনেননি। কেউ কেউ নাম শোনলেও কেতাবখানা দেখার সুযোগ পাননি। আমি তাঁদের কাছে এই কেতাবখানা দেখার আবদার রাখছি। ইনশাআল্লাহ এতে তারা খুবই উপকৃত হবেন।

আমি উক্ত কেতাবের মূল আরবী এবারত লেখে এর বিশুদ্ধ বাংলা অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা করার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি এবং প্রত্যেকটি আকিদা কোরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত করা এবং সংক্ষিপ্তভাবে বাতিল সম্প্রদায়ের মতামত পেশ করে তা খণ্ডন করার চেষ্টা করেছি।

এতে দলীল প্রমাণ হিসেবে কোরআন কারিমের যে সব আয়াত পেশ করেছি এগুলোর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির নির্ভরযোগ্য তাফসিরসমূহ থেকে পেশ করার চেষ্টা করেছি। হাদিসগুলো সেহাহ সিত্তার কেতাব থেকে এনেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এর বাংলা অনুবাদও করেছি। এ কাজে সর্বাধিক সহায়তা পেয়েছি বিশ্ব বিখ্যাত আরবী ইউনিভার্সিটি দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম অধ্যক্ষ হাকিমুল ইসলাম, খতিবে জামান, আধ্যাত্মিক রাহবর, হযরত কারী তৈয়্যব সাহেব (রহ.)-এর হাশিয়া (টীকা) কৃত মাকতাবায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত আকিদাতুত্ ত্বাহাবী থেকে। (আল্লাহ তায়ালা হযরতের কবরে রহমতের বারি বর্ষাণ)

মানুষ থেকে ভুল-ক্রটি হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থে আমার কোনো ধরনের ভুল-ক্রটি পাঠকবৃন্দের সামনে পরিলক্ষিত হলে আমাকে অবগত করার আবদার করছি। ইনশাআল্লাহ আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা সুদরানোর চেষ্টা করবো।

উক্ত পুস্তিকা রচনায় বা প্রকাশনায় আমাকে যারা এ ধরনের সহায়তা করেছেন, আমি দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও মঙ্গল দান করুন এবং এটাকে আমাদের জন্য পরকালের নাজাতের ওছিলা হিসেবে গ্রহণ করুন। আমিন।

মোঃ নিয়ামত উল্লাহ
সাং বানিকান্দি (মধুখালী)
পোঃ সিরাজগঞ্জ বাজার
ছাতক, সুনামগঞ্জ (সিলেট) বাংলাদেশ।

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ৪
শ্রদ্ধাভাজন পীর, মাশায়িখগণের অমূল্য বাণী ও দোয়া ৫
অনুবাদকের কথা ৯
ইমাম ত্বাহাবী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১৫
কেতাবের অগ্রকথা ১৭
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং তাদের বিশেষ গুণাবলী ১৮
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশেষ গুণাবলী ১৮
বাতিল ও ভ্রান্ত দলসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাদের ভ্রান্ত আকিদাসমূহ কি? ১৯
আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে আকিদা ২২
আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই ২২
আল্লাহর সাদৃশ্য কোনো কিছু নেই এবং তিনি অক্ষম নন ২৫
আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই ২৬
আল্লাহ অনাদি ও অনন্ত ২৮
আল্লাহ অক্ষয়, তাঁর কোনো ধ্বংস নেই ২৯
মানুষের ধ্যান-ধারণা আল্লাহকে উপলব্ধি করতে পারে না ৩০
আল্লাহর সত্তা নমুনাহীন, চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব ৩২
আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও রিজিকদাতা ৩৫
একটি প্রশ্ন এবং তার জবাব ৩৬
আল্লাহই মৃত্যু দানকারী ও পুনরুত্থানকারী ৩৯
আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টির আগ থেকেই সর্বকালের সর্বাবস্থায় সর্বগুণে গুণান্বিত ৪১
আল্লাহ আগ থেকেই নিজ গুণে গুণান্বিত ৪৩
আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশীল ৪৫
আল্লাহই সব বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন ৪৫
কোনো বস্তু আল্লাহ থেকে গোপন নয় ৪৯
আল্লাহ আনুগত্যের আদেশ দেন এবং নাফরমানী থেকে নিষেধ দেন ৫০
সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয় ৫২
আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেন ৫৩
আল্লাহর সিদ্ধান্তই অটল থাকে এর কোনো পরিবর্তনকারী কেউ নেই ৫৬
আল্লাহ সব সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বীসমূহের উর্ধ্বে? ৫৮
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী সম্পর্কে আকিদা ৬০
নবী রাসূল সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় ৬৪
নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সংজ্ঞার) মধ্যে পার্থক্য ৬৬
খতমে নবওয়ত বা নবুওতের সমাপ্তি সম্পর্কে আকিদা ৬৭
নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত্তাকীগণের ইমাম ৭১

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলদের সর্দার এবং আল্লাহর হাবীব . ৭২
শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোনো ধরনের
নবুওতের দাবিদার ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট ৭৪
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সমগ্র সৃষ্টির নবী ছিলেন? ৭৫
কোরআন সম্পর্কে আকিদা ৭৮
কোরআন আল্লাহর কালাম এবং তাঁর পক্ষ থেকে ওহি হিসেবে অবতীর্ণ ৭৮
যারা পবিত্র কোরআনকে আল্লাহর কালাম মানে না তারা কাফির ৮২
আল্লাহকে যে কোনো ব্যাপারে মানুষের গুণের সঙ্গে তুলনা দেয়া বৈধ নয় ৮৪
আল্লাহর দিদার সম্পর্কে আকিদা ৮৬
পরকালে আল্লাহর দিদার লাভ হবে ৮৮
আল্লাহর দিদার সম্পর্কে ঈমান সঠিক রাখতে হলে কি করা কর্তব্য? ৮৯
আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে আকিদা ৯২
আল্লাহর সত্তা সীমা-পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঊর্ধ্বে ৯৩
একটি প্রশ্ন এবং এর উত্তর ৯৫
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ ও ইসরা সম্পর্কে আকিদা ৯৭
মেরাজ ও ইসরার পার্থক্য ৯৭
মেরাজ স্বশরীরে হয়েছিলো না রূহানীভাবে? ৯৯
একটি প্রশ্নের সমাদান ১০০
ইসরা ও মেরাজের ঘটনা কবে ঘটেছিলো? ১০১
হাউজে কাওছার সম্পর্কে আকিদা ১০২
শাফাআত সম্পর্কে আকিদা ১০৩
আল্লাহর ওয়াদা সম্পর্কে আকিদা ১০৪
কয়েকটি প্রশ্নের জবাব ১০৫
জান্নাতী এবং জাহান্নামীদের সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নন ১০৬
আল্লাহ বান্দার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত ১০৭
তাকদির সম্পর্কে আকিদা ১০৯
সৌভাগ্যবান ও হতভাগ্য কে? ১০৯
তাকদির বলতে কি বোঝায়? ১১০
তাকদির সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নয় ১১২
লাওহে মাহফুজ এবং কলম সম্পর্কে আকিদা ১১৫
লাওহে মাহফুজ বলতে কি বোঝায় ১১৬
কলম বলতে কি বোঝায়? ১১৬
কলম দ্বারা কোন্ কলম উদ্দেশ্য ১১৭
মানুষের ভাগ্যে লিখিত সবকিছুই তার ওপর আসে ১১৮
আল্লাহ সৃষ্টি করা ব্যতীত কোনো কিছু সৃষ্টি হয় না ১২১
তাকদির অস্বীকারকারীরা কাফির ১২৩

আল্লাহর আরশ ও কুরসি সম্পর্কে আকিদা............১২৪
আরশ ও কুরসির হাকিকত............১২৪
হযরত ইব্রাহীম (আ.) খলিলুল্লাহ এবং হযরত মূসা (আ.) কালিমুল্লাহ ছিলেন............১২৭
আল্লাহর ফেরেশতা ও নবী এবং কেতাবসমূহ সম্পর্ক আকিদা............১২৮
মুসলমানদের কেবলা বিশ্বাসীকে মুসলমান বলার সীমা কতটুকু............১২৯
আল্লাহ ও তাঁর দীন এবং কোরআন নিয়ে ঝগড়া করা যাবে না............১৩০
পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কিভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা কর্তব্য............১৩২
কতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুসলমানকে কাফির বলা যাবে না............১৩৪
মুমিনের জন্য কর্তব্য আল্লাহর রহমত আশাবাদী হওয়া এবং আজাব থেকে নিশ্চিত না হওয়া............১৩৬
কারো সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জান্নাত বা জাহান্নাম সাক্ষ্য প্রদান করা যাবে না............১৩৮
আল্লাহর আজাব থেকে নিশ্চিত নির্ভীক হওয়া এবং রহমত থেকে নিরাশ হওয়া ইসলামের বহির্ভূত............১৪১
দীনের কোনো বিধান অস্বীকার করা ব্যতীত কেউ ঈমান থেকে বের হবে না............১৪৩
ঈমান সম্পর্কে আলোচনা............১৪৪
ঈমানের সংজ্ঞা............১৪৪
মুমিনগণ আল্লাহর ওলি............১৪৮
কোন্ কোন্ বিষয়াদির ওপর ঈমান রাখা অত্যাবশ্যকীয়............১৪৯
কবিরাহ গুনাহ্গার মুমিন জাহান্নামে চিরকাল থাকবে না............১৫২
সব মুমিনের পেছনে নামাজ পড়া বৈধ............১৫৫
অকাট্যভাবে কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যাবে না............১৫৭
কোনো মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়............১৫৯
আমিরের প্রতি বিদ্রোহ করা বৈধ নয়............১৬১
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য............১৬৩
ন্যায় পরায়ণ আমিরের প্রতি ভালোবাসা, আর জালিমের প্রতি বিদ্বেষ রাখা কর্তব্য..১৬৬
মোজার ওপর মাসেহ করা সম্পর্কে আকিদা............১৬৮
হজ এবং জেহাদ সম্পর্কে আকিদা............১৭০
পরকাল সম্পর্কে আলোচনা............১৭৩
কেরামান কাতেবিনের প্রতি আকিদা............১৭৩
মৃত্যুর ফেরেশতার প্রতি আকিদা............১৭৪
মালাকুল মওত সম্পর্কে কিছু কথা............১৭৪
কবরের আজাব সম্পর্কে আকিদা............১৭৫
কবর স্বর্গ বাগিচা অথবা নরক গর্ত হবে............১৭৮
মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া, আমলের প্রতিদান, হিসাব-নিকাশ ও আমলনামা পাঠ সম্পর্কে আকিদা............১৭৯
সাওয়াব ও শাস্তি প্রদান সম্পর্কে আকিদা............১৮২

পুলসিরাত সম্পর্কে আকিদা ১৮৫
মিজান সম্পর্কে আলোচনা ১৮৭
হাশরের মাঠে স্বশরীরে পুনরুত্থান সম্পর্কে আকিদা ১৮৯
জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়টাই সৃষ্ট এবং বর্তমান বিদ্যমান আছে ১৯৩
জান্নাত এবং জাহান্নামের অধিবাসীরা আগ থেকে নির্ধারিত ১৯৫
ভালো-মন্দ সবকিছুই বান্দার জন্য নির্ধারিত ১৯৭
আল্লাহ তায়ালাই বান্দাকে ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রদান করেন ১৯৮
বান্দার কাজ-কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্ট এবং বান্দার উপার্জন ২০০
আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কেউ গোনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না ২০২
সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছানুসারে সংঘটিত হয় ২০৩
বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় ২০৪
আল্লাহ তায়ালা পবিত্র এবং নির্দোষ ২০৭
দোয়া সম্পর্কে আকিদা ২০৮
আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর মালিক, তাঁর মালিক কোনো কিছু নয় ২১১
আল্লাহ তায়ালার ক্রোধও সন্তুষ্ট সম্পর্কে আকিদা ২১২
সাহাবা (রা.) সম্পর্কে আলোচনা ২১৪
সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা রাখা সম্পর্কে আকিদা ২১৪
সাহাবিগণের সঙ্গে ভালোবাসা রাখা কর্তব্য ২১৮
খেলাফত সম্পর্কে আকিদা ২২১
সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ২২১
দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) ২২৪
তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) ২২৫
চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) ২২৬
আশারায়ে মুবাশ্বারাহ সম্পর্কে আকিদা ২২৮
সাহাবা সম্পর্কে মন্তব্য করা যাবে না ২২৯
আল্লাহর ওলিগণ সম্পর্কে আকিদা এবং নবী ও ওলির মধ্যে পার্থক্য ২৩৩
ওলিগণের কেরামত সম্পর্কে আকিদা ২৩৪
কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে আকিদা ২৩৫
গণক, জ্যোতিষ এবং কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী, কোনো কিছুর দাবিদারদের সম্পর্কে আকিদা ২৩৮
মুসলমানগণ সম্মিলিত থাকা কর্তব্য, পরস্পর দলাদলি করা বিভ্রান্তি ২৪০
আল্লাহর দীন সম্পর্কে আকিদা ২৪৩
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা ২৪৮
সত্যের ওপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা কর্তব্য ২৪৯
পরিশেষে আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পেশ করা কর্তব্য ২৫১

بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيْهُ عَلَمُ الْاَنَامِ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ اَبُوْ جَعْفَرَ الْوَرَّاقُ الطَّحَاوِيُّ الْمِصْرِيُّ رَحْمَةُ اللهِ.

অনুবাদ : শায়খুল ইমাম, ফকীহ, সৃষ্টির প্রতীক ইসলামের প্রমাণ আবু জাফর আল-ওয়াররাক, আতত্বাহাবী মিশরী বলেন,

قال الشيخ الخ : রচনার এ অংশটুকু ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) স্বহস্তে লেখেননি। যেহেতু পুণ্যাত্মা আলিমদের কাছে প্রশংসা নিজে করা নিন্দনীয়, বিধায় তারা তাঁদের লেখনীতে স্বীয় নাম প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেননি।

اَبُوْ جَعْفَرَ الْوَرَّاقُ الطَّحَاوِيُّ

ইমাম ত্বাহাবী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

তাঁর নাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ, পদবিযুক্ত নাম আবু জাফর। তিনি ইমাম ত্বাহাবী নামে খ্যাত। তিনি মিশরের ত্বাহা নামক স্থানে ১১ই রবিউল আউয়াল, ২৩৮/৩৯ হিজরীতে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ত্বাহাবীকে ত্বাহা নামক গ্রামের প্রতি সম্পর্কিত করে ত্বাহাবী বলা হয়। এটি নীল নদের অববাহিকার পশ্চিমকূলের উচ্চভূমির উক্ত এলাকায় অবস্থিত। কিন্তু ত্বাহাবীর জন্মস্থান প্রকৃতপক্ষে ত্বাহা গ্রামের নিকটবর্তী দশঘর বিশিষ্ট একটি ছোট গ্রাম, যার নাম 'তাহতুত' সে হিসেবে তাঁকে তাহ্‌তুতী বলা উচিৎ। কিন্তু তিনি নিজে এ নামটি পছন্দ করতেন না বলেই তাঁকে ত্বাহাবী বলা হয়ে থাকে। তিনি অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন বালক ছিলেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পিতা বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মুহাম্মদ (রহ.)-এর শিক্ষাগারে সম্পন্ন হয়। তাঁর মেধা শক্তির বড় প্রমাণ হচ্ছে, ২৫২ হিজরীতে ১৩ বছর বয়সে বালক ত্বাহাবী স্বীয় মামা জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মুযানীর কাছে ইমাম শাফিয়ীর মুসনাদ অধ্যায়ন করেন।

তিনি যেমন মেধাবী তেমনি ছিলেন তেজস্বী। স্বীয় মাতুলের শিক্ষাঙ্গন থাকা কালিন একবার কোনো একটি মাসআলার সদুত্তর দিতে না পারায় মামা ভৎসনা

করে তাঁকে বলেন– আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা কিছুই হবে না। এই সামান্য স্নেহমাখা তিরস্কার ও ত্বাহাবীর সহ্য হয়নি। তাই তিনি শাফিয়ী মাযহাব বর্জন করে, আবু জাফর ইবনে আবু ইমরান (রহ.)-এর কাছে যান। সেখানে তিনি হানাফী ফিকাহ্ শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। হানাফী ফিকাহ্ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের পর, হাদিস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তদানীন্তন স্বনামধন্য হাদিস বিশারদদের কাছে হতে হাদিস অধ্যয়ন পূর্বক হাদিস শাস্ত্রে আলী সনদ অর্জনে সক্ষম হন।

শিক্ষাজীবন শেষে ইমাম ত্বাহাবী কর্মজীবনে শিক্ষকতার কাজকে বেছে নেন। সে যুগের অন্যান্য শিক্ষকের ন্যায় তিনিও শিক্ষকতার সঙ্গে গ্রন্থ রচনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। যেমন আহকামুল কোরআন, হাদিস, ফিকাহ, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়াদি সম্পর্কে রচনা করেছেন। ইমাম ত্বাহাবী (রহ.)-এর রচিত গ্রন্থাবলীর দ্বারাই তাঁর জ্ঞানের প্রশস্থতার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর রচিত– 'মুখতাছারু ত্বাহাবী, অধ্যায়ন করলে প্রমাণিত হয়, তিনি হানাফী মাযহাবের শুধু একজন মুকাল্লিদই ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদ ও মুন্ত াসিব। কারণ তিনি এই গ্রন্থে এমন বহু মাসআলার ব্যাপারে নিজস্ব মতামতের অবতারণা করেছেন, যা হানাফী মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর এ কারণে হানাফী ফকীহগণের কাছে এই গ্রন্থটির তেমন চর্চা ও খ্যাতি নেই।

ইমাম ত্বাহাবী (রহ.)-এর বহু গ্রন্থের মধ্যে যে গ্রন্থটি তাকে যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় করে রেখেছে, সেটি হলো, শরহে মা-য়ানিল আছার। তাঁর এই বৈচিত্রময় গ্রন্থটির জন্যই তাঁকে হাফেজুল হাদিস ও মুজতাহিদ খেতাবে ভূষিত করা হয়। আল্লামা সুয়ূতী তাঁর হুস্‌নুল মুহাজারা গ্রন্থে তাঁকে হাফিজুল হাদিসের মধ্যে গণ্য করে বলেছেন, আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা মাসলামা আল-আযদী, আল-হানাফী ছিলেন একজন মহাজ্ঞানী ইমাম, হাফেজ এবং অভিনব গ্রন্থাদির রচয়িতা। 'শরহে মায়ানিল আসারের' প্রকৃত মূল্যায়ন এবং হাদিস শাস্ত্রে তাঁর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও স্বাধীন চিন্ত ার নায়ক ইমাম ইবনে হাযম জাহিরী আল-আন্দালুসী যে মন্তব্য করেন তা নিশ্চয়ই প্রণিদানযোগ্য। তিনি এই গ্রন্থটিকে আবূ দাউদ ও নাসায়ীর সম-মর্যাদা সম্পন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। সহীহ বোখারী শরিফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বদরুদ্দীন আল-আইনী কোরআন ও হাদিস থেকে ইস্তেমবাত ও মাসয়ালা বের করার ক্ষেত্রে ইমাম ত্বাহাবী (রহ.)-এর গভীর জ্ঞান এবং হাদিস ও রিজাল শাস্ত্রে তার অনন্য সাধারণ প্রজ্ঞা ও প্রতিভা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন : পূর্ববর্তী সব হাদিস বেত্তা ও ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, পবিত্র

কোরআন ও হাদিস হতে ইস্তেমবাতের ক্ষেতে ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) ছিলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। হাদিস বর্ণনা ও রিজাল শাস্ত্রে এমন একজন ইমাম যিনি বোখারী, মুসলিম ও সুনান গ্রন্থ রচয়িতাদের মতো সাবিত- সুপ্রতিষ্ঠিত ছিকাহ- বিশ্বস্ত এবং হুজ্জত রূপে পরিগণিত।

ইমাম ত্বাহাবী (রহ.)-এর অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম হলো 'আকিদাতুত্ ত্বাহাবী' গ্রন্থটি আকারে অতি ছোট হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই-তো এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক আলিমগণ কর্তৃক বিরাট পুস্তক রচিত হয়েছে। ইসলামে আকিদার গুরুত্ব যে কত বেশি তা হয়তো কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। মূলোৎপাটিত বৃক্ষের গোড়ায় পানি সিঞ্চন করলে যেমন কোনো ফলোদয় হয় না, ঠিক তেমনি আকিদা দুরুস্থ্ না হলে সব আমলই হবে অনর্থক ও বৃথা। তাই আকিদার দুরুস্তেগী সর্বাগ্রে হওয়া উচিত। আর আকিদা দুরুস্ত করার জন্য ইমাম ত্বাহাবী (রহ.)-এর এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি যে কতটুকু মূল্যবান তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব ইমাম ত্বাহাবী আজীবন দীনি খেদমতে নিয়োজিত থেকে ৮২ বছর বয়সে ৩২১ হিজরী জিলকদ মাসের চাঁদনী রাতে ইন্তেকাল করেন।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ سَقَى اللّٰهُ ثَرَاهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ

কেতাবের অগ্রকথা

هٰذَا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيْدَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلٰى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتِ الْكُوْفِىِّ وَاَبِىْ يُوْسُفَ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الْاَنْصَارِىِّ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا اَجْمَعِيْنَ وَمَا يَعْتَقِدُوْنَ مِنْ اُصُوْلِ الدِّيْنِ وَيَدِ يْنُوْنَ بِهٖ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ–

অনুবাদ : এটা ফুকাহায়ে মিল্লাত, আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবিত আল-কুফী, আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম আল আনছারী এবং আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশশায়বানী (রহ.) (ইমামত্রয়)-এর পরিগৃহীত নীতি অনুসারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা এবং তারা ইসলাম ধর্মের নীতিসমূহের প্রতি যে আকিদা বা বিশ্বাস স্থাপন করতেন এবং যেসব নীতি অনুসারে তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মনোনীত ধর্ম– ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে পালন করতেন তার বিবরণ।

هٰذَا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيْدَةِ الخ : এই কেতাবের নাম 'বয়ানুস সুন্নাহ' যা আকিদাতুত্ ত্বাহাবী নামে খ্যাত। কিছু সংখ্যক উলামা বলেছেন, এই কেতাবের পুরো নাম হলো, 'আকাইদে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ আলা ফুকাহায়িল মিল্লাহ।'

بَيَانُ عَقَائِدِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلٰى فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং তাদের বিশেষ গুণাবলী

এখন প্রশ্ন হতে পারে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কারা? এর সঠিক উত্তর হলো, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মতো ও পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন, অন্য কথায় যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবা (রা.)-এর সুন্নাতের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করেন। যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اِنَّ بَنِىْ اِسْرَا ئِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى اِثْنَتَىْ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَسَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَّ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ.(رواه التر مذى)

নিশ্চয় বনি ইসরাইল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিলো, আর শীঘ্রই আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একদল ব্যতীত সবই জাহান্নামি বলে গণ্য হবে। সাহাবিগণ (প্রশ্ন করে) বললেন, ওই দলটি কারা? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি উত্তরে বললেন, যে দল আমি এবং আমার সাহাবি (রা.)দের মতো ও পথের ওপর অটল থাকবে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশেষ গুণাবলী : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকবে, তাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে গণ্য করা যাবে। (১) শায়খাইন (আবু বকর ও ওমর (রা.)কে সমস্ত সাহাবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করা। (২) উভয় জামাতা (উসমান ও আলী (রা.)কে সম্মান প্রদর্শন করা। (৩) উভয় কিবলা (কাবা শরিফ ও বায়তুল মুকাদ্দাসকে শ্রদ্ধা করা। (৪) মুত্তাকী ও নাফরমান উভয় ব্যক্তির জানাযায় শরিক হওয়া। (৫) নেককার ও পাপী উভয়

ইমামের মধ্যে যে কোনো জনের পেছনে নামাজ পড়া। (৬) ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধান ন্যায়পরায়ণ বা জালিম। উভয় ইমামের মধ্যে কারো বিরুদ্ধাচরণ না করা। (৭) (চামড়ার) মোজার ওপর মাছেহ করা। (৮) তাকদিরের ভালো-মন্দ উভয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখা। (৯) নবী (আ.) ও সাহাবা (রা.) ব্যতীত কারো সম্পর্কে জান্নাত বা জাহান্নামের সাক্ষ্য প্রদান করা থেকে বিরত থাকা। (১০) উভয় ফরজ (নামাজ ও জাকাত) আদায় করা।

উল্লেখিত গুণাবলীর ওপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বৈশিষ্ট্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং এগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রধান প্রধান নিদর্শনসমূহ। নতুবা আল্লাহর দিদার এবং কবর জগতের অবস্থা বিশ্বাস করাটাও আহলে সুন্নাহর নিদর্শন হিসেবে গণ্য।

বাতিল ও ভ্রান্ত দলসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাদের ভ্রান্ত আকিদাসমূহ কি?

বাতিল বা পথভ্রষ্ট দলসমূহ আসলে ছয় ভাগে বিভক্ত :

(১) রাওয়াফিজ, (২) খাওয়ারিজ, (৩) জাবরিয়াহ, (৪) ক্বাদরিয়াহ, (৫) জাহমিয়াহ, (৬) মুরজিয়াহ। আবার প্রত্যেক দলই বারোটি উপদলে বিভক্ত হয়েছে।

রাওয়াফিজদের আকিদাসমূহ হলো : (১) আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। (২) একমাত্র আলী (রা.) ব্যতীত বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবি (রা.)গণকে বিশেষত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), উমর ফারুক (রা.), তালহা (রা.), জুবাইর (রা.)সহ সবাইকে গালমন্দ বা সমালোচনা করা, (৩) ফাতেমা (রা.)কে মা আয়েশা (রা.)-এর ওপর প্রাধান্য দেয়া, (৪) এক শব্দে তিন তালাক পতিত হওয়াকে অস্বীকার করা, (৫) নামাজের জন্য একামত ও জামাআত সুন্নাত হওয়াকে অস্বীকার করা, (৬) মোজার ওপর মাছেহ করাকে অস্বীকার করা, (৭) তারাবিহর নামাজ অস্বীকার করা, (৮) নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রাখাকে অস্বীকার করা, (৯) মাগরিবের নামাজের জন্য তাড়াহুড়া করাকে অস্বীকার করা, (১০) রোজার ইফতার করাকে অস্বীকার করা।

রাওয়াফিজরা বারো দলে বিভক্ত : (১) উলোবীয়্যা, (২) আবদীয়্যা, (৩) শিয়ীয়্যা, (৪) ইসহাকীয়্যা, (৫) জায়দীয়্যা, (৬) আব্বাসীয়্যা, (৭) ইমামীয়্যা,

(৮) তানাসুখীয়্যা, (৯) নাদীয়্যা, (১০) লাগীয়্যা, (১১) ওয়াজীয়্যা, (১২) ওয়াবীছাহ।

খাওয়ারিজদের আকিদাসমূহ হলো : (১) কোনো গুনাহের কারণে (আহলে কেবলা) মুসলমানকে কাফির বলা, (২) জালিম (অত্যাচারী) বাদশাহর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বৈধ বলা, (৩) হযরত আলী (রা.)কে গালমন্দ ও অভিশাপ দেয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং নামাজের জামাআতকে অস্বীকার করা।

এরা বার দলে বিভক্ত : (১) আজদীয়্যা, (২) আবু হানাফীয়্যা, (৩) তাগলবীয়্যা (৪) হারাযীয়্যা, (৫) খালকিয়্যা (৬) কাওজীয়্যা, (৭) মু'তাজিলা, (৮) মায়মুনীয়্যা, (৯) কানজীয়্যা, (১০) মুহকামীয়্যা, (১১) আখনাছীয়্যা, (১২) শুরাফীয়্যা।

জাবরিয়াদের আকিদাসমূহ হলো : (১) মানুষ পাথর ও শক্ত মাটির ন্যায় সম্পূর্ণভাবে অনড়, অচল কোনো কাজের মধ্যে বান্দার কোনো ক্ষমতা নেই, অতএব তাকে পুরস্কার দেয়া যাবে না এবং শাস্তিও দেয়া যাবে না। (২) ধন-সম্পদ আল্লাহর কাছে প্রিয়। (৩) বান্দার কাজের পর আল্লাহর তাওফিক হয়। (৪) মেরাজে জিছমানী (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বশরীরে মেরাজ করা)কে অস্বীকার করা। (৫) রুহ জগতের স্বীকারুক্তিকে অস্বীকার করা। (৬) জানাজার নামাজ ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করা।

এরা বারো দলে বিভক্ত : (১) মুযতাররীয়্যা, (২) আফয়ালীয়্যা, (৩) মায়ীয়্যা, (৪) মযি্বীয়্যা, (৫) মাযাজীয়্যা, (৬) মুতমানীয়্যা, (৭) কাছলীয়্যা, (৮) ছাবিকীয়্যা, (৯) হাবিবীয়্যা, (১০) খাওফীয়্যা, (১১) ফিকরীয়্যা, (১২) হাবসিসীয়্যা।

ক্বাদরিয়াদের আকিদাসমূহ হলো : (১) মানুষ প্রকৃত পক্ষে তার ক্ষমতায় কাজ করে, এতে আল্লাহর কোনো হস্তক্ষেপ নেই। (২) এটা সম্ভব আছে, কোনো কাজ আল্লাহর কাছে কুফ্র, আর এটা বান্দার কাছে ঈমান হিসেবে গণ্য। (৩) বান্দার কর্মের আগে আল্লাহর তাওফিক হয়, (৪) মেরাজে জিছমানীকে অস্বীকার করা, (৫) রুহ জগতের অঙ্গিকার ও স্বীকারোক্তিকে অস্বীকার করা। (৬) নামাজে জানাযা ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করা।

তারা বারো দলে বিভক্ত : (১) আহদীয়্যা, (২) শানবীয়াহ, (৩) কাছানীয়াহ, (৪) শায়তানীয়াহ, (৫) শারি্কীয়াহ, (৬) অহমীয়াহ, (৭) রুয়াইদীয়াহ, (৮) নাকশীয়াহ, (৯) তাবরীয়াহ, (১০) ফাছিতীয়াহ, (১১) নেযামীয়াহ, (১২) মানযিলীয়াহ।

জাহ্মীয়াদের আকিদাসমূহ হচ্ছে : (১) ঈমানের সম্পর্ক শুধু অন্তরের সঙ্গে মৌখিক কথার দ্বারা নয়। মৌখিক কথা যে কোনো ভাবেই হোক না কেন। (২) (প্রাণীর) রুহ্ কবজ করার সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহর সঙ্গে, মউতের ফেরেশতার সঙ্গে নয়, যেহেতু তারা মউতের ফেরেশতাকে অস্বীকার করেন। (৩) আলমে বরযখ– কবর জগতকে অস্বীকার করা। (৪) নাকির-মুনকার ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন করাকে অস্বীকার করা। (৫) হাউজে কাউসারকে অস্বীকার করা, তারা বলে, এসব সম্পূর্ণভাবে মানুষের কল্পনাপ্রসূত।

এরা বার দলে বিভক্ত : (১) মাখলুকীয়াহ, (২) গাইরীয়াহ, (৩) ওয়াকিফীয়াহ, (৪) খাইরীয়াহ (৫) জানাদিকীয়াহ, (৬) লাফজীয়াহ, (৭) রাবিয়ীয়াহ, (৮) মুতারাকিবীয়াহ, (৯) ওয়ারিদীয়াহ, (১০) ফানীয়াহ, (১১) হারকীয়াহ, ৯১২) মুয়াত্তালীয়াহ।

মুরযিয়াদের আকিদাসমূহ হচ্ছে : (১) আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.) কে স্বীয় আকার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। (২) আরশ আল্লাহর নির্ধারিত স্থান। (৩) শুধু ঈমানই নাজাতের জন্য যথেষ্ট, সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যে কোনো উপকার নেই এবং নাফরমানীর মধ্যে কোনো অপকার নেই। (৪) মেয়ে লোকেরা বাগানের ফুলের ন্যায়, যার ইচ্ছা তা ভোগ করতে পারবে। বিয়ে শাদির কোনো প্রয়োজন নেই ইত্যাদি।

মুরযিয়ারা বার দলে বিভক্ত : (১) তারিকীয়াহ, (২) শানিয়াহ, (৩) রাবীয়াহ, (৪) শাফিয়াহ, (৫) বাহামিয়াহ, (৬) আমলিয়াহ, (৭) মানকুহিয়াহ, (৮) শাত্ছানিয়াহ, (৯) আছারিয়াহ, ১০) বাদ্য়িয়াহ, (১১) হাশবিয়াহ, (১২) মুশাব্বিহা।

কিছুসংখ্যক আলিমগণ বলেছেন, মুয়াত্তিলাহর মূল, জাহমিহা তার শাখা। আর মুশাব্বিহা মূল, মুরযীয়াহ তার শাখা। অপর কিছুসংখ্যক আলিমদের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট দলসমূহ বারটি। আর প্রত্যেকটির ছয়টি শাখা রয়েছে।

আল-মাওয়াকিফের লেখক বর্ণনা করেছেন, পথভ্রষ্ট দল আটটি।

(১) মু'তাযেলাহ, (২) জাবরীয়াহ, (৩) মুরজীয়াহ, (৪) শিয়া, (৫) খাওয়ারীজ, (৬) মুশাব্বিহাহ, (৭) বোখারীয়াহ, (৮) নাযীয়াহ। আবার মু'তাযেলাহ এবং খাওয়ারিজ প্রত্যেকেরই বিশটি দল রয়েছে। আর শিয়াদের বাইশটি দল রয়েছে এবং মুরযিয়াদের পাঁচটি শাখা রয়েছে। আর মুশাব্বিহা এবং নাযীয়া উভয়ের কোনো শাখা বা উপদল নেই। এসব ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট দলের আলোচনা ছাত্রদের উপকারের জন্য পেশ করেছি। নতুবা আজকের যুগে অধিকাংশ দলের কোনো অস্তিত্বই নেই। এগুলো শুধু পুস্তিকাতেই রয়েছে।

নোট : উল্লেখিত আলোচনা কারী তৈয়্যীব (রহ.) আকিদাতুত্ ত্বাহাবির হাশিয়াতে করেছেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তাঁর সুযোগ্য সম্মানিত ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) সবাই সর্বমহলে খ্যাতিসম্পন্ন, তাঁদের জীবনী আলোচনা করতে পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হবে, তবে আমার স্বল্প জ্ঞান ও সংকীর্ণ সময়ের কারণে তাঁদের জীবনী আলোচনার দিকে না গিয়ে শুধু তাঁদের জন্ম ও মৃত্যু সন উল্লেখ করে এ আলোচনা সমাপ্ত করছি।

নাম	জন্ম	মৃত্যু
আবু হানিফা নুমান ইবনে ছাবেত আল-কুফী	৮০ হি.	১৫০ হি.
আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম আল আনসারী	১২৩ হি.	১৮২ হি.
আবু আবদিল্লাহ মুহা. ইবনে হাসান আশশায়বানী	১৩২ হি.	১৮৯ হি.

আল্লাহ্ তায়ালা সম্পর্কে আকিদা

আল্লাহ্ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই

نَقُوْلُ فِىْ تَوْحِيْدِ اللهِ مُعْتَقِدِيْنَ بِتَوْفِيْقِ اللهِ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى وَاحِدٌ لَّاشَرِيْكَ لَهٗ

অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালার তাওফীকের প্রতি আকিদা বা আন্তরিক বিশ্বাস রেখে তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে বলছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

فِىْ تَوْحِيْدِ اللهِ : এর দ্বারা প্রশ্ন হতে পারে, মুছান্নিফ (রহ.) তাঁর কেতাবকে তাওহিদ বা একত্ববাদের আলোচনার সঙ্গে শুরু করলেন কেন?

উত্তর : প্রথম– যেহেতু তাওহিদ– ইসলামের রুকুনসমূহের মধ্যে প্রধান ও প্রথম এবং দীন ও আকিদার স্তম্ভসমূহের মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ। আর বান্দার ওপর সর্ব প্রথম ওয়াজিব হচ্ছে, তাওহিদ বা একত্ববাদকে বিশ্বাস করা এবং সর্বযুগে সব উম্মতের মধ্যে আগত সব নবী-রাসূল (আ.)গণের প্রথম ও প্রধান দাওয়াতই ছিলো তাওহিদ। সেহেতু আকাইদের কেতাবকে তাওহিদের আলোচনার সঙ্গেই শুরু করা উচিৎ। তাই মুসান্নিফ (লেখক) তাঁর কেতাবকে তাওহিদের আলোচনার সঙ্গে শুরু করেছেন।

এমনকি আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্মানিত সত্তার একত্বের প্রথম সাক্ষী নিজেকেই সাব্যস্ত করেছেন। দ্বিতীয় সাক্ষী ফেরেশতা, অতঃপর তৃতীয় সাক্ষী

সত্যিকারের আলেম (জ্ঞানী) লোকদের সাব্যস্ত করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ سورة ال عمران ركوع-٢

"আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিয়েছেন, (তিনি এক) তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ট জ্ঞানীগণও স্বাক্ষী দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। তিনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"

দ্বিতীয় : আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে যত নবী, রাসূল (আ.) প্রেরণ করেছিলেন, সবাইকেই তাওহিদের ওপর অটল থাকার এবং বিশ্বের মানবজাতিকে এর প্রতি দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

"আপনার আগে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি তাদের প্রতি এ আদেশই প্রেরণ করেছি, আমি ব্যতীত অন্য কোনো মা'বুদ নেই। সুতরাং আমরাই এবাদত কর।" (সূরা আম্বিয়া : ২)

অতএব তাওহিদ হলো সমস্ত নবী-রাসূল (আ.)গণের দীন এবং সর্বযুগের সিদ্দীকিন ও ছালিহীনের পথ। এ কারণে তাওহিদের আলোচনা সব বিষয়ের প্রথমে আনা হলো।

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَاحِدٌ : আল্লাহ তায়ালার একত্বের আলোচনা আসমানী প্রত্যেক কেতাবে রয়েছে, বিশেষতঃ শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর শেষ কেতাব কোরআনুল কারিমের অসংখ্য আয়াতে অগণিত প্রমাণাদির মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদকে প্রমাণিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

"তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল প্রতাপান্বিত।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :

وَاِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ.

"আমাদের মা'বুদ এবং তোমাদের মা'বুদ একই, আর আমরা তাঁরই আনুগত্য করি।"

সুতরাং তাওহিদ– আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া ঈমানের মৌলিক বিষয়। এটা ব্যতীত কোনো মানুষ মুমিন হতে পারবে না।

لَاشَرِيْكَ لَهٗ : আল্লাহর কোনো শরিক বা অংশীদার নেই। তাই যেমনিভাবে আসমানী প্রত্যেক কেতাবে আল্লাহর তাওহিদ বা একত্ববাদে কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনিভাবে আল্লাহর অংশীদার না হওয়ার কথাটিও অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রমাণিত করা হয়েছে। বিশেষতঃ কোরআনুল কারিমের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণাদির মাধ্যমে একথা প্রমাণ করা হয়েছে, আল্লাহর কোনো শরিক নেই। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ– سورة الروم.

“আল্লাহ ওই সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরিকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি? যে এসব কাজের মধ্যে কোনো একটি কাজও করতে পারবে। আল্লাহর সত্তা পবিত্র ও মহান তা থেকে, তারা যাকে (আল্লাহর সঙ্গে) শরিক করে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا –سوره بنى اسرائيل.

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি না কোনো সন্তান রাখেন এবং তাঁর সার্বভৌমত্বে না কোনো শরিক আছে এবং তিনি না দুর্দশাগ্রস্থ হন, যে কারণে কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকুন।” (সূরা বনী ইসরাঈল)

ওপরযুক্ত আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহর কোনো শরিক নেই। সুতরাং কাউকে আল্লাহর শরিক মনে করা অমার্জনীয় অপরাধ। এ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহর সাদৃশ্য কোনো কিছু নেই এবং তিনি অক্ষম নন

لَاشَئَ مِثْلُهٗ وَلَاشَئَ يُعْجِزُهٗ وَلَااِلٰهَ غَيْرُهٗ

অনুবাদ : আল্লাহর সাদৃশ্য কিছুই নেই এবং কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম বা ঠেকাতে পারবে না, তিনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই।

لَا شَئَ مِثْلُهٗ : অর্থাৎ, আল্লাহর জাত বা সত্তা তুলনাহীন, তাঁর জাত ও গুণাবলীর সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা চলে না, যেহেতু তাঁর জাত বা সত্তা এবং গুণাবলীর মতো কোনো কিছু নেই। সেহেতু আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَئٌ অর্থাৎ, আল্লাহর অনুরূপ কোনো কিছু নয়। (সূরা শুয়ারা)

সুতরাং আল্লাহর জাত বা সত্তার দিক দিয়ে এবং তাঁর গুণাবলী ও কর্মগতভাবে, তাঁর মর্যাদা হিসেবে কোনো কিছুই তাঁর মতো নয় এবং তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা নেই। অতএব কোনো কিছুকে কোনো দিক দিয়ে আল্লাহর মতো মনে করা ঈমানের পরিপন্থী।

وَلَاشَئَ يُعْجِزُهٗ : অর্থাৎ, এমন কোনো কিছু নেই, যা আল্লাহকে অক্ষম করতে বা ঠেকাতে পারবে। যেহেতু অক্ষমতার দু'টি কারণ রয়েছে–

১ম কারণ– কর্তা স্বীয় দুর্বলতার কারণে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে অক্ষম।

২য় কারণ– কর্তার এ কাজ সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা সল্প জ্ঞান থাকার কারণে স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে অক্ষম। আর আল্লাহর সত্তা ওপরযুক্ত উভয় কারণ থেকে পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে কোনো কিছু ঠেকাতে বা অক্ষম বানাতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহই রিযিকদাতা, শক্তিশালী, অসীম ক্ষমতার অধিকারী।"

এ আয়াতে আল্লাহর সত্তা থেকে অক্ষমতার প্রথম কারণকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং অন্য আয়াতে অক্ষমতার দ্বিতীয় কারণকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন : وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَئٍ عِلْمًا অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব বস্তুকে তাঁর জ্ঞানের বেষ্টনীর মধ্যে রেখেছেন।

অতএব ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা অক্ষমতার উভয় কারণ (দুর্বলতা ও জ্ঞানহীনতা) থেকে মুক্ত এবং তিনি

সর্বশক্তিমান, অসীম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা চান তাই করতে পারেন, কেউ তাঁকে অপারগ করতে বা ঠেকাতে পারবে না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে- فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ "তিনি যা চান, তা-ই করেন। (সূরা বুরুজ)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا.

"আসমান যমীনের মধ্যে কোনো কিছু আল্লাহকে অপারগ (অক্ষম) করতে পারে না। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।" (সূরা ফাতির)

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার কোনো কিছুর সামনে অক্ষম বা অপারগ নন। তিনি সর্ব শক্তিমান, সর্ব ক্ষমতার অধিকারী। সবাই তার সামনে অক্ষম বা অপারগ।

সুতরাং তাঁর প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেক মুমিনেরই ঈমানী কর্তব্য, নতুবা ঈমান সঠিক ও যথার্থ হবে না।

আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই

وَلَا اِلٰهَ غَيْرُهٗ : অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কেউ মা'বুদ বা উপাসনার যোগ্য নয়। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে হযরত নূহ (আ.)-এর বাণী উল্লেখ করে বলেছেন :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ–

"নিশ্চয় আমি নূহ (আ.)কে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি, তিনি বললেন : হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো মা'বুদ-উপাস্য নেই।" উক্ত আয়াতের প্রথম বাক্যে নূহ (আ.)-এর রেসালাতের কথা এবং দ্বিতীয় বাক্যে আল্লাহর এবাদতের প্রতি দাওয়াত এবং তৃতীয় বাক্যে আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরিক মনে করাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যাতে মানুষ আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে মা'বুদ বা ইলাহ মনে না করে এবং এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করা থেকে বিরত থাকে। হযরত হুদ (আ.)-এর বাণী উল্লেখ করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ.

"আর আমি আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভাই হুদ (আ.)কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর এবাদত কর,

তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।" আর হযরত ছালেহ (আ.)-এর বাণী উল্লেখ করে বলেছেন :

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ.

"আর আমি ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভাই ছালেহ (আ.)কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন : হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো মা'বুদ উপাস্য নেই।"

অনুরূপভাবে শুয়াইব (আ.)-এর বাণী উল্লেখ করে বলেছেন :

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ.

"আমি ময়দানের প্রতি তাদের ভাই শুয়াইব (আ.)কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ-মাবু'দ-উপাস্য নেই।"

আল্লাহর নবী হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাসূলই আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। যেহেতু এটিই সব বিশ্বাস ও কর্মের প্রাণ, সেহেতু যখনই যে সম্প্রদায় আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলী তথা দীনে হক্বকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ইলাহ-মা'বুদ বা উপাস্য মনে করে, অথবা আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরিক মনে করে এর পূজা বা উপাসনায় লেগে যেত, তখনই আল্লাহ তায়ালা তাঁর মনোনীত নবী-রাসূল প্রেরণ করে মানবজাতির কাছে তাঁর একত্ববাদের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়ে, তাদের এক আল্লাহ ব্যতীত অন্যের এবাদত বা পূজা থেকে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ দিতেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

"আমি প্রত্যেক উম্মতে একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছি। যাতে তারা মানুষকে আল্লাহর এবাদত করা এবং মূর্তিপূজা পরিহার করার নির্দেশ দেন।"

অতএব ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ ও আলোচনার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই।

আল্লাহ্ অনাদি ও অনন্ত

قَدِيْمٌ بِلَا اِبْتِدَاءٍ دَائِمٌ بِلَا اِنْتِهَاءٍ

অনুবাদ : তিনি অনাদি, (যার) কোনো আদি (আরম্ভ) নেই। তিনি অনন্ত, (যার) কোনো অন্ত (শেষ) নেই।

অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকবে। তাঁর আরম্ভের কোনো সীমা নেই এবং শেষেরও কোনো অন্ত নেই। মুসলিম শরিফের একটি হাদিস থেকেই একথা বোঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَئٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بعْدَكَ شَئٌ.

"হে আল্লাহ! তুমিই প্রথম, তোমার আগে কোনো কিছু নেই। আর তুমিই শেষ, তোমার পরে কোনো কিছু নেই।" পবিত্র কোরআনে আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَئٍ عَلِيْمٌ

"তিনিই প্রথম ও শেষ (তিনিই) প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান, তিনিই সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" এ আয়াতের তফসিরে এবং আউয়াল-আখের ও জাহির-বাতিনের অর্থ সম্পর্কে তফসিরবিদগণের দশটির অধিক রায় বর্ণিত আছে। এসব রায়ের মধ্যে বৈপরিত্য নেই, সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে। 'আউয়াল' শব্দের অর্থ থেকে প্রায় নির্দিষ্ট অর্থাৎ, অস্তিত্বের দিক দিয়ে সমস্ত সৃষ্ট জগতের অগ্রে ও আদি। তিনি ব্যতীত সব কিছুই তাঁরই সৃজিত, তাই তিনিই আদি।

কারো কারো মতে, 'আখের' শব্দের অর্থ হচ্ছে সব কিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

كُلُّ شَئٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ

"সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, একমাত্র তাঁরই সত্তা ব্যতীত।" সুতরাং আল্লাহর সত্তা এমন, আগেও বিলীন ছিলো না এবং ভবিষ্যতেও বিলীন হবে না। তাই তিনি সবার অন্ত।

কোরআন-সুন্নায় 'কাদীম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। যদিও 'কাদীম' শব্দটি এখানে আল-আউয়ালু শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে, কোরআন-হাদিসের আল আউয়ালু শব্দ ব্যবহার করা হলো, আল-কাদিমু শব্দ ব্যবহার করা হলো না কেনো? এর রহস্য কি?

উত্তর : আল-আউয়ালু শব্দের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে, আল-কাদীমু শব্দের মধ্যে সে সৌন্দর্য নেই। কারণ আল-আউয়ালু শব্দটি কাদীমুনের অর্থ বোঝানোর সঙ্গে সঙ্গে এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করে, সব কিছুর আশ্রয় স্থল আল্লাহর সত্তাই। তাঁর দিকেই সবাই প্রত্যাবর্তন করবে ও ফিরে আসবে।

অতএব তিনিই সব কিছুর আউয়াল (প্রথম) এবং আখের (শেষ)। কিন্তু তাঁর আউয়াল (প্রথম) এবং আখের (শেষ) নেই। সুতরাং তিনিই অনাদি ও অনন্ত।

আল্লাহ অক্ষয়, তাঁর কোনো ধ্বংস নেই

وَلَا يَفْنٰى وَلَا يَبِيْدُ وَلَا يَكُوْنُ اِلَّا مَا يُرِيْدُ

অনুবাদ : তিনি ধ্বংস হবেন না এবং তিনি ক্ষয় হবেন না, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছু সংগঠিত হবে না।

لَا يَفْنٰى وَلَا يَبِيْدُ : আল্লাহর সব সৃষ্টিই ক্ষয় ও ধ্বংস হচ্ছে এবং সব কিছুই এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর সত্তার ক্ষয় নেই এবং এর ধ্বংসও নেই। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস ও ক্ষয় হবেন না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে : كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ "আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল।"

অন্য আয়াতে আছে :

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

"ভূপৃষ্ঠের সব কিছুই ধ্বংসশীল, আর আপনার মহিমান্বিত ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তাই চিরস্থায়ী।" (সুতরাং দুনিয়ার সবকিছুর ক্ষয় ও ধ্বংস আছে, কোনো কিছুই চিরস্থায়ী বা চিরন্তন নয়, একমাত্র আল্লাহর সত্তাই চিরস্থায়ী ও চিরন্তন। এটাই সত্যিকারের মুমিনদের আকিদা। অতএব আল্লাহর সত্তা ছাড়া অন্য কিছুকে চিরস্থায়ী বা চিরন্তন বলে বিশ্বাস রাখা ঈমানের পরিপন্থী এবং কোনো ক্রমেই বৈধ নয়।

وَلَا يَكُوْنُ اِلَّا مَا يُرِيْدُ : অর্থাৎ, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু সংঘটিত হয় না। যা কিছু সংঘটিত হয়, সবই আল্লাহর ইচ্ছায়ই হয়। অতএব মানুষের কোনো কাজের ইচ্ছা যদি আল্লাহর ইচ্ছানুকুল হয়, তবে মানুষের এ কাজ সংঘটিত হবে। আর যদি এ ইচ্ছাটা আল্লাহর ইচ্ছানুকুল না হয়, তবে তা

সংঘটিত হবে না। যদিও মানুষের শত ইচ্ছা থাকে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ إِنْ أَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ.

"আর আমি তোমাদের নসিহত করতে চাইলেও তা ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ্ তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে চান।"

ওপরযুক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আল্লাহ যা চান তা-ই হয়, মানুষ যা চায় এর সব কিছুই সংঘটিত হয় না; বরং মানুষের যে ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছানুরূপ হয় তা-ই সংঘটিত হয়। অতএব প্রত্যেক মুমিনের এই বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু হয় না এবং কখনো হবে না।

মানুষের ধ্যান-ধারণা আল্লাহকে উপলব্ধি করতে পারে না

لَا تَبْلُغُهُ الْاَوْهَامُ وَلَاتُدْرِكُهُ الْاَفْهَامُ

অনুবাদ : কল্পনাসমূহ আল্লাহর ধারে কাছে পৌঁছে না এবং বুদ্ধি, অনুভূতিসমূহ আল্লাহকে উপলব্ধি করতে পারে না।

اَوْهَام : শব্দটি **وَهْم** এর বহুবচন। **وَهْم** অর্থ মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা বা অনুমান।

لَا تَبْلُغُهُ الْاَوْهَامُ : অর্থাৎ, মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা বা অনুমান আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না এবং কখনো পৌঁছতে পারবে না। কারণ মানুষের চিন্তা, ধারণা, অনুমান ও কল্পনা সবই সীমিত। এগুলো দেহ ও দৃশ্যমান বস্তুসমূহকে অবলোকন করতে পারে, ঊর্ধ্ব জগতের নূরানী, সূক্ষ্ম দেহসমূহ পর্যন্ত তার দৃষ্টি শক্তি পৌঁছতে পারে না। যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের নেয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী নকল করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَاخَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ.

"আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামত তৈরি করে রেখেছি। যা কোনো চক্ষু কোনো দিন দেখেনি, আর কোনো কান কখনো শোনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তরে এর কল্পনাও আসেনি।" (বুখারী)

যখন মানুষের দৃষ্টি, চিন্তা, ধারণা, অনুমান ও কল্পনা নূরানী দেহসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, তাহলে যে নূরানী সূক্ষ্ম সত্তা দেহ, আকৃতি ও প্রকৃতি থেকে

তায়ালা-পবিত্র সে পর্যন্ত তা কীভাবে পৌঁছবে? সুতরাং ওপরযুক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথার ওপর স্পষ্ট প্রমাণ হয়, মানুষের চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, অনুমান-কল্পনা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে কখনো সক্ষম নয়।

وَلَاتُدْرِكُهُ الْاَفْهَامُ : تُدْرِكُ শব্দটি اِدْرَاك শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ পাওয়া, ধরা, বেষ্টন করা। اَفْهَام শব্দটি فَهْم এর বহুবচন। এর অর্থ, বোধ, বুদ্ধি, অনুভূতি, জ্ঞান। অতএব وَلَا تُدْرِكُهُ الْاَفْهَامُ এর অর্থ– মাখলুকের জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি, আল্লাহর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারেনি এবং পেতে পারবে না। কারণ মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও অনুভূতি সবই সীমিত। সীমিত মাধ্যম দ্বারা সীমিত জ্ঞানই অর্জন হয়। আর আল্লাহর সত্তা অসীম। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত ও সত্য, অসীম জ্ঞান, বুদ্ধি দ্বারা অসীম বস্তু অনুধাবন করা এবং এর মৌলতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না।

অতএব মানুষ তার সীমিত জ্ঞান, বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে অসীম আল্লাহকে অনুধাবন করা এবং তার মৌলতত্ত্বে উপনীত হওয়া, অথবা বেষ্টন করা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا (سورة طه)

"তিনি তাদের সামনের পেছনের সব কিছু জানেন এবং তারা তাঁকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারবে না।" অন্য আয়াতে বলেছেন :

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অথচ তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী সুরিজ্ঞ।"

ওপরযুক্ত আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, জিন, মানব, ফেরেশতা ও যাবতীয় জীব-জন্তুর দৃষ্টি এক হয়েও আল্লাহর সত্তাকে বেষ্টন করে দেখতে পারবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টি জীবের দৃষ্টিকে পূর্ণরূপে দেখেন এবং তাঁর দেখায় সবকিছু বেষ্টিত হয়। এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার দুটি বিশেষ গুণ বর্ধিত হয়েছে।

সমগ্র সৃষ্ট জগতের কারো দৃষ্টি বরং সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তাঁর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না। যেমন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত জিন, মানুষ ফেরেশতা ও শয়তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত জন্মগ্রহণ করবে.

তারা সবাই যদি এক সারিতে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি দ্বারাও আল্লাহর সত্তাকে পুরোপুরি বেষ্টন করতে পারবে না। এ বিশেষ গুণটি একমাত্র আল্লাহর হতে পারে। নতুবা আল্লাহ সৃষ্টিকে এমন দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, ক্ষুদ্রতম জীবের ক্ষুদ্রতম চক্ষু পৃথিবীর বৃহত্তম ভূমণ্ডলকে দেখতে পারে এবং বেষ্টন করতে পারে। সূর্য, চন্দ্র কি বিরাট গ্রহ। এদের সম্মুখে পৃথিবী কিছুই নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ; বরং ক্ষুদ্রতম জন্তুর চক্ষু এসব গ্রহকে এমনভাবে দেখে, দৃষ্টির মধ্যে বেষ্টন হয়ে যায়।

আসল কথা হলো এই, দৃষ্টি মানুষের একটি ইন্দ্রিয় বিশেষ। এর দ্বারা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহী বিষয়বস্তুসমূহের জ্ঞান লাভ করা যায়। আর আল্লাহর পবিত্র সত্তা বুদ্ধি, ধারণার বেষ্ঠনীর ঊর্ধ্বে। অতএব মানুষের দৃষ্টিশক্তি দ্বারা আল্লাহকে কিভাবে দেখতে পাবে? এবং দৃষ্টির বেষ্টনীতে কীভাবে আয়ত্ত করতে পারে?

এ কথা আমি আগেই আলোচনা করেছি, আল্লাহ তায়ালার সত্তা এবং তাঁর গুণাবলী অসীম, আর মানুষের বুদ্ধি, ধ্যান-ধারণা ও ইন্দ্রিয়সমূহ সসীম। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত সত্য, অসীম বস্তুকে স্বসীম বস্তু বেষ্টন করতে পারে না। এ কারণে দুনিয়ার বুদ্ধিজীবি এবং বৈজ্ঞানিকগণ যুক্তি ও প্রমাণাদির মাধ্যমে জগত স্রষ্টা এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলীসমূহকে অনুধাবন করার উদ্দেশ্যেসমূহ যুক্তি ও অনুসন্ধানের পেছনে জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং ছুফী ও আধ্যাত্মিক সাধকগণ, যারা কাশ্‌ফ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে এ ময়দানে ভ্রমণ করছেন, তারা সবাই এ কথার ওপর একমত পোষণ করেছেন, আল্লাহর সত্তা এবং তাঁর গুণাবলীর মৌলতত্ত্ব উদঘাটন কেউ করতে পারেনি এবং পারবে না।

ওপরযুক্ত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর দ্বিতীয় গুণ হলো, তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্ট জগতকে পরিবেষ্টনকারী। জগতের অণুকণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্লাহ তায়ালার বৈশিষ্ট্য। তাঁকে ছাড়া কোনো সৃষ্ট বস্তুর পক্ষে সমগ্র জগত ও তার অণু-পরমাণুর এরূপ জ্ঞান কখনো হয়নি এবং হতে পারে না। কেনোনা এটা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ গুণ।

আল্লাহর সত্ত্বা নমুনাহীন, চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব

وَلَا يُشْبِهُهُ الْأَنَامُ، حَيٌّ لَا يَمُوتُ، قَيُّومٌ لَا يَنَامُ

অনুবাদ : আল্লাহর সৃষ্ট তাঁর সাদৃশ্য হতে পারে না। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু হবে না। তিনি চিরস্থায়ী, চির জাগ্রত, তিনি ঘুমান না।

وَلَايُشْبِهُهُ الْأَنَامُ : অর্থাৎ, আল্লাহর সঙ্গে কোনো সৃষ্টির সাদৃশ্য নেই ও হতে পারে না। যদিও অস্তিত্ব, ক্ষমতা, জ্ঞান, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি গুণাবলী। সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব, ক্ষমতা, জ্ঞান, শ্রবণ দর্শন ও অন্যান্য গুণাবলীসমূহ চিরস্থায়ী, চিরন্তন, কোনো দিন ক্ষয় হবে না এবং তাঁর এসব গুণাবলীসমূহ মাখলুকের গুণাবলীর মতো নয়। কারণ আল্লাহর এসব গুণাবলীসমূহ সর্বকাল, সর্বস্থান ও সমস্ত সৃষ্টির ওপর স্থায়ীভাবে বিরাজমান আছে এবং থাকবে। পক্ষান্তরে মাখলুকের অস্তিত্ব, ক্ষমতা, জ্ঞান, শ্রবণ, দর্শন ক্ষণস্থায়ী ও সীমিত এবং সর্বত্র বিরাজিত নয়। তাই কোনো সৃষ্টি আল্লাহর সাদৃশ্য নয় ও হতে পারে না। এ কারণে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফেকহে আকবরে বলেছেন,

وَلَايُشْبِهُ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهِ وَلَايُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ صِفَاتُهُ كُلُّهَا خِلَافُ صِفَاتِ الْمَخْلُوْقِيْنَ، يَعْلَمُ لَاكَعِلْمِنَا، وَيَقْدِرُ لَاكَقُدْرَتِنَا وَيَرٰى لَاكَرُؤْيَتِنَا.

"আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোনো মাখলুকের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখেননি এবং কোনো মাখলুকও তাঁর সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য রাখতে পারে না। অতঃপর বলেছেন, আল্লাহর সব গুণাবলীই মাখলুকের গুণাবলীর বিপরীত। তিনি জানেন, আমাদের জানার মতো নয়। তিনি ক্ষমতা রাখেন, আমাদের ক্ষমতার মতো নয়। তিনি দেখেন, আমাদের দেখার মতো নয়।" তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ : অর্থাৎ, আল্লাহর সাদৃশ্য কোনো বস্তু নেই।

অতএব আল্লাহর সঙ্গে কোনো মাখলুকের তুলনা চলে না। যেহেতু কোনো মাখলুক আল্লাহর সাদৃশ্য নয় ও হতে পারে না। সুতরাং ওপরযুক্ত আলোচনায় মুশাব্বিহীদের বিভ্রান্তিকর আকিদার ভ্রান্তি পরিষ্কার হয়ে গেছে, ইসলামে মুশাব্বিহী (আল্লাহর সাদৃশ্য সাব্যস্তকারী)দের কোনো স্থান নেই।

حَيٌّ لَا يَمُوْتُ قَيُّوْمٌ لَايَنَامُ : অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা চিরকাল জীবিত, কখনো তাঁর মৃত্যু হবে না, যেহেতু তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি চিরকাল আছেন, কখনো তাঁর তন্দ্রা বা নিদ্রা আসবে না, যেহেতু তাঁর তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রয়োজন নেই। কারণ মৃত্যু, তন্দ্রা ও নিদ্রা আসা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। আর আল্লাহর সত্তা মাখলুকের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী থেকে মুক্ত ও পবিত্র। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ.

"আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই। তিনি জীবিত সব কিছুর ধারক, তাঁকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না।"

ওপরযুক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার একক অস্তিত্ব, তাওহিদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অতি আশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অনন্তকাল থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া ইত্যাদি সবই তাতে বলা হয়েছে।

ওপরযুক্ত আয়াতের প্রথম বাক্যে اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ এতে আল্লাহ শব্দটি অস্তিত্ব বাচক নাম, অর্থ : আল্লাহ সে সত্তা, যিনি সকল পরকাষ্ঠার অধিকারী ও সবকিছু থেকে মুক্ত।

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ : সে সত্তারই বর্ণনা, যে সত্তা এবাদতের যোগ্য। সে সত্তা ব্যতীত অন্য কোন 'ইলাহ' নেই।

দ্বিতীয় বাক্য : اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ : আরবী ভাষায় حَيّ শব্দের অর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহ তাঁর গুণবাচক নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছেন, তিনি সর্বদা জীবিত ও বিদ্যমান থাকবেন, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।

قَيُّوْم শব্দটি قِيَام শব্দ উৎপন্ন, قِيَام শব্দের অর্থ দাঁড়ানো, কায়েম দাঁড়ানো বস্তুকে বলা হয়। কাইয়ুম قَيُّوْم শব্দটি مُبَالَغَه বা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকে বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন।

(قَيُّوْم)কাইয়ুম : আল্লাহর এমন এক বিশেষ গুণ, যাতে কোনো সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়ীত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। যে সত্ত্বা নিজের দায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য তিনি অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে জন্যই কোনো মানুষকে 'কাইয়ুম' (قَيُّوْم) বলা জায়িয নয়। যারা 'আব্দুল কাইয়ুম' নামকে বিকৃত করে শুধু 'কাইয়ুম' বলে তারা গুনাহগার হবে।

আল্লাহর গুণবাচক নামের মধ্যে حَيّ وَ قَيُّوْم অনেকের মতে, এ দুটি নাম 'ইসমে আযম', হযরত আলী (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধে আমার ইচ্ছা হলো আমি 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটু দেখবো, তিনি কি করছেন।' সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি সিজদায় পড়ে يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ বলছেন।

তৃতীয় বাক্যে : لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ উক্ত বাক্যে سنة-এর মধ্যে সীনে জের দ্বারা উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব। نوم পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয়। অর্থাৎ তন্দ্রা বা নিদ্রা আল্লাহ তায়ালাকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি তন্দ্রা ও নিন্দ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

পূর্ববর্তী বাক্যে 'কাইয়ুম' (قَيُّوْمٌ)শব্দে মানুষকে এ কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে, আসমান ও জমিনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। সমস্ত সৃষ্টিরাজি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়তো ধারণা হতে পারে, যে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করছেন, তাঁর কোনো সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কোনো সময় বিশ্রামের প্রয়োজন হতে পারে। তৃতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে, আল্লাহকে নিজের বা অন্য কোনো সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার ঊর্ধ্বে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আর তাঁর ক্লান্তিরও কোনো কারণ নেই। কারণ তিনি এমন একজন সত্তা যিনি যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র। (মাআরিফুল কোরআন, ১ম খণ্ড)

আর তন্দ্রা ও নিদ্রা মৃত্যুর সমতুল্য; বরং হাদিস শরিফে নিদ্রাকে মৃত্যুর ভাই বলা হয়েছে। মৃত্যু বলা হয়, হায়াত বা জীবন নিঃশেষ হয়ে যাওয়াকে। অতএব যে হায়াতের ঘাটতি রয়েছে, সে হায়াত পরিপূর্ণ হায়াত (যার ওপর কাইয়ুমিয়্যাতের ভিত্তি) হিসেবে স্থায়ী থাকতে পারে না। তাই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ এর পরে لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ বাক্য এনে তন্দ্রা এবং নিদ্রাকে তাঁর পবিত্র সত্তা থেকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর এ পদ্ধতিতে তন্দ্রা এবং নিদ্রাকে প্রত্যাখ্যান করাটাই আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ হায়াত এবং পরিপূর্ণ কাইয়ুমিয়্যাতের অকাট্য প্রমাণ।

আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং রিজিকদাতা

خَالِقٌ بِلَا حَاجَةٍ رَازِقٌ بِلَامُؤْنَةٍ

অনুবাদ : তিনি (স্বীয়) প্রয়োজন ছাড়া সৃষ্টিকর্তা এবং অক্লান্তে রিযিকদাতা।

خَالِقٌ بِلَا حَاجَةٍ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা অথচ এতে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে দুনিয়ার মানুষ যত ধরনের কাজ-কর্ম করে থাকে, এর পিছনে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন থাকে।

اَلْخَالِقُ : সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ তায়ালার একক গুণ, এতে কোনো সৃষ্টির কোনো ধরণের অংশিদারিত্ব নেই। কেনোনা সৃষ্টি করা আল্লাহর বিশেষত্ব, কোনো মাখলুক কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না এবং সম্ভবও নয়।

যেহেতু সৃষ্টি করার অর্থ হলো অস্তিত্ব দান করা। আর এটা একমাত্র সেই সত্তার জন্য সম্ভব, যিনি স্বীয় অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ, কারো মুখাপেক্ষী নন। আর সৃষ্টসমূহ তার অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং আল্লাহর মুখাপেক্ষী। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত, বস্তু নিজ অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে বস্তু অন্যকে অস্তিত্ব দান করতে পারে না। তাই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন :

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ-

"আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির আলোচনা করে দুনিয়ার সব মুশরিকদের সম্বোধন করে বলেছেন,

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَا ذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ.

"এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি (এখন যদি তোমরা আল্লাহর শরিক মনে করো) তবে আমাকে দেখাও, তিনি ছাড়া (যাদের তোমরা উপাস্য বানিয়েছো) তারা কি কি বস্তু সৃষ্টি করেছে?"

আর এ কথা সত্য, দুনিয়ার কোনো বস্তুই আল্লাহ ছাড়া কেউ সৃষ্টি করতে পারেনি এবং পারবে না। অতএব আল্লাহর সত্তাই একমাত্র স্রষ্টা, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই আকিদা প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে থাকা একান্ত কর্তব্য।

একটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর

প্রশ্ন : আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ.

"আমি মানব ও জিন জাতিকে একমাত্র আমার এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।"

এতে বোঝা যায়, মানব ও জিন জাতির এবাদত পাওয়া আল্লাহর প্রয়োজন এবং এদের এবাদতের প্রতি তিনি মুখাপেক্ষী। সুতরাং লেখকের কথাটি خَالِقٌ بِلَاحَاجَةٍ (তিনি প্রয়োজন ছাড়া সৃষ্টি কর্তা) কিভাবে সঠিক বলে মানা যায়?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন এবং মানব ও জিন জাতির এবাদতের তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, জিন ও মানব জাতিকে আল্লাহর এবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ কথাটি বান্দাদের কল্যাণার্থ বলা হয়েছে, এতে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ.

"হে মানব জাতি তোমরা সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ-ই একমাত্র ঐশ্বর্যশালী, অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত সত্তা।"

ওপরযুক্ত আয়াতে দুনিয়ার সব মানুষকে ভিক্ষুক-মুখাপেক্ষী বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা নিজেকে ধনী ও ঐশ্বর্যশালী বলেছেন। মোটকথা বান্দা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে وَاَقْرِضُوْا اللهَ قَرْضًا حَسَنَةً "তোমার আল্লাহকে উত্তম কর্জ-ঋণ দাও।" এতে প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী সত্তা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী বান্দাদের কাছে ঋণ চাওয়ার অর্থ কি?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালার কোনো কিছুর প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও এবং অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও বান্দাদের কল্যাণার্থ আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে কর্জ-ঋণ চেয়েছেন এতে বান্দাদের কল্যাণ করাই উদ্দেশ্য। সারকথা হলো, যেমন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় প্রয়োজন ছাড়াই বান্দাদের কাছে কর্জ চেয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় প্রয়োজন ছাড়াই জিন এবং মানব জাতিকে তাঁর এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন বান্দাদের কল্যাণার্থ।

অতএব, লেখকের কথা خَالِقٌ بِلَاحَاجَةٍ প্রয়োজন ছাড়া সৃষ্টিকর্তা, ঠিকই হয়েছে এতে কোনো ধরনের সংশয় থাকতে পারে না।

رَازِقٌ بِلَامُؤْنَةٍ : আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ পূর্বক তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে রিযিক দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন, অথচ এতে তাঁর কোনো কষ্ট বা ক্লান্তিবোধ ও পরিশ্রমের কোনো প্রয়োজন হয় না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا.

"পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেননি।" অর্থাৎ, তাদের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত।

এ কথা সুস্পষ্ট, আল্লাহ তায়ালার ওপর এহেন গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার মতো কোনো ব্যক্তি বা শক্তি নেই। বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে তা গ্রহণ করে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। আর এ কথা পরম সত্য, এটা দাতা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা, এতে কোনো ধরনের ব্যতিক্রম হবে না। যেহেতু তাঁর কোনো ওয়াদা পালন করতে কোনো কষ্ট বা ক্লান্তির সম্মুখীন হতে হয় না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ.

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালাই রিযিকদাতা, শক্তিশালী এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী।”

ওপরযুক্ত আয়াতে ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ বলে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, সমস্ত প্রাণীকে রিযিক দেয়া আল্লাহর জন্য সহজ, এতে তাঁর কোনো ধরনের কষ্ট বা ভারী হওয়া কিছুই নয়। কেনোনা কষ্ট বা ভারী দুর্বলতার কারণে অনুভব হয়। আর আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তিনি ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ। শক্তিশালী, অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

অন্য আয়াতে বলেছেন :

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ.

“আপনি বলে দিন আমি কি ওই আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সাহায্যকারী স্থির করবো? যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং যিনি সবাইকে আহার দান করেন এবং তাঁকে কেউ আহার দান করে না।”

ওপরযুক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব তাঁর পরিপূর্ণ শক্তি ও অসীম ক্ষমতার পর তাঁর কোনো ধরনের দুর্বলতার অবকাশ থাকতে পারেনা। যখন তাঁর কোনো দুর্বলতা নেই, তখন সকল প্রাণীকে রিজিক দিতে তাঁর কোনো প্রকার কষ্ট বা ক্লান্তি বোধ হবে না ও হতে পারে না।

আল্লাহই মৃত্যু দানকারী ও পুনরুত্থানকারী

مُمِيْتٌ بِلَا مَخَافَةٍ، بَاعِثٌ بِلَا مَشَقَّةٍ

অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালা নির্ভয়ে মৃত্যুদানকারী, বিনা কষ্টে পুনরুত্থানকারী।

مُمِيْتٌ بِلَا مَخَافَةٍ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কোনো প্রাণীর মৃত্যু ঘটাতে কাউকে ভয় করেন না। কারণ তিনি সবকিছুর মালিক, সর্বশক্তিমান, একচ্ছত্র অধিপতি। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থাৎ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনিই সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

সব কিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান ও সক্ষম হওয়াটা একথা প্রমাণ করে, সব প্রাণীর জীবন দান করতে এবং মৃত্যু ঘটাতে তাঁর মধ্যে কারো ভয়-ভীতি নেই। কেনোনা, ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয় কোনো কিছুর ওপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও মালিকানা এবং ক্ষমতা না থাকার কারণে। আর আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও মালিকানা ও ক্ষমতা রাখেন, যখন যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা কোনো ব্যাপারে কাউকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। যেহেতু আল্লাহ ব্যতীত কোনো কিছুই কাউকে দান করা বা মৃত্যু দেয়ার ক্ষমতা বা শক্তি রাখে না, যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

لَايَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا.

"দুনিয়ার কেউ কারো মৃত্যু ঘটানো ও জীবন দান করা এবং পুনর্জীবন দান করার মালিক নয়।" বরং আল্লাহ তায়ালাই সবকিছুর পরিপূর্ণ অধিকারী ও ক্ষমতাবান, তাই পবিত্র কোরআনে তিনি বলেছেন:

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ.

"নিশ্চয় আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমার দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন ঘটবে।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালাই নির্ভয়ে সব প্রাণীর মৃত্যু ঘটানোর অধিকারী, অন্য কেউ নয় ও হতে পারে না।

অতএব প্রত্যেক মুমিনের জন্য এ আকিদা রাখা একান্ত কর্তব্য, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সকল প্রাণীর মৃত্যুদানকারী।

بَاعِثٌ بِلَامُشَقَّةٍ : আল্লাহ তায়ালাই মৃত্যুর পরে সব প্রাণীকেই আবার জীবিত করবেন, এতে তাঁর কোনো ধরনের কষ্ট বা ক্লান্তি বোধ হবে না। যেহেতু এ কাজ আল্লাহর জন্য অতি সহজ ব্যাপার। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ.

"আল্লাহ তায়ালা ওই সত্তা, যিনি প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্থিত্ব দান করেছেন। অতঃপর পুনর্বার তিনিই তাকে সৃষ্টি করবেন। এটা তার জন্য অতি সহজ।"

(সূরা রোম)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ.

অর্থাৎ, কাফিররা দাবি করে, তাদের কখনো পুনর্জীবন দান করা হবে না। তুমি বলো অবশ্যই হবে, আমার প্রভুর কসম, তোমাদের নিশ্চয় পুনর্জীবন দান করা হবে। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবিহিত করা হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

কারণ, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকে পুনর্জীবন দান করতে তার কিছুর প্রয়োজন নেই। তিনি সব বস্তুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাশীল। কোনো কাজ করতে তাঁর লেশমাত্র দুর্বলতা বা অক্ষমতার কোনো কারণ নেই। তাই আল্লাহ তায়ালা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন,

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْىِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"এগুলো এ কারণে, আল্লাহই সত্য এবং তিনিই মৃতদের জীবিত করেন এবং তিনিই সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ.

"আর নিশ্চয়ই কেয়ামত অত্যাসন্ন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর কবরে যারা সমাহিত আছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের পুনর্জীবন দান করবেন।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, মৃতকে পুনর্জীবন দান করতে তাঁর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। তাই এতে তাঁকে কোনো ধরনের অপারগতা, দুর্বলতা, স্পর্শ করতে পারে না।

সুতরাং মৃতকে জীবিত করতে তাঁর কোনো কষ্ট হবে না। অতএব তিনি বিনা কষ্টে পুনর্জীবন দানকারী। এই আকিদা প্রত্যেক মুমিনের থাকতে হবে, নতুবা মুমিন হতে পারবে না।

আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টির আগ থেকেই সর্বকালের, সর্বাবস্থায়, সর্বগুণে গুণান্বিত

مَازَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيْمًا قَبْلَ خَلْقِهِ لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَاتِهِ وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ اَزَلِيًّا كَذٰلِكَ لَايَزَالُ عَلَيْهَا اَبَدِيًّا.

অনুবাদ : সৃষ্টির আগ থেকেই তিনি তাঁর গুণাবলীর সঙ্গে শাশ্বত সত্তা হিসেবে বিদ্যমান আছেন। সৃষ্টি করার কারণে তার এমন কোনো গুণ বৃদ্ধি পায়নি যা মাখলুক সৃষ্টির আগে ছিলো না। তিনি স্বীয় গুণাবলীসহ যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনি তিনি স্বীয় গুণাবলীসহ অনন্ত, চিরকাল ও চিরঞ্জীব থাকবেন।

مَازَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيْمًا : অর্থাৎ, মাখলুক সৃষ্টির পরে আল্লাহ তায়ালার যেসব গুণাবলী প্রকাশ হয়েছে। মাখলুক সৃষ্টির আগেও অনাদিকাল থেকেই তিনি সেসব গুণে গুণান্বিত ছিলেন। মাখলুক সৃষ্টির পরে তাঁর কোনো গুণ বৃদ্ধি পায়নি এবং মাখলুক ধ্বংসের পরেও তাঁর কোনো গুণ বৃদ্ধি পাবে না। তিনি অনাদিকাল থেকেই যে সব গুণে গুণান্বিত আছেন, অনন্তকাল এসব গুণে গুণান্বিত থাকবেন। কারণ, আল্লাহ ওই সত্তাকে বলা হয়, যার মধ্যে পরিপূর্ণ গুণাবলী পরিপূর্ণ গুণাবলী বা আছমায়ে হুসনার সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং যখনই আল্লাহ শব্দ উচ্চারিত হয়, তখনই আল্লাহর সত্তা এবং তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলী উদ্দেশ্য হয়। তাই পবিত্র কোরআন ও হাদিসের ভাষায় আল্লাহ শব্দ দ্বারা আল্লাহর সত্তা এবং তাঁর সমস্ত পরিপূর্ণ গুণাবলী বুঝনো উদ্দেশ্য হয়। ছিফাত বাদ দিয়ে শুধু তাঁর সত্তা অথবা সত্তা বাদ দিয়ে শুধু তাঁর ছিফাত উদ্দেশ্য হয় না। এ আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো, আল্লাহর গুণসমূহ তাঁর অনাদি সত্তাগত, এগুলো তাঁর সত্তাতে নবাগত নয়। অতএব আল্লাহর গুণসমূহ তাঁর সত্তা থেকে কোনো সময়, কোনো কালে ও কোনো অবস্থাতেই পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয় ও সম্ভব হতে পারে না।

ওপরযুক্ত আলোচনা হতে এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেলো, আল্লাহর সত্তা অনাদি, তাঁর গুণসমূহও অনাদি। যেভাবে তিনি নিজেই চিরন্তন, তেমনিভাবে তাঁর গুণসমূহও চিরন্তন। সত্যিকারের মুমিনরা এই আকিদা পোষণ করেন।

কিন্তু মু'তাযেলারা আল্লাহর গুণসমূহকে হাদেস অর্থাৎ, নবাগত মনে করেন বা আকিদা রাখেন।

لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا الخ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা মাখলুক সৃষ্টির পর, তাদের খানাপিনা, সুখ-শান্তি, দুঃখ-কষ্ট, জীবন-মৃত্যু, অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করার কারণে তার কোনো গুণ বৃদ্ধি পায়নি এবং মাখলুক সৃষ্টির আগে অনাদিকাল তিনি যেসব গুণে গুণান্বিত ছিলেন অনন্তকাল তিনি এসব গুণে গুণান্বিত থাকবেন। এতে কোনো সময়, কোনো অবস্থাতে কোনো ধরনের কম বেশি হবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, মাখলুক সৃষ্টির আগে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত পরিপূর্ণ গুণে গুণান্বিত হওয়ার অর্থ কি?

জবাব : মাখলুক সৃষ্টির আগে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় পরিপূর্ণ গুণে যেমন خَالِق-সৃষ্টিকর্তা, رَبّ-প্রতিপালন, رَازِق-রিযিকদাতা, مُحْيِي-জীবনদাতা, مُمِيْت-মৃত্যুদাতা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হওয়ার অর্থ হলো, তিনি এসব কাজ বা গুণের সর্বময় ক্ষমতা বা শক্তি সর্বদা রাখেন। আর মাখলুক সৃষ্টির পরে এসব পরিপূর্ণ গুণসমূহের অর্থ হবে, তিনি স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী মাখলুকের মধ্যে আপন গুণগুলো কার্যে পরিণত করবেন। যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করবেন, যাকে ইচ্ছা মৃত্যু ঘটাবেন। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করবেন, যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করবেন ইত্যাদি কার্যাদি স্বীয় ইচ্ছাধীন সম্পাদন করবেন।

মোটকথা, তিনি মাখলুক সৃষ্টির আগে যেসব গুণের অধিকারী ও ক্ষমতাবান ছিলেন, মাখলুক সৃষ্টির পরে এসব গুণ বাস্তবে মাখলুকের সামনে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়। সুতরাং মাখলুক সৃষ্টির পর আল্লাহর গুণাবলী বৃদ্ধি হওয়া এবং মাখলুক ধ্বংসের পর তাঁর গুণাবলী হ্রাস পাওয়ার কোনো অবকাশ নেই ও থাকতে পারে না।

অতএব আল্লাহ তায়ালা যেভাবে অনাদিকাল স্বীয় গুণাবলীসহ বিদ্যমান ছিলেন, সেভাবে তিনি অনন্তকাল স্বীয় গুণাবলীসহ বিরাজমান থাকবেন।

আল্লাহ আগ থেকেই নিজ গুণে গুণান্বিত

لَيْسَ مُنْذُ خَلَقَ الْخَلْقَ اِسْتَفَادَ اِسْمُ الْخَالِقِ وَلَابِاِحْدَاثِهِ الْبَرِيَّةَ اِسْتَفَادَا اِسْمُ الْبَارِئْ لَهُ مَعْنَى الرَّبُوْ بِيَّةِ وَلَا مَرْبُوْبَ وَمَعْنَى الْخَا لِقِيَّةِ وَلَا مَخْلُوْقَ كَمَا اَنَّهُ مُحْيِ الْمَوْتٰى بَعْدَ مَااَحْيٰ اِسْتَحَقَّ هٰذَا الْإِسْمُ قَبْلَ اِحْيَا ئِهِمْ كَذَا اِسْتَحَقَّ اِسْمُ الْخَالِقِ قَبْلَ اِنْشَا ئِهِمْ.

অনুবাদ : মাখলুক সৃষ্টির পর থেকে তিনি স্বীয় গুণবাচক নাম خالق 'সৃষ্টিকর্তা' অর্জন করেননি। আর তিনি নিখিল জগত সৃষ্টি করার কারণে স্বীয় গুণবাচক নাম بَارِى 'উদ্ভাবক' অর্জন করেননি।

প্রতিপল্যের অবর্তমানেও তিনি প্রতিপালকের গুণে গুণান্বিত এবং মাখলুক সৃষ্টির অবর্তমানে তিনি খালিক-সৃষ্টিকর্তার গুণের অধিকারী। যেমন তিনি মৃতকে জীবন দান করার পর মুহ্য়ী জীবন দানকারীরূপে প্রমাণিত হয়েছেন, তদ্রূপ কোনো প্রাণীকে জীবন দান করার আগেও তিনি মুহ্য়ী 'জীবন দাতা' গুণের অধিকারী ছিলেন। তেমনিভাবে তিনি মাখলুক সৃষ্টির আগেও গুণের অধিকারী ছিলেন।

لَهُ مَعْنَى الرَّبُوْ بِيَّةِ وَلَا مَرْبُوْبَ الخ অর্থাৎ, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর যে সব গুণবাচক নামের কথা উল্লেখ করেছেন, মাখলুক সৃষ্টির আগেই তিনি এসব গুণের অধিকারী ছিলেন। কেনোনা, পবিত্র কোরআনে তাঁর সমস্ত গুণবাচক নামগুলোকে আল্লাহ শব্দের সঙ্গে 'মাযী মুত্লাক' সাধারণ অতীতকালের শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمًا "আল্লাহ তায়ালাই সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ"

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا "আল্লাহ তায়ালাই সর্বজ্ঞ সহনশীল"

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْئٍ مُحِيْطًا "আল্লাহ তায়ালাই সব বস্তুর বেষ্টনকারী"

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا "আল্লাহ তায়ালাই ক্ষমাশীল দয়ালু"

وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا "আল্লাহ তায়ালাই সব কিছু দেখেন, শোনেন"

এভাবে আরো অনেক গুণবাচক নামসমূহ উল্লেখ করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, এসব গুণ অনাধিকাল থেকে আল্লাহর সত্তাগতভাবে মাখলুক সৃষ্টির

আগ থেকে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। এগুলো বাস্তবরূপে রূপায়িত হওয়ার জন্য মাখলুক সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়। অতএব আল্লাহ তায়ালার কর্মসমূহের সঙ্গে যদি এসব গুণবাচক নামের সম্পর্ক হতো অর্থাৎ, মাখলুকের সঙ্গে আল্লাহর কর্মের সম্পর্ক হওয়ার কারণে যদি এসব গুণবাচক নাম অর্জন হতো, তাহলে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত এসব গুণাবলীর নাম জগত সৃষ্টির আগে আল্লাহর সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হতো না। আর অনাদি-অনন্ত, ওয়াজিবুল ওজুদ, সমস্ত ছিফাতে কামালিয়ার সমষ্টিগত নাম আল্লাহ শব্দের সঙ্গে এসব গুণবাচক নাম মাযি মুতলাক (সাধারণ অতীত) শব্দের সঙ্গে উল্লেখ করতেন না। সুতরাং কোরআনের এ ব্যবহার থেকে একথা বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহর এসব গুণবাচক নামসমূহ এভাবে অনাদি, চিরস্থায়ী তাঁর নামের সঙ্গে প্রয়োগ করাটাই এ কথার প্রমাণ, আল্লাহর সমস্ত ছিফাতে কামালিয়া অনাধিকাল ছিলো এবং অনন্তকাল থাকবে। এগুলো তাঁর কোনো ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে প্রকাশের ওপর নির্ভরশীল নয়।

যেমন পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহর অনেক গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে :

هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ.لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।" তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যমান সবকিছু জানেন। তিনি পরম দয়ালু, একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তা দাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে (আল্লাহর সঙ্গে) অংশীদার করে আল্লাহ তায়ালা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।"

ওপরযুক্ত আয়াতে উল্লেখিত গুণবাচক নামগুলো কোনো কালের সঙ্গে সীমাবদ্ধ না করে, আল্লাহর নামের ওপর প্রয়োগ করার অর্থ হলো, তিনি মাখলুক সৃষ্টির আগে অনাদিকাল থেকে খালিক-সৃষ্টিকর্তা, বারী-উদ্ভাবক, মুছাওয়ারির-রূপদাতা, এভাবে মাখলুক সৃষ্টির পরেও অনন্তকাল সর্বগুণে গুণান্বিত থাকবেন। নতুবা আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোকে কোনো স্থান বা কালের সঙ্গে সীমাবদ্ধ না করে তাঁর সত্তার ওপর প্রয়োগ করতেন না।

অতএব একথা প্রমাণিত হয়ে গেলো, আল্লাহ তায়ালা অনাদিকাল পরিপূর্ণ গুণাগুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং অনন্তকাল এসব গুণে গুণান্বিত থাকবেন।

যেমন কারো লেখার যোগ্যতা আছে, যখন সে কোনো কিছু লেখে তখন তাকে লেখক বলা যায়। আবার যখন কোনো কিছু না লেখে তখনও তাকে লেখক বলা হয়ে থাকে। উক্ত ব্যক্তি লেখক নামে অভিহিত হওয়া লেখা নামক ক্রিয়ার কারণে নয়; বরং সে লেখার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ার কারণেই সে লেখক, আপাতত সে লেখুক বা না-ই লেখুক।

আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশীল

ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، كُلُّ شَيْءٍ اِلَيْهِ فَقِيْرٌ وَكُلُّ اَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيْرٌ لَا يَحْتَاجُ اِلٰى شَيْءٍ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

অনুবাদ : এসব কারণেই যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশীল, আর সবকিছুই আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী এবং সব বিষয়ই তাঁর জন্য সহজ। তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সাদৃশ্য কোনো কিছুই নেই এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী।

ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ الخ : অর্থাৎ, ওপরযুক্ত কথাগুলো এ কারণেই মেনে নিতে হয়, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশীল, তাঁর ক্ষমতার বাইরে কোনো কিছু নয়। আর যেহেতু সবকিছু স্বীয় অস্তিত্ব লাভ করার বা টিকে থাকার ব্যাপারে আল্লাহরই মুখাপেক্ষী। আর সবকিছুকে অস্থিত্বদান করা এবং টিকিয়ে রাখা আল্লাহর জন্য একেবারে সহজ, যেহেতু তিনি কোনো ব্যাপারে কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন; বরং সবকিছুই সর্ব ব্যাপারে তাঁরই মুখাপেক্ষী।

আল্লাহই সব বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন

خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهٖ وَقَدَّرَ لَهُمْ اَقْدَارًا وَضَرَبَ لَهُمْ اٰجَالًا

অনুবাদ : তিনি স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য সবকিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন এবং তাদের জন্য জীবন মৃত্যুর সময়সমূহ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهٖ : আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আসমান, জমিন এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছু স্বীয় জ্ঞান অনুসারে সৃষ্টি করেছেন। কোনো কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

অর্থাৎ, তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান, তিনিই অপ্রকাশমান এবং তিনিই সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী।

অন্য আয়াতে বলেছেন :

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

"তিনি কি জানেন না? যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সূক্ষ্ম জ্ঞানী সম্যক জ্ঞাত।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই নেই।

সুবিবেকও একথা সমর্থন করে, আল্লাহ তায়ালা মাখলুক সৃষ্টি করে তাতে যে পরিমাণ জ্ঞান, মর্যাদা, যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, এসবই তাঁর পক্ষ থেকেই। যেহেতু তিনিই সব কিছু আবিষ্কার করেছেন এবং প্রত্যেক মাখলুকের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় সব কিছু তিনিই দিয়েছেন। যেমন, পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

رَبُّنَا الَّذِيْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى "আমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।" এ কথাটি বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, মাখলুক সৃষ্টিকর্তা এবং তাদের মর্যাদা, যোগ্যতা বা কামালিয়াত প্রদানকারী বা সৃষ্টিকর্তা এসব গুণ থেকে শূন্য। বরং এ কথা বিশ্বাস রাখতে হবে, তিনি এসব গুণের সর্বাগ্রে অধিকারী ও উপযোগী। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা তাঁর মাখলুক সৃষ্টি করার আগেই মাখলুকের সব কিছুই জেনে থাকা কর্তব্য। যদি তিনি তা না জানেন না। অথচ আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছু নয়।

وَقَدَّرَ لَهُمْ اَقْدَارًا : قَدَّرَ শব্দটি تقدير মাছদার থেকে নির্গত। تَقْدِيْر শব্দের অর্থ, ভাগ্য নির্ধারণ করা, পরিমাণ নির্ধারিত করা। اَقْدَارٌ শব্দটি قَدْر এর বহু বচন, قَدْر শব্দের অর্থ ভাগ্য সংখ্যা, পরিমাণ নিরূপণ করা।

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বস্তুর পরিমাণ ও ভাগ্য নির্ধারিত করে

রেখেছেন। এই তকদির ভাগ্য বা পরিমাণ অনুযায়ী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছুকে এ নির্ধারিত পরিমাণ মতো প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী দিয়ে পরিচালনা করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ (سورة حجزن)

"আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে, আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই অবতারণ করি।" (সূরা হিজর)

অন্য আয়াতে বলেছেন : وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا.

"তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পরিমিতভাবে শোধিত করেছেন।" (সূরা ফুরকান)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

"নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা কমর)

قَدْر শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিমাণ করা, কোনো বস্তু উপযোগিতা অনুসারে পরিমিত রূপে তৈরি করা। এ আয়াতে এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের সব শ্রেণীর বস্তু বিজ্ঞ সুলভ পরিমাণ সহকারে ছোট, বড় ও বিভিন্ন আকার আকৃতিতে তৈরি করেছেন।

শরিয়তের পরিভাষায় قَدْر শব্দটি এলাহী তকদির তথা বিধি-লিপির অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসিরবিদগণ কোনো কোনো হাদিসের ভিত্তিতে এই আয়াতের এ অর্থই ধরে নিয়েছেন।

মুসনাদে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযীর বর্ণনা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, কোরাইশের কাফিররা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তকদির সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুর তকদির অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ, আদিকালে সৃজিত বস্তু, তার পরিমাণ, সময়কাল, হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ বিশ্ব অস্তিত্ব লাভের আগেই লেখে দেয়া হয়েছিলো। এখন বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি লাভ করে, তা-ই আদিকালীন তক্দির অনুযায়ীই সৃষ্টি লাভ করে।

تَقْدِيْر **তক্দির :** ইসলামের একটি অকাট্য ধর্ম বিশ্বাস। যে একে সরাসরি অস্বীকার করে সে কাফির। আর যারা দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার কর, তারা ফাসেক।

আহমদ, আবু দাউদ ও তাবারানীতে বর্ণিত হাদিসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতে কিছু লোক অগ্নিপূজারী থাকে, আমার উম্মতের মজুসি তারা যারা তকদির মানে না। এরা অসুস্থ হলে এদের খবর নিয়ো না এবং মরে গেলে কাফন দাফনে শরিক হয়ো না। (মাআরেফুল কোরআন, রুহুল মায়ানী)

وَضَرَبَ لَهُمْ اَجَالًا : আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত সৃষ্টি অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকার সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন। এ নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত সবকিছুই বিদ্যমান ও সঠিক থাকবে। যখন এ নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাবে, তখন আসমান, জমিন এবং তার মধ্যে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। উক্ত এবারতে اٰجَال শব্দটি اَجَل-এর বহুবচন, আর اَجَل শব্দের অর্থ– আয়ু, মৃত্যু, মৃত্যুকাল, মৃত্যু। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক সৃষ্টির আয়ু, মৃত্যুকাল, ধ্বংস ও মৃত্যুর সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন। আর এ সময় আসার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু মরে যাবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

مَاخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى (سورةروم)

"আল্লাহ তায়ালা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।" অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَايَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ.

"প্রত্যেক সম্প্রদায় একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। অতঃপর যখন তাদের নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে।"

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ "প্রত্যেক ওয়াদা নির্ধারিত সময় লিখিত আছে।" (সূরা রা'দ)

وَلِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ : এখানে اَجَل শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ। كِتَاب শব্দটি এখানে ধাতু, এর অর্থে লেখা। উল্লেখিত আয়াতগুলোর অর্থ হলো, প্রত্যেক বস্তুর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনাকালে লেখে নিয়েছেন, অমুক ব্যক্তি, অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে। কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে তা-ও লিখিত আছে। (মাআরেফুল কোরআন) সুতরাং তক্দিরের প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেকটি মুমিনের ঈমানী কর্তব্য। যেহেতু এটি অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত।

কোনো বস্তু আল্লাহ্ থেকে গোপন নয়

لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَىْءٌ قَبْلَ اَنْ خَلَقَهُمْ، وَعَلِمَ مَاهُمْ عَامِلُوْنَ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَهُمْ.

অনুবাদ : মাখলুক সৃষ্টির আগে আল্লাহ থেকে কোনো বস্তু গোপনীয়, লুক্কায়িত, অজ্ঞাত ছিলো না এবং তাদের সৃষ্টি করার আগে তাদের পরবর্তী কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত ছিলেন।

لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَىْءٌ الخ : অর্থাৎ, মাখলুক সৃষ্টির পরে যেমন আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত, তাদের কোনো কিছু তাঁর থেকে লুক্কায়িত নয়, মাখলুক সৃষ্টির আগেও ঠিক তেমনিভাবে তাদের সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে অবগত ছিলেন। তাঁর থেকে কোনো কিছু গোপনীয় ছিলো না। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ.

"আল্লাহ থেকে আসমান ও জমিনের কোনো বস্তুই গোপন নেই।"

(সূরা আলে-ইমরান)

ওপরযুক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপী জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে, এ জ্ঞান থেকে কোনো জগতে কোনো কিছু গোপন নয়।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَافِىْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ.

"তুমি বলো, যদি তোমরা মনের কথা গোপন করে রাখো অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে পারেন। আসমান, যমীনে যা কিছু আছে, সে সবই তিনি জানেন।"

অন্য আয়াতে বলেছেন: وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ.

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কাজ কর সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ এ কথার প্রমাণ করে দিচ্ছে, আসমান, জমিনের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন ছিলো না এবং বর্তমানেও গোপন নয়, ভবিষ্যতেও গোপন থাকবে না। উভয় জাহান সৃষ্টির আগে হোক বা পরেই হোক। আর বান্দার কর্মের সৃষ্টিকারী স্বয়ং আল্লাহই, তাদের সৃষ্টি করার আগ

থেকেই তিনি এ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। কেনোনা মাখলুক থেকে যেসব কাজ সংঘটিত হয়, সবকিছুর ক্ষমতা ও যোগ্যতা আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে আমানত রেখেছেন। এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে, কোনো ব্যক্তি কারো কাছে কোনো বস্তু আমানত রাখবে, আর সে এ বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত থাকবে না? এটা অসম্ভব।

অতএব আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমগ্র মাখলুক সৃষ্টির আগ থেকেই মাখলুক এবং তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে সামগ্রিক অবগত আছেন। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

আল্লাহ্ আনুগত্যের আদেশ দেন এবং নাফরমানী থেকে নিষেধ করেন

وَاَمَرَ هُمْ بِطَاعَتِهٖ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهٖ

অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালা তাদের আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর নাফরমানী ও অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেছেন।

اَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهٖ الخ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র জিন ও মানব জাতিকে স্বীয় এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর এ এবাদতের রীতি বাতলিয়ে তাদের তাঁর আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ থেকে রিবত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু যথাযথভাবে আল্লাহর আদেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা এবং তাঁর নিষেধকৃত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নামই এবাদত। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى، وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান-খয়রাত করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত-গর্হিত কাজ এবং অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন– যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এটি হচ্ছে পবিত্র কোরআনের ব্যাপকতর মর্মার্থবোধক একটি আয়াত। হযরত আকসাম

ইবনে সায়ফী (রা.) নামক একজন সাহাবি এ আয়াত শ্রবণ করেই মুসলমান হয়েছিলেন।

ইমাম ইবনে কাসীর হাফেজে হাদিস আবু ইয়ালার গ্রন্থ মা'রিফাতুছাহাবা থেকে সনদসহ ঘটনা বর্ণনা করেন, আকসাম ইবনে ছায়ফী স্বীয় গোত্রের সর্দার ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের দাবি ও ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা বললো, আপনি সবার প্রধান! আপনার নিজের যাওয়া সমীচীন নয়। আকসাম বললেন, তবে গোত্র থেকে দু'জন লোক মনোনীত করো। তারা সেখানে যাবে এবং প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে জানাবে। মনোনীত দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, আমরা আকসাম ইবনে ছায়ফীর পক্ষ থেকে দু'টি বিষয় জানতে এসেছি। আকসামের প্রশ্ন দু'টি এই مَنْ اَنْتَ، وَمَا اَنْتَ আপনি কে? এবং কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এরপর তিনি সূরা নহলের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ الخ.

উভয় দূত অনুরোধ করলেন, এ বাক্যগুলো আমাদেরকে আবার শোনানো হোক! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতটি একাধিকবার তেলাওয়াত করলেন, ফলে শেষপর্যন্ত আয়াতটি তাদের মুখস্ত হয়ে গেলো। দূতদ্বয় আকসাম ইবনে ছায়ফীর কাছে ফিরে এসে উল্লেখিত আয়াত শুনিয়ে দিলেন। আয়াতটি শোনেই আকসাম বললেন, এতে বোঝা যায়, তিনি উত্তম চরিত্রের আদেশ দেন এবং মন্দ ও অসৎ চরিত্র অবলম্বন করতে নিষেধ করেন। তোমরা সবাই তাঁর ধর্মের দীক্ষা নাও, যাতে তোমরা অন্যদের অগ্রে থাকো এবং এতে পশ্চাতে না পড়ো। (ইবনে কাছির)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তিনটি বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন। সুবিচার, অনুগ্রহ, আত্মীয়দের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেন। অশ্লীলতা, যাবতীয় মন্দকাজ এবং জুলুম ও উৎপীড়ন। এ ছয়টি ইতিবাচক ও নেতিবাচক নির্দেশের প্রতি চিন্তা করলে দেখা যায়, এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি। অতএব এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো, আল্লাহ তায়ালা আনুগত্যের আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ দেন।

সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয়

كُلُّ شَيْءٍ يَجْرِىْ بِقُدْرَتِهٖ وَمَشِيَّتِهٖ تَنفُذُ لَا مَشِيَّةَ لِلْعِبَادِ اِلَّا مَاشَاءَ لَهُمْ فَمَاشَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَالَمْ يَشَاءُ لَمْ يَكُنْ.

অনুবাদ : সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় পরিচালিত হয়, তাঁর ইচ্ছাই কার্যকর হয়, বান্দার কোনো ইচ্ছা কার্যকর হয় না। তবে তিনি তাদের জন্য যা ইচ্ছা করেন তা-ই হবে। অতএব তিনি তাদের জন্য যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয় এবং তিনি তাদের জন্য যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না।

كُلُّ شَيْءٍ يَجْرِىْ بِقُدْرَتِهٖ الخ : অর্থাৎ, দুনিয়ার সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুসারে সংঘটিত ও পরিচালিত হচ্ছে। যেহেতু তাঁর ইচ্ছাই সর্বাবস্থায়, সর্বকালে ও সর্বস্থানে বাস্তবায়িত হয়। এতে কোনো বান্দা বা কোনো মাখলুকের কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ বা হস্তক্ষেপ নেই; বরং যে সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত দাস। যেমন আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ.

"আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাঁরই অনুগত এবং তাঁরই দিকে এদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :

وَقَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهٗ بَلْ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَهٗ قٰنِتُوْنَ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"তাঁরা (ইয়াহুদ ও নাছারা) বলে আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব থেকে পবিত্র; বরং আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই তাঁর। সব তাঁর আনুগত্যশীল। তিনিই আসমান যমীনের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোনো কাজ সম্পাদনের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত করেন, তখন তিনি সেটিকে (এ কথা) বলেন, হয়ে যাও, তৎক্ষণাতই তা হয়ে যায়।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আসমান ও যমীনের সব কিছু আল্লাহর হুকুম অনুসারে চলছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

مَشِيَّتُهٗ تَنفُذُ لَا مَشِيَّةَ لِلْعِبَادِ الخ : অর্থাৎ,আল্লাহর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়, বান্দার ইচ্ছা অনুসারে কোনো কিছু সংঘটিত হয় না। কিন্তু বান্দার ইচ্ছাসমূহ যখন আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হয়, তখন বান্দার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবে।

অতএব আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের জন্য যা ইচ্ছা করেন তাই হয় । আর তিনি তাদের জন্য যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না। তাদের শত ইচ্ছা থাকলেও। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَمَا تَشَائُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

"আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনো ইচ্ছা কার্যকর করতে পারবে না।"

এ সম্পর্কে হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.) বুস্তানুল মুহাদ্দেসিন ব্যতীত ইমাম শাফিয়ী (রা.)-এর একটি সুন্দর কবিতা উল্লেখ করেছেন। এর প্রথম ছন্দটুকু এখানে তুলে ধরছি। তিনি বলেন :

اِذَا شِئْتَ كَانَ وَاِنْ لَّمْ اَشَاءَ * وَمَا شِئْتُ اِنْ لَّمْ تَشَاءُ لَمْ يَكُنْ.

"যখন তুমি যা ইচ্ছা করো, তা হয়ে যায়, যদিও আমি তা ইচ্ছা করি না। আর আমি যা ইচ্ছা করি, তা হয় না। যদি তুমি তা ইচ্ছা না করো।"

মোটকথা, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছু হয় নাই ও হচ্ছে না এবং কখনো হবে না। যদিও বান্দা শত ইচ্ছা করে থাকুক না কেনো।

আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেন

يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَيَعْصِمُ وَيُعَافِىْ فَضْلًا وَيُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِىْ عَدْلًا وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُوْنَ فِىْ مَشْيَتِهٖ بَيْنَ فَضْلِهٖ وَعَدْلِهٖ.

অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ পূর্বক হেদায়াত, আশ্রয়, নিরাপত্তা প্রদান করেন। আর তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় ন্যায় বিচার পূর্বক পথভ্রষ্ট, অপমানিত এবং বিপদগ্রস্থ বা রোগাক্রান্ত করে পরীক্ষায় ফেলেন। সবাই তাঁর ইচ্ছার অধীনে তাঁর অনুগ্রহ ও ন্যায় বিচারের মাঝে আবর্তিত হয়ে থাকে।

يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَيَعْصِمُ وَيُعَافِىْ فَضْلًا.

অর্থাৎ, কোনো মানুষ স্বীয় ইচ্ছা বা চেষ্টায় হেদায়াত, আশ্রয় নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে না; বরং আল্লাহ তায়ালা স্বীয় দয়া গুণে যাকে ইচ্ছা হেদায়াত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَمَنْ يَشَاءِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَّشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সহজ সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং এর ওপর অটল রাখেন।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ.

"আল্লাহ তায়ালা যাকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করতে চান তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার বক্ষকে অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন, যেনো সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে।"

(সূরা আনআম)

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যা চান তা-ই হয়। তিনি যা চান না, তা হয় না। অতএব হেদায়াত, পথভ্রষ্টতা, অনুগ্রহ, বঞ্চনা, আশ্রয়, বিপদগ্রস্থ, রোগাক্রান্ত– এক কথায় জগতের সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে। এতে কোনো বান্দা বা কোনো মাখলুকের কোনো দখল নেই।

فَضْلًا : ফযল এ ধরনের দানকে বলা হয়, বান্দা ব্যক্তিগতভাবে যেসব বস্তু পাওয়ার যোগ্য নয়, এসব বস্তু তাকে দান করা এবং এ ধরনের অনুদানে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া, যা তার মর্যাদা বা যোগ্যতা হিসেবে পাওয়ার অধিকারী বলে গণ্য হয় না।

وَيُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِىْ عَدْلًا : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষকে বিনা কারণে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে পথভ্রষ্ট, অপমানিত বিপদগ্রস্থ বা রোগাক্রান্ত করেন না; বরং মানুষের কর্মের ফল হিসেবে তার ন্যায়বিচারে তাদের পথভ্রষ্ট, অপমানিত, বিপদগ্রস্থ বা রোগাক্রান্ত করেন। কেনোনা, আদল (العدل) শব্দের আভিধানিক অর্থ সম্মান করা, কমবেশি না করা। এর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেই বিচারকদের জনগণের বিরোধ সংক্রান্ত মোকাদ্দমায় সুবিচারমূলক ফয়সালাকে اَلْعَدْلُ (আদল) বলা হয়। এ অর্থের দিক দিয়েই স্বল্পতা ও বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও আদল বলা হয়। এ কারণে কোনো কোনো তফসীরবিদ বলেন, 'আদল' হচ্ছে অন্যের অধিকার পুরোপুরি দেয়া এবং নিজের অধিকার পুরো পুরি নেয়া, কমও নয় বেশিও নয়। অতএব আল্লাহ তায়ালার বান্দার কর্মদোষে বিপদাপন্ন করাকে 'আদল' বলা যাবে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ.

"তোমাদের ওপর যেসব বিপদ আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মের ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ্ মাফ করে দেন।"

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্তার কসম যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির পায়ে কোনো কাঠের আঁচড় লাগে অথবা কোনো শিরা ধড়ফড় করে অথবা পা পিছলে যায়, তা সবই তার গুনাহর কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা সব পাপের শাস্তি দেননা এবং না দেয়ার সংখ্যাই বেশি।

(মা'আরিফুল কোরআন)

অতএব ওপরযুক্ত আয়াতে وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ দ্বারা আল্লাহর عَدْل (আদল)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ দ্বারা আল্লাহর ফজলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ.

"তোমার যে কল্যাণ হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। আর তোমার যে অকল্যাণ হয় তা তোমার নিজের কারণে হয়।"

ওপরযুক্ত আয়াত দ্বারা এ কথা প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, মানুষ যেসব নেয়ামত লাভ ও ভোগ করে তা তাদের প্রাপ্য নয়; বরং এগুলো একান্ত আল্লাহর অনুগ্রহেই তা প্রাপ্ত হয়। মানুষ যতই এবাদত বন্দেগী করুক না কেনো, তাতে কোনো নেয়ামত পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না। কারণ এবাদত করার সামর্থ্য বান্দা পেয়ে থাকে, তাও আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রদত্ত। তদুপরি আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত তো রয়েছেই। এ সমস্ত নেয়ামত সীমিত এবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে কেমন করে লাভ করা সম্ভব? তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَايَدْخُلُ اَحَدُنَا الْجَنَّةَ بِعَمَلِهٖ

"কোনো ব্যক্তি নিজ আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" আল্লাহর রহমত– দয়া ব্যতীত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, আপনিও কি পারবেন না? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিও না।

আর মানুষের ওপর যেসব বিপদাপদ আসে, তা তাদের অসৎ কর্মের কারণে। মানুষ যদি কাফের হয়ে থাকে তবে তার ওপর আপতিত এ বিপদাপদ তার জন্যে সেসব আজাবের একটা নমুনা হয়ে থাকে, যা আখেরাতে তার জন্যে

নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ আখেরাতের আজাব-এর চাইতে বহু গুণ বেশি। আর যদি মানুষ মুমিন হয়, তবে তার ওপর আপতিত এ বিপদাপদ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, যা আখেরাতে তার জন্য মুক্তির কারণ হবে। যেমন এক হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোনো বিপদ নেই, যা কোনো মুসলমানের ওপর পতিত হয়, অথচ তাতে আল্লাহ তায়ালা সে লোকের কোনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন না। এমনকি, কাটা তার পায়ে বেধে তা-ও।" (মাআরেফুল কোরআন)

অতএব ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস দ্বয়ের মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো, উল্লেখিত আয়াত مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ দ্বারা আল্লাহর ফজলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ

দ্বারা আল্লাহর আদলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল্লাহর সিদ্ধান্তই অটল থাকে, এর পরিবর্তনকারী কেউ নেই

لَارَادَّ لِقَضَائِهٖ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ وَلَا غَالِبَ لِاَمْرِهٖ

অনুবাদ : আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রত্যাখ্যানকারী কেউ নেই, আর তাঁর হুকুম-নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই এবং তাঁর হুকুম ও কাজের ওপর প্রভাববিস্তারকারী কেউ নেই।

لَارَادَّ لِقَضَائِهٖ : আল্লাহ তায়ালা কারো অনুকূলে বা প্রতিকূলে ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত দিলে তা পরিবর্তন বা প্রত্যাখ্যান করার মতো কোনো মাখলুক নেই ও থাকতে পারে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهٖ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"আল্লাহ যদি তোমার ওপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন, তাহলে তা খণ্ডাবার মতো কেউ নেই, তিনি ছাড়া। আর যদি তিনি তোমাকে কল্যাণ দান করার ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর অনুগ্রহকে ফিরিয়ে দেয়ার মতো কেউ নেই। তিনি স্বীয়

বান্দাদের মধ্যে যাকে অনুগ্রহ করতে চান, তাকেই তা দান করেন। বস্তুতঃ তিনিই ক্ষমতাশীল দয়ালু।" অন্য আয়াতে বলেছেন :

مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ.

"আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা প্রেরণকারী কেউ নেই, তিনি ব্যতীত।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা কোনো বান্দা থেকে দুনিয়ার বিপদাপদ ফিরিয়ে রাখতে চাইলে, তাকে বিপদে ফেলার সাধ্য কারো নেই। এমনিভাবে আল্লাহ্ তায়ালা কোনো কারণবশতঃ কোনো বান্দাকে স্বীয় রহমত থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে, তাকে তা দেয়ার সাধ্য কারো নেই।

অতএব এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, আল্লাহর ফয়সালা কেউ ফেরাতে বা রদ করতে পারবে না।

وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যাকে যে নির্দেশ দেবেন, তা বাস্তবে পরিণত হবেই, তা পাল্টানো বা ফেরানোর কারো ক্ষমতা নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেন, তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই।

وَلَاغَالِبَ لِاَمْرِهِ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রত্যেক কাজে প্রবল ক্ষমতাশালী, কেউ তাঁকে তাঁর কাজ থেকে হঠাতে বা বিরত রাখতে পারবে না। যেহেতু দুনিয়ার সমস্ত মাখলুক তাঁর ক্ষমতার সামনে একেবারে অক্ষম, অকেজো-দুর্বল। তাই তিনি যা করেন, তাতে বাধা দেয়ার মতো কেউ নেই। সুতরাং তিনি সব কাজে প্রবল ক্ষমতাশীল। যেমন পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

وَاللهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"আর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কাজে প্রবল শক্তিমান কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" (সূরা ইউসুফ)

যখন আল্লাহ তায়ালার কোনো কিছুর ইচ্ছা হয়, তখন দুনিয়ার বাহ্যিক সব বস্তু তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সংগঠিত হয়ে যায়। যেমন এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলা রয়েছে, যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো কাজের ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সব উপকরণ তার জন্য প্রস্তুত করে দেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বোঝে না, তারা বাহ্যিক উপকরণাদিকেই সবকিছু মনে করে।

ওপরযুক্ত গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তিনি ব্যতীত কেউ এসব গুণের অধিকারী বা উপযোগী নয় ও হতে পারে না।

আল্লাহ সব সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বীসমূহের উর্ধ্বে

وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْاَ ضْدَادِ وَالْاَ نْدَادِ

অনুবাদ : তিনিই সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষের ঊর্ধ্বে।

وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْاَ ضْدَادِ وَالْاَ نْدَادِ : মুতায়ালিন- (مُتَعَال) শব্দের অর্থ, উচ্চ, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। আযদাদুন (اَضْدَاد) যিদ্দুন (ضِدّ)-এর বহুবচন, যিদ্দুন (ضِدّ) শব্দের অর্থ, বিপরীত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ, বিরোধী, এখানে مُتَعَال-এর অর্থ, ঊর্ধ্বে, আর اَضْدَاد শব্দটি ضِدّ-এর বহুবচন। এর অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী। আর আন্দাদ اَنْدَاد শব্দটি (نِدّ) নিদ্দুন এর বহুবচন, নিদ্দুন (نِدّ) শব্দের অর্থ, সমকক্ষ সমতুল্য-শরিক। অতএব উল্লেখিত বাক্যের অর্থ হবে, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এবং তাঁর সমকক্ষ হওয়ার মতো কেউ নেই এবং হতে পারে না, যেহেতু আল্লাহ তায়ালার সত্তা সব ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সমকক্ষতা থেকে পবিত্র ও মুক্ত এবং এ সবের ঊর্ধ্বে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ

"আপনি বলে দিন, তিনি আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।" اَللّٰه শব্দটি এমন এক সত্তার নাম, যিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। যিনি সর্বগুণে গুণান্বিত এবং সর্বদোষ থেকে মুক্ত, পবিত্র।

اَحَد এবং وَاحِد উভয় শব্দের অর্থ এক। কিন্তু اَحَد শব্দের অর্থে এটাও শামিল, তিনি কোনো এক অথবা একাধিক উপাদান দ্বারা তৈরি নন এবং তাঁর মধ্যে একাধিকত্বের কোনো সম্ভাবনা নেই এবং তিনি কারো তুল্য নন। এটা কাফিরদের সেই প্রশ্নের জবাব, যাতে বলা হয়েছিলো, আল্লাহ কিসের তৈরি? এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে আল্লাহর সত্তা এবং তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত আলোচনা এসে গেছে।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ : صَمَد শব্দের অর্থ সম্পর্কে তাফসিরবিদদের অনেক মতামত রয়েছে। এতে আমাদের পালনকর্তার গুণাবলীই ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু 'ছামাদ'

শব্দের আসল অর্থ সেই সত্তা, যার কাছে মানুষ আপন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করে, যার সমান মহান কেউ নয়। সার কথা হচ্ছে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

"কেউ আল্লাহর সমতুল্য নয় এবং আকার আকৃতিতে কেউ তাঁর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে না।" মোটকথা সূরা ইখলাছে আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ একাত্মতা সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সব ধরনের শিরক অংশীদারিত্বের অস্বীকৃতি রয়েছে। যেহেতু দুনিয়াতে আল্লাহর সঙ্গে শরিক অংশীদারিত্বে বিশ্বাসী এবং তাওহিদ একত্বতার অস্বীকারকারীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। সূরায়ে এখলাছ সব ধরনের মুশরিকানা আকিদা-বিশ্বাসকে অস্বীকার করে পরিপূর্ণ তাওহিদ একত্ববাদের ছবক শিক্ষা দিয়েছে। কেনোনা তাওহিদ অস্বীকারকারীদের মধ্যে (১) এক দল আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকারকারী। (২) কিছু সংখ্যক আল্লাহর অত্বিত্বের বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর চিরস্থায়ী চিরন্তন হওয়াকে অস্বীকার করে। (৩) আর কিছু সংখ্যক লোক তাঁর অস্তিত্ব ও চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাসী কিন্তু তারা আল্লাহর ছিফাতে কামালিয়াকে অস্বীকার করে। (৪) আর কিছু সংখ্যক আল্লাহর অস্তিত্ব ও চিরস্থায়িত্ব এবং তাঁর ছিফাতে কামালিয়াকে স্বীকার করে কিন্তু আল্লাহর এবাদতের মধ্যে অন্যকে শরিক করে, এসব ভ্রান্ত ধারণার অবসান اَللّٰهُ اَحَدٌ বাক্যের দ্বারা হয়ে গেলো। (৫) আর কিছু সংখ্যক লোক একমাত্র আল্লাহকেই এবাদতের যোগ্য মানে, এতে অন্যকে শরিক করে না, কিন্তু প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য পূরণকারী হিসেবে অন্যকেও আল্লাহর সঙ্গে শরিক মনে করে, এই বিভ্রান্তিকর ধারণা اَللّٰهُ الصَّمَدُ বাক্য দ্বারা বাতিল করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর জাত এবং ছিফাতের সঙ্গে মাখলুকের কোনো ধরনের তুলনায় বিশ্বাসীদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন করেছেন وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ বাক্য দ্বারা।

(মাআরিফুল কোরআন)

اٰمَنَّا بِذٰلِكَ كُلِّهٖ وَاَيْقَنَّا اَنَّ كُلًّا مِّنْ عِنْدِهٖ

অনুবাদ : ওপরে আলোচিত সব বিষয়ের প্রতি আমরা ঈমান আনলাম এবং এ কথার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলাম যে, এসব আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে।

অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ বলেন, আল্লাহর জাত ও পরিপূর্ণ গুণাগুণকে প্রমাণিত করার ব্যাপারে যেসব আলোচনা পেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর জাত ও ছিফাত যেসব ভ্রান্তি ও দুর্বলতা থেকে

মুক্ত ও পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে, এসবের প্রতি আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। যেহেতু এগুলো পবিত্র কোরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

নোট : আল্লাহ চাহে তো ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। তাই এখানে এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হলো না।

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী সম্পর্কে আকিদা

وَاَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ الْمُصْطَفٰى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبٰى وَرَسُوْلُهُ الْمُرْتَضٰى.

অনুবাদ : নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা ও মনোনীত নবী এবং সন্তোষভাজন রাসূল।

وَاَنَّ مُحَمَّدًا اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : শেষ নবীর নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত করা হলো কেনো?

এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব রয়েছে :

প্রথমতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সপ্তম দিন আব্দুল মুত্তালিব নবীজীর আকিকা করলেন এবং ওই উৎসবে সমস্ত কুরাইশদের দাওয়াত দিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম 'মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থির করলেন। তখন কুরাইশগণ প্রশ্ন করলেন, হে আবুল হারীছ (আব্দুল মুত্তালিব) আপনি এই নাম কেনো স্থির করলেন? যে নাম আপনার পূর্ব পুরুষদের কারো জন্য স্থির করা হয়নি? আব্দুল মুত্তালিব প্রতি উত্তরে বললেন, আমি এ কারণে তাঁর এ নাম রাখলাম, আল্লাহ তায়ালা আসমানে এবং তাঁর মাখলুক যমীনে এই নবজাত শিশুর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করবে।

দ্বিতীয়তঃ আব্দুল মুত্তালিব নবীজীর জন্মের আগে স্বপ্নে দেখেছিলেন, তার পিঠ থেকে একটি শিকল বের হয়েছে এবং এর এক দিক আসমানে আর অপর দিক যমীনে, একদিক আগে এবং অপর দিক পশ্চিমে। কিছুক্ষণ পর এ শিকলটি এমন একটি বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়ে গেলো, যার প্রত্যেকটি পাতা পল্লবে সূর্যের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি আলো ঝলমল করছে, আগ ও পশ্চিমের লোকজন এর ডালসমূহ আকড়িয়ে আছেন। কুরাইশেরও কিছু সংখ্যক লোক এর ডালসমূহ আঁকড়িয়ে আছেন। কুরাইশদের অপর কিছুসংখ্যক লোক এই বৃক্ষকে কেটে ফেলার ইচ্ছা করছে। এই লোকেরা যখন এ উদ্দেশ্যে বৃক্ষের কাছে আসে, তখন

একজন অত্যধিক সুদর্শন যুবক এসে এদেরকে হটিয়ে দেয়। স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতাগণ আব্দুল মুত্তালিবের এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এরূপ দিলেন, তোমার বংশে এমন একজন ছেলে জন্ম নিবেন, আগ থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লোকজন তাঁর অনুসরণ করবে এবং আসমান ও জমিনের আদিবাসীগণ তাঁর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করবেন। এ কারণে আব্দুল মুত্তালিব নবীজীর নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখলেন।

তৃতীয়তঃ নবীজীর সম্মানিতা মাতাকে স্বপ্ন যোগে বলা হলো, তুমি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নির্বাচিত এবং সমস্ত উম্মতের সায়্যিদকে গর্ভ ধারণ করেছো, সুতরাং এর নাম মুহাম্মদ রাখবে। অন্য এক বর্ণনায় আহমদ নাম রাখার নির্দেশ রয়েছে। আর ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় মুহম্মদ ও আহমদ নাম রাখার নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং নবীজীর দাদা আব্দুল মুত্তালিব এবং মাতা আমেনার স্বপ্নের প্রেক্ষিতে তাঁর নাম মুহাম্মদ ও আহমদ স্থির করা হলো। মোটকথা, ইলহামে রব্বানী এবং সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে দাদা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, সবের মুখ দিয়ে এই নাম নির্ধারিত করা হলো, পূর্বকার নবী-রাসূল (আ.)গণ যে নামের সুসংবাদ দিয়ে এসেছিলেন। যেভাবে আব্দুল মুত্তালিবের সমস্ত পুত্রদের মধ্য থেকে শুধু নবীজীর সম্মানিত পিতার এমন নাম স্থির করা হয়েছিলো, যা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় (আব্দুল্লাহ) নাম , ইল্‌কায়ে রাব্বানী ছিলো, এভাবে নবীজীর পবিত্র নাম মুহাম্মদ ও আহমদ স্থির করাটা ও ইলহামে রাহমানী ছিলো। আল্লামা নববী মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইবনে ফারিস থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা নবীজীর পরিবারবর্গের লোকজনের কাছে এ নাম রাখার জন্য ইল্‌হাম করেছেন, এ কারণে তারা এ নাম স্থির করেছেন। অতএব পবিত্র কোরআনে নবীজীর দুটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহতায়ালা বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ.

অর্থাৎ, যারা ঈমান গ্রহণ করলো এবং নেক আমল করলো এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, এর ওপর ঈমান নিয়ে এলো।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন :

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْ بَعْدِ اسْمُهٗ اَحْمَدُ.

"আর আমি এমন এক রাসূলের সুসংবাদ দিচ্ছি, যিনি পরে আসবেন। তাঁর নাম আহমদ।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, লওহে মাহফুজেই নবীজীর নাম মুহাম্মদ ও আহমদ নির্ধারিত করা হয়েছে। যেহেতু আসমানী প্রত্যেক কেতাবেই নবীজীর ওপরযুক্ত দু'টি নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

عَبْدُهٗ : অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দা। মুছান্নিফ (লেখক রহ.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য কামালাত-পরিপূর্ণ গুণাবলীর মধ্যে আবদিয়্যাত-দাসত্ব গুণটি প্রথমে উল্লেখ করার কারণ হলো, এ গুণটি বান্দার সমস্ত পদমর্যাদার মধ্যে শ্রেষ্ঠত· এবং সমস্ত কালামাতের ভিত্তি স্তম্ভ। যতই বান্দার মধ্যে আবদিয়্যাত-দাসত্ব গুণের প্রমাণাদি বৃদ্ধি পাবে, ততই তার পদ ও মর্যাদার পরিপূর্ণতা বৃদ্ধি হতে থাকবে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিফাতে আবদিয়্যাতের উঁচু শৃঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। সেহেতু আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠতম ও সম্মানিত স্থানসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছিফাতে আবদিয়্যাতের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا.

“এই সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি।” (সূরা বাকারা)

অন্য আয়াতে বলেছেন :

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا

“পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলা ভ্রমণ করিয়েছিলেন।” (সূরা বনি ইসরাঈল)

অন্য আয়াতে বলেছেন :

تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ.

“পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালা গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন।” (সূরা ফুরকান)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى

“তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবোর, তা প্রত্যাদেশ করলেন।” (সূরা নজম)

অন্য আয়াতে বলেছেন :

وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ

"আর যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হলো।" (সূরা জিন)

এ কারণেই তিনি সম্মানিত সব মহলে, সমগ্র মানবজাতির সম্মুখে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেশ করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন বানিয়েছেন এবং সমস্ত সৃষ্টির ওপর সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সমগ্র আদম সন্তানের ওপর প্রাধান্য লাভের অধিকারী করিয়েছেন। তাই তিনি সমগ্র নবী, রাসূল (আ.)গণের সায়্যিদ হিসেবে গণ্য হয়েছেন।

اَلْمُصْطَفٰى : শব্দের অর্থ : নির্বাচিত, মনোনীত ও পবিত্র ব্যক্তি।

اَلْمُجْتَبٰى : শব্দের অর্থ : মনোনিত, নির্বাচিত ব্যক্তি।

اَلْمُرْتَضٰى : শব্দের অর্থ : সন্তোষভাজন ব্যক্তি।

উল্লেখিত শব্দগুলো যদিও শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ গুণ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর নবী আলাইহিস সালামগণ এসব উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। যেহেতু সমস্ত নবী (আ.)গণ আল্লাহরই মনোনিত, নির্বাচিত ও সন্তোষভাজন। সুতরাং তাঁরা সব ধরনের গুনাহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন।

দুনিয়ার সব ধরনের উপাধি মানুষ তার চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে, কিন্তু নবুওত ও রেসালাত মানুষ তার চেষ্টা বা সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে না এবং কখনো পারবে না। যেহেতু নবুওত ও রেসালাত আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দান, এগুলো কারো সাধনালব্ধ বস্তু নয়। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই নবুওত ও রেসালাত প্রদান করে নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন।

"আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা নবুওত ও রেসালাতের জন্য মনোনীত করেন।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :

رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَاللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ

"আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী।" (সূরা হজ)

নবী রাসূল সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথমতঃ আল্লাহ্ তায়ালা নবুওত ও রেসালাতের জন্য এসব মানুষকে মনোনীত ও নির্বাচিত করেন। যাদের সম্পর্কে তিনি স্বীয় অনাদি ও অনন্ত জ্ঞানের মাধ্যমে একথা জানেন, তারা নবুওত ও রিসালতের গুরু দায়িত্ব পালন করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখেন, এতে তাঁদের থেকে বিন্দু মাত্র ভুল-ত্রুটি ও অবহেলা বা সংকীর্ণতা পরিলক্ষিত হওয়ার অবকাশ থাকে না এবং তাঁদের থেকে কোনো ধরনের পাপ তথা আল্লাহ-বিরোধী কোনো কথা বা কাজ সংঘটিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তাই আল্লাহর মনোনীত ও নির্বাচিত নবী, রাসূল থেকে কোনো ধরনের ভুল-ত্রুটি বা অযোগ্যতামূলক আচরণ বা আল্লাহ্ বিরোধী কোনো কাজ বা গুনাহ্ বা পাপ সংঘটিত হয়নি। তাই তিনি তাঁর কোনো নবী বা রাসূলকে নবুওত বা রেসালত থেকে পদচ্যুত করেননি। যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বদর্শী ও সর্বশ্রোতা, তাঁর দেখা ও শোনা এবং জানার বাইরে একটি বালিকণাও নেই। সেহেতু আল্লাহর মনোনয়ন ও নির্বাচনে ভুল-ত্রুটি হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ.

"আল্লাহ তায়ালাই খুব জানেন কোথায় স্বীয় রেসালাত অর্পণ করবেন।"

(সূরা আনআম)

নবুওত ও রেসালাত আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ দান, তিনি স্বীয় অনাদি ও অনন্ত জ্ঞান দ্বারা যাকে নির্বাচন করবেন, তাকেই তিনি নবুওত ও রেসালাতের জন্য মনোনীত করবেন।

সুতরাং যে বা যারা আল্লাহর কোনো নবীর (আ.) ওপর এ অভিযোগ করবে, তিনি স্বীয় দায়িত্বে ত্রুটি, অবহেলা ও সংকীর্ণতা করেছেন অথবা কোনো নবী (আ.)-এর ওপর কোনো ধরনের গুনাহর অপবাদ দেবে, সে পরোক্ষভাবে আল্লাহর ওপর অভিযোগ করলো, তিনি কেনো জেনে শোনে একজন দায়িত্ববোধহীন মানুষের ওপর নবুওতের মতো একটি গুরুদায়িত্ব অর্পণ করলেন। অথচ আল্লাহ্ তায়ালার কোনো কথা বা কাজে ভুল-ত্রুটির কোনো সম্ভাবনাই নেই। ভুল-ত্রুটি হওয়াটা দূরের কথা।

অতএব যারা এ ধরনের দৃষ্টতাপূর্ণ কাজে লিপ্ত হবে, অথবা এ ধরনের আকিদা পোষণ করবে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বের হয়ে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয়তঃ اَلْمُرْتَضٰى : অর্থাৎ, সন্তোষভাজন ব্যক্তি। এই কেতাবে এটি আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপাধি হিসেবে ভূষিত ছিলেন। যেহেতু তাদের থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিপন্থী কোনো কথা, কাজ ও গুনাহ হয়নি সেহেতু তারা সবাই নিষ্পাপ, বেগুনাহ, মাসুম এবং আল্লাহর সন্তোষ-ভাজন ছিলেন। কারণ গুনাহর কাজ শয়তানের কুমন্ত্রণা আর প্রবঞ্চনা ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন তিরমিযী শরিফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ اٰدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَاَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَاِيْعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ وَاَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَاِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ.

"নিশ্চয়ই আদম সন্তানের ওপর শয়তানের বলপ্রয়োগের ক্ষমতা রয়েছে এবং ফেরেশতারও বল প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। শয়তানের বল প্রয়োগের অর্থ হলো, মন্দ কাজ ও পাপাচারে অভ্যস্ত করানো এবং সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা।" আর ফেরেশতারা বললো প্রয়োগের অর্থ হলো, পূণ্যের কাজে অভ্যস্ত করানো এবং সত্যকে বিশ্বাস করানো।

আর পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে, আল্লাহর মনোনীত ও নির্বাচিত নবী-রাসূল (আ.)গণের ওপর শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রবঞ্চনা চলে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা শয়তানের কথা নকল করে বলেছেন :

فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ.

"হে আল্লাহ, তোমার ইজ্জতের কসম, আমি সমস্ত মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট ও পাপাচারে লিপ্ত করবো। কিন্তু এদের থেকে তোমার মনোনীত ও নির্বাচিত বান্দা (নবী-রাসূল)গণ ছাড়া।" (সূরা সাফফাত)

ওপরযুক্ত আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, শয়তান আল্লাহর মনোনীত ও নিবাচিত বান্দা নবী-রাসূল (আ.)গণকে পাপাচারে লিপ্ত করতে পারে না, এ থেকে অক্ষম। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে ছগীরা (ছোট) ও কবিরা (বড়) গুনাহসমূহ সরিয়ে রেখে আপন হেফাফতে রাখেন। যেমন পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউসুফ (আ.)কে জুলায়খার কুমন্ত্রণা ও কুমতলব থেকে রক্ষা করে বলেছেন :

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ.

"এমনিভাবে হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ ও নির্লজ্জ (ছগীরা ও কবিরা) গুনাহ সরিয়ে রাখি। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন।"

(সূরা ইউসুফ)

ওপরযুক্ত আয়াত পরিষ্কার প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর মনোনীত ও নির্বাচিত বান্দা নবী-রাসূলদের কাছ থেকে ছগিরা ও কবিরা গুনাহ সরিয়ে রেখেছেন।

অতএব, একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামগণ থেকে কোনো ধরনের গুনাহ সংঘটিত হওয়ার দূরের কথা, কোনো গুনাহ তাদের স্পর্শ করতে পারে না। তাই সমস্ত নবী (আ.)গণ আল্লাহ সন্তোষভাজন ছিলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই ও থাকতে পারে না এবং ওপরযুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়, আল্লাহর সমস্ত নবী-রাসূল (আ.)গণ মাছুম-নিষ্পাপ।

সুতরাং যারা নবীদের মাছুম-নিষ্পাপ মানে না, তারা পথভ্রষ্ট এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ। তাদের অহেতুক অভিযোগের তাত্ত্বিক জবাব বিস্তারিতভাবে কোরআন-হাদিস ও যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে "সত্যের পয়গাম" নামক বই লেখে প্রকাশ করেছি। পাঠকবৃন্দের কাছে ওই বইটি পড়ার আবেদন রইলো।

নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সংজ্ঞার) মধ্যে পার্থক্য

النبي والرسول : আল্লামা তাফতাজানী (রহ.) শরহে আকাইদে নাসাফীতে নবী ও রাসূলের সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলেছেন :

اَلرَّسُوْلُ اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللهُ تَعَالٰى اِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيْغِ الْاَحْكَامِ وَقَدْ يَشْتَرِطُ فِيْهِ الْكِتَابُ بِخِلَافِ النَّبِيِّ فَاِنَّهُ اَعَمُّ.

"রাসূল ওই মানুষ কে বলা হয়, যাকে আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করেছেন মাখলুকের কাছে দীনের আহকাম পৌঁছানোর জন্যে।" কেউ বলেছেন, রাসূল ওই ব্যক্তি, যাকে নতুন কেতাব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মাখলুকের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্যে। আর নবী ওই ব্যক্তি যাকে (আগের কেতাব অনুসারে) দীনের দাওয়াত মাখলুকের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অতএব এদের কথা অনুসারে প্রত্যেক রাসূল নবী ছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন।

আর অধিকাংশ আলিমগণের মতে, নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য শুধু একটাই, নবী সেসব ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলের হেদায়াত, পরিশুদ্ধি ও সংস্কার সাধনের জন্যে প্রেরণ করেছেন এবং তাদের প্রতি ওহি নাযিল করে ধন্য করেছেন, চাই তাদের জন্য কোনো স্বতন্ত্র আসমানী গ্রন্থ ও স্বতন্ত্র শরিয়ত নির্ধারিত হয়ে থাকুক অথবা পূর্ববর্তী কোনো নবীর গ্রন্থ ও শরিয়তের অনুসারীগণের হেদায়াতের জন্যে আদেশপ্রাপ্ত হন। যেমন হযরত হারুন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর গ্রন্থ ও শরিয়তের অনুসারীগণের হেদায়াতের জন্যে আদেশপ্রাপ্ত হন।

পক্ষান্তরে রাসূল শব্দটি বিশেষভাবে ওই নবীর জন্য প্রযোজ্য, যাকে সতন্ত্র গ্রন্থ ও সতন্ত্র শরিয়ত প্রদান করা হয়েছে। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী ও রাসূল উভয় পদ বা গুণের অধিকারী ছিলেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ.

"সে সমস্ত লোক, যারা আনুগত্য করে এ রাসূলের যিনি নিরক্ষর নবী, যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে সংরক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা পায়।"

অন্য আয়াতে নবীজীকে সম্বোধন করে বলেছেন :

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا.

"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী ও সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় ও আরো অনেক আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী ও রাসূল উভয় পদ বা গুণের অধিকারী ছিলেন।

খতমে নবুওতের সমাপ্তি সম্পর্কে আকিদা

وَاَنَّهٗ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِمَامُ الْاَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَحَبِيْبُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অনুবাদ : নিশ্চয় তিনি (মুহাম্মদ সা.) সর্বশেষ নবী, মুত্তাকীগণের ইমাম রাসূল (আ.)গণের সায়্যিদ এবং সমগ্র জাহানের প্রতিপালকের বন্ধু।

خاتم الانبياء : অর্থাৎ, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নবী-রাসূল আসবেন না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

ماكان محمد ابا احد من رجا لكم ولكن رسولَ الله وخاتم النبيين.

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।" (সূরা আহযাব)

নবী হিসেবে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, বিশেষতঃ তাকে خاتم النبيين উপাধিতে ভূষিত করার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে, তিনি নবীকুলের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তমজন।

خاتم শব্দে দু'প্রকারের কেরাত রয়েছে, ইমাম হাসান ও ইমাম আসেমের কেরাতে خاتم শব্দের ت এর ওপর যবর রয়েছে। অন্যান্য ইমামগণের কেরাত অনুযায়ী উক্ত ت এর যের বিশিষ্ট। কিন্তু উভয় কেরাতের সারমর্ম এক ও অভিন্ন অর্থাৎ, নবীগণের আবির্ভাব ধারার সমাপ্তি সাধনকারী। কেনোনা, خاتم শব্দের উভয় কেরাতের একই অর্থ– শেষ, আবার উভয় শব্দ মোহরের অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অর্থের বেলায়ও সারকথা শেষ অর্থ দাঁড়ায়। কেনোনা, কোনো বস্তু বন্ধ করে দেয়ার জন্য মোহর সর্বশেষেই ব্যবহার হয়ে থাকে। যের ও যবর বিশিষ্ট خاتم শব্দের উভয় অর্থই কামুস, সিহাহ, লিসানুল-আরব, তাজুল-উরুস প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় আরবী অভিধানসমূহে রয়েছে। ওপরযুক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা خاتم النبيين বলেছেন, خاتم الرسل না বলার কারণ হচ্ছে, রাসূল শব্দের চাইতে নবী শব্দের মর্মার্থে ব্যাপকতা অধিক। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, তিনি নবীকুলের আগমনের ধারা সমাপ্তকারী ও সর্বশেষ আগমনকারী। চাই তিনি সতন্ত্র শরিয়তের অধিকারী হউন কিংবা পূর্ববর্তী নবীর অনুসারী হউন। এর দ্বারা বোঝা গেলো, আল্লাহ তায়ালার কাছে যতো প্রকারের নবী হতে পারে– তাঁর (নবীজীর) মাধ্যমে এদের সবার পরিসমাপ্তি ঘটলো। তাঁর (মুহাম্মদ সা.) পরে অন্য কোনো নবী প্রেরিত হবেন না।

যাই হোক خاتم الانبياء এমন এক গুণ যা নবুওত ও রেসালতের পূর্ণতার ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোচ্চ স্থান ও মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে। কেনোনা, প্রত্যেক বস্তুই ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয় এবং সর্বোচ্চ শেখরে পৌছলে এর পরিপূর্ণতা

সাধিত হয়। আর সর্বশেষ পরিণতিই এর মোক্ষম উদ্দেশ্য। স্বয়ং কোরআনে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত-অনুদান পূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" পূর্ববর্তী নবী (আ.)গণের দীন নিজ নিজ যুগ অনুসারে পরিপূর্ণই ছিলো, কোনোটাই অসম্পূর্ণ ছিলো। কিন্তু সার্বিক পরিপূর্ণতার কথা সর্বোতভাবে নবীজীর দীনের প্রতিই প্রযোজ্য, যা পূর্ববর্তী সবারই জন্য দলীল স্বরূপ এবং সে দীন কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। এ কথা জেনে রাখা আবশ্যক, মানবতার সব ধরনের পরিপূর্ণতা নবুওতের মধ্যে নিহিত, আর নবুওতের সব ধরনের পরিপূর্ণতা খতমে নবুওতের মধ্যে রক্ষিত রয়েছে, সুতরাং যিনি খাতামুন নাবিয়্যিন বা শেষনবী হবেন, তিনিই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র পরিপূর্ণতার সংরক্ষণকারী হবেন। অতএব নবীজী খতমে নবুওত তথা জ্ঞান, আমল, চাল-চলন, চরিত্র, পদ, মর্যাদা এমনকি সমস্ত পরিপূর্ণতার শেষ সীমায় উপবিষ্ট ছিলেন।

যেমন হাদিস শরিফে নবীজীর জ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে :

اُوْتِيْتُ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ.

"আমাকে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সব ধরনের জ্ঞান দান করা হয়েছে।"

নবীজীর সর্বোত্তম চরিত্র সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"নিশ্চয় আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।"

শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সমস্ত নবী (আ.)গণের মর্যাদার উর্ধ্বে। তাই আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী সমস্ত নবী (আ.)গণের কাছ থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনা এবং তাঁর সহায়তা করার অঙ্গীকার দিয়েছেন।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ.

"আর যখন আল্লাহ তায়ালা নবী (আ.)গণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন, আমি তোমাদের যা কিছু কেতাব ও জ্ঞান দান করেছি। অতঃপর

তোমাদের কাছে এমন এক রাসূল আসবেন, যিনি তোমাদের কেতাবকে সত্যায়িত করবেন, তখন তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে।"

ওপরযুক্ত আয়াতের অঙ্গীকার সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত নবী (আ.)গণের কাছ থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তাঁরা স্বয়ং যদি তাঁর যুগ পান তবে যেনো তাঁর প্রতি ঈমান নিয়ে আসেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন এবং স্বীয় উম্মতকে যেনো এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান। (মাআরিফুল কোরআন)

নবীজীর খতমে নবুওত সম্পর্কে হাদিসের বর্ণনা তাওয়াতুরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং এটি দীনের স্তম্ভের পরিপূরক ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে একটি হাদিস নিম্নে পেশ করছি।

مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْاَ نْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرٍ اُحْسِنَ بُنْيَانُهٗ تُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ فَطَافَ بِهِ النَّظَّارُ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَا نِهٖ اِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ فَكُنْتَ اَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ خُتِمَ بِىَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِىَ الرُّسُلُ وَفِى رِوَايَةٍ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ (متفق عليه)

"আমি এবং (পূর্ববর্তী) নবী (আ.)গণের উপমা এমন একটি প্রাসাদের সঙ্গে, যার নির্মাণ কাজ খুবই সুন্দরভাবে করা হয়েছে, কিন্তু এতে একটি ইটের জায়গা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর দর্শকবৃন্দের পার্শ্বে ঘুরে ঘুরে প্রাসাদের নির্মাণ কাজের সৌন্দর্যতা দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন। কিন্তু এই ছেড়ে দেয়া ইটের জায়গার ওপর আক্ষেপ করছেন। অতএব আমিই ওই ইটের জায়গাটুকু বন্ধ করেছি। আমার মাধ্যমে এই প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, আমিই নবী (আ.)গণের (আগমন) সমাপ্তকারী। অর্থাৎ, আমিই শেষ নবী।" (বুখারী ও মুসলিম)

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোনো নবী-রাসূল আসবেন না। যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোনো ধরনের নবী-রাসূল আসার সম্ভাবনা থাকতো, তবে পবিত্র কোরআন-হাদিসে কোনো ইঙ্গিত থাকতো। অথচ কোরআন-হাদিসে এর কোনো ইশারা বা ইঙ্গিত নেই।

অতএব নবীজীর খতমে নবুওত অস্বীকারকারী এবং অন্য কোনো ধরনের নবীর আগমনে বিশ্বাসী কোরআন-সুন্নাহর আলোকে কাফির। যেমন বর্তমান যুগের কাদিয়ানী সম্প্রদায় নবীজীর খতমে নবুওতের অস্বীকারকারী এবং গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওতে বিশ্বাসী। তাই বিশ্ব মুসলিমের দৃষ্টিতে কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফির।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত্তাকিদের ইমাম

اِمَامُ الْاَتْقِيَاءِ

অনুবাদ : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু লোকদের ইমাম।

যেহেতু মেরাজ রজনীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবী (আ.)গণের ইমামতী করেছেন, আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত, যিনি নবী (আ.) গণের ইমাম হন, তিনি মুত্তাকীগণের ইমাম হওয়া অনিবার্য ও স্বাভাবিক। কারণ কোনো মুমিন নবী (আ.) গণের চেয়ে অধিক আল্লাহ ভীরু হতে পারে না। যেহেতু তাকওয়া বা আল্লাহভীতি নবুওতের প্রভাব, তাক্ওয়ার প্রভাব নবুওত নয়। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

وَاللّٰهِ اِنِّیْ اَخْشَاكُمْ وَاَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ

"আল্লাহর কসম, নিশ্চয় আমিই তোমাদের মধ্যে (সবচেয়ে) অধিক আল্লাহকে ভয় করি এবং তাঁর তাক্ওয়া ও ভীতি অন্তরে রাখি।"

যখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো, নবী (আ.)গণই সমস্ত মুমিনদের মধ্যে আল্লাহভীরু লোক ছিলেন। আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবী (আ.)গণের ইমাম, অতএব এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেলো, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত্তাকিদের ইমাম।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলদের সর্দার এবং আল্লাহর হাবীব

وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَحَبِيْبُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অনুবাদ : তিনিই সমস্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামগণের সায়্যিদ এবং রাব্বুল আ'লামীনের বন্ধু।

سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ : অর্থাৎ, শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবী-রাসূল (আ.)গণের সায়্যিদ ছিলেন। ইহকালে এবং পরকালেও তিনি এ মর্যাদায় উপবিষ্ট থাকবেন। যেমন হাদিস শরিফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِيْ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَامِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ اٰدَمُ فَمَنْ سَوَاهُ اِلَّا تَحْتَ لِوَائِيْ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ وَلَا فَخْرَ.

(رواه الترمذى)

"আমি কেয়ামতের দিন আদম সন্তানদের সায়্যিদ থাকব আর এতে কোনো গর্ব নয়, আমার হাতে হামদের পতাকা থাকবে আর এতে কোনো গর্ব নয়, আদম (আ.) থেকে নিয়ে সব নবীই এই দিন আমার পতাকার নিচে থাকবেন। আর সর্ব প্রথমে আমারই কবর খোড়া হবে, আর এতে কোনো গর্ব নয়।"

(তিরমিযী)

নবীজীর সায়্যিদ হওয়ার প্রভাব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব লোকের সামনে পরিপূর্ণভাবে কেয়ামতের দিনই প্রকাশ হবে, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাদিসে বিশেষভাবে এইদিনের কথা উল্লেখ করেছেন। নতুবা নবীজীর জন্মকাল থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালে তিনিই সায়্যিদ হিসেবে ছিলেন এবং থাকবেন, অন্য কেউ নয়। এমন হবে না, তিনি এক সময় বা একদিন সায়্যিদ থাকবেন আর অন্যসময় বা অন্যদিন সায়্যিদ থাকবেন না। বরং তিনি চিরকাল সায়্যিদ পদে উপবিষ্ট থাকবেন।

وَحَبِيْبُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : অর্থাৎ, নবীজী সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালকের হাবীব-বন্ধু, প্রিয়জন। যেমন হাদিস শরিফে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবি এসে আলাপ করছিলেন, এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ঘর থেকে বের হয়ে তাদের কাছে গিয়ে পৌছলেন। তখন তাদের পরস্পর আলোচনা করতে শোনলেন, কেউ বলছেন, আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম (আ.)কে খলিল বানিয়েছেন। কেউ বলছেন, আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.)-এর সঙ্গে পূর্ণভাবে সরাসরি কথা বলেছেন। কেউ বলছেন, ঈসা (আ.) আল্লাহর কালেমাহ এবং তাঁর রূহ। কেউ বলছেন, আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)কে সফী বানিয়েছেন। অতঃপর নবীজী তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন :

قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللهِ وَهُوَ كَذٰلِكَ وَمُوْسٰى نَجِيُّ اللهِ وَهُوَ كَذٰلِكَ وَعِيْسٰى رُوْحُهٗ وَكَلِمَتُهٗ وَهُوَ كَذٰلِكَ وَاٰدَمُ اِصْطَفَاهُ اللهُ وَهُوَ كَذٰلِكَ اَلَا وَاَنَا حَبِيْبُ اللهِ وَلَا فَخْرَ (رواه الترمذى)

"নিশ্চয় আমি তোমাদের কথা শোনেছি, নিশ্চয় ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর খলিল তিনি তেমনি ছিলেন। আর মূসা (আ.) নাজীয়ুল্লাহ তিনি তেমনি ছিলেন, আর ঈসা (আ.) রুহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ তিনি তেমনি ছিলেন, আর আদম (আ.) সফিয়ুল্লাহ তিনি তেমনিই ছিলেন। জেনে রেখো, আমি হাবিবুল্লাহ এতে আমার কোনো গর্ব নয়।" (তিরমিযী)

আর যেসব গুণাবলীর অধিকারীগণের জন্য আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মহব্বত ও ভালোবাসার কথা পবিত্র কোরআনে প্রকাশ করেছেন, সেসব গুণাবলী শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিলো। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন।

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ، اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহকারীদের, তওবাকারীদের এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।"

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।"

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ভরসাকরী ও ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।"

وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ، اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا.

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ধৈর্য্যধারণকারী এবং ওই সব লোকদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর সঙ্গে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করেন।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তায়ালার ভালোবাসার যেসব গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এসব গুণাবলী এবং এর মতো আরো অনেক গুণাবলীর সমাবেশ শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ঘটেছে এবং সংরক্ষিত ছিলো। অতএব শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠতরে বন্ধু ছিলেন।

শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সবধরনের নবুওতের দাবিদার ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট

وَكُلُّ دَعْوَةِ نُبُوَّةٍ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ فَغَيٌّ وَهَوًى

অনুবাদ : নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নবুওতের যেসব দাবি উত্থাপিত হয়সবই ভ্রান্ত, ভ্রষ্ট এবং প্রবৃত্তি প্রসূত।

كُلُّ دَعْوَةِ نُبُوَّةٍ الخ : অর্থাৎ, নবী মুহাম্মদ (সা.)কে নবী হিসেবে প্রেরণ করার পর, নবুওতের যে সব দাবি উত্থাপিত হয় এসবই ভ্রষ্টতা, ভ্রান্ত এবং প্রবৃত্তি পরায়ণতা। এর দাবিদার এবং এর অনুসারীরা পথভ্রষ্ট, নফ্‌ছ পূজারী কাফির। যেমন হাদিস শরিফে নবীজী বলেছেন :

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلٌ (متفق عليه)

"কেয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্ততঃ ত্রিশটির মতো এমন দাজ্জাল মিথ্যুক না আসবে, যারা প্রত্যেকে বলবে, সে (নবী) রাসূল।"

(বুখারী, মুসলিম)

অন্য হাদিসে আছে :

عَنْ ثَوْبَانَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلَاثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ.

"হযরত ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে থেকে ত্রিশটি মিথ্যাবাদী বের হবে, তাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে, সে নবী। অথচ আমিই শেষ; আমার পর আর কোনো নবী আসবেন না।" (মুসলিম)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ.

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে কারো পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।" আরো অসংখ্য আয়াতে কোরআনী ও আহাদিসে নববীতে নবীজীর খতমে নবুওতের ওপর সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে।

সুতরাং যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোনো ধরনের নবুওতের দাবি করবে, অথবা অন্য কোনো নবী আসার বিশ্বাসী হবে, সে যেনো নবীজীর খতমে নবুওত সম্পর্কীয় সমস্ত আয়াতে কোরআনী এবং আহাদিসে নববীকে অস্বীকার করলো। আর যে ব্যক্তি কোরআনের একটি আয়াত বা হাদিসে মুতাওয়াতিরকে অস্বীকার করবে সে ঈমান হারা হয়ে কাফির হয়ে যাবে।

অতএব বর্তমান যুগের গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওতে বিশ্বাসী লোকেরা কাফির। ইসলাম থেকে বহির্ভূত দল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুওতে বিশ্বাসী মুমিনদের জন্য কাদিয়ানীদের সঙ্গে কোনো ধরনের ধর্মীয় সম্পর্ক রাখা অবৈধ হারাম।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সমগ্র সৃষ্টির নবী ছিলেন?

وَهُوَ الْمَبْعُوْثُ اِلٰى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرٰى بِالْحَقِّ وَالْهُدٰى بِالنُّوْرِ وَالضِّيَاءِ.

অনুবাদ : তিনিই প্রেরিত হয়েছেন সমস্ত জিন এবং সমগ্র মাখলুকের প্রতি সত্য ও হেদায়াত এবং নূর ও জ্যোতি সহকারে।

وَهُوَ الْمَبْعُوْثُ اِلٰى عَامَّةِ الخ : অর্থাৎ, শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত জিন এবং মানবজাতি তথা সমগ্র বিশ্বের সকল সৃষ্টির প্রতি সত্য দীন ও হেদায়াত এবং নূর ও জ্যোতি– কোরআন দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পূর্বকার যুগের নবী-রাসূল (আ.)গণের কাউকে কোনো গোত্র বা সম্প্রদায়ের প্রতি, কাউকে কোনো এক দেশের প্রতি প্রেরণ করা হতো। আর শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। এটা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা

কোরআনে বলেছেন :

تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا.

"পরম করুণাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন।" যাতে তা বিশ্ব জগতের জন্যে সতর্ককারী হয়। ওপরযুক্ত আয়াতে للعلمين শব্দ থেকে বোঝা গেলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালত ও নবুওত সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্যে। পূর্ববর্তী নবী, রাসূল (আ.)গণ এরূপ ছিলেন না। তাঁদের নবুওত ও রেসালত বিশেষ দল ও বিশেষ স্থান বা দেশের জন্যে নির্দিষ্ট ছিলো। (মাআরিফুল কোরআন)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

(قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (الاعراف

"তুমি বলে দাও, হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

ইবনে কাছির মুছনাদে আহমদ গ্রন্থের বরাত দিয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদের সঙ্গে উদ্ধৃত করে বলেছেন, গযওয়ায়ে তাবুকের সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের ভয় হচ্ছিলো শত্রুরা এ অবস্থায় আক্রমণ করে বসে নাকি। তাই তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারদিকে সমবেত হয়ে গেলেন। হুজুর (সা.) নামাজ শেষে বলেছেন, আজকের রাতে আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে যা আমার আগে আর কোনো নবী-রাসূলকে দেয়া হয়নি। তার একটি হলো, আমার রেসালাত ও নবুওতকে সমগ্র দুনিয়ার সব জাতিসমূহের জন্যে ব্যাপক করা হয়েছে। আর আমার আগে যত নবী-রাসূলই এসেছিলেন, তাদের দাওয়াত ও আবির্ভাব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে-সম্পৃক্ত ছিলো।

নবীজীকে সম্বোধন করে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

(وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَاۤفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا (السبا

"আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَاِذْ صَرَفْنَاۤ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْۤا اَنْصِتُوْا

فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ قَالُوْا يٰقَوْمَنَاۤ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ

مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ يٰقَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.

"যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করে দিলাম, তারা কোরআন পাঠ শোনছিলো। তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হলো তখন তারা পরস্পর বললো, চুপ থাকো। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হলো তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারী রূপে ফিরে গেলো। তারা বললো, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কেতাব শোনেছি, যা মূসা (আ.)-এর পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কেতাব পূর্ববর্তী সব কেতাবের সত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পথ প্রদর্শন করে। হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য করো এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তোমাদের গুনাহ্ মার্জনা করবেন এবং তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি দেবেন।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত জিন ও মানবজাতি তথা সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টির প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ (منها) اِنِّىْ اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ.

"আমাকে ছয়টি বিষয়ে সমস্ত নবী (আ.)গণের ওপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে (তন্মধ্যে) আমাকে বিশ্ব জগতের সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমার মাধ্যমে নবুওত সমাপ্ত করা হয়েছে।" ওপরযুক্ত হাদিস এবং আরো অনেক হাদিসসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্যে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। অতএব কোরআন-সুন্নাহর আলোকে এ কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষনবী এবং সমগ্র বিশ্ব জগতের নবী, তাঁর পরে এ জগতে আর কেউ নবী হিসেবে আসবেন না। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা-বিশ্বাস।

কোরআন সম্পর্কে আকিদা : কোরআন আল্লাহর কালাম এবং তাঁর পক্ষ থেকে ওহি হিসেবে অবতীর্ণ

وَاَنَّ الْقُرْاٰنَ كَلَامُ اللهِ تَعَالٰى مِنْهُ بَدَاَ بِلَا كَيْفِيَةٍ قَوْلًا وَاَنْزَ لَهٗ عَلٰى نَبِيِّهٖ وَحْيًا وَصَدَّقَهُ الْمُؤْ مِنُوْنَ عَلٰى ذٰلِكَ حَقًّا وَاَيْقَنُوْا اَنَّهٗ كَلَامُ اللهِ تَعَالٰى بِالْحَقِيْقَةِ لَيْسَ بِمَخْلُوْقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ.

অনুবাদ : নিশ্চয়ই কোরআন আল্লাহর কালাম, এটা তাঁরই কাছে হতে (সাধারণ) কথাবার্তার পদ্ধতি ছাড়া (কথা হিসেবে) প্রকাশ হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা (কালাম) কোরআনকে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন এবং মুমিনগণ তাঁকে এ ব্যাপারে সত্য বলে বিশ্বাস (সত্যায়িত) করেছেন এবং তারা দৃঢ় বিশ্বাস করেছেন, তা বাস্তবিকই আল্লাহর কালাম, বিশ্ব লোকের কথার ন্যায় কোনো সৃষ্ট বস্তু নয়।

وَاَنَّ الْقُرْاٰنَ كَلَامُ اللهِ الخ : অর্থাৎ, মহাগ্রন্থ আল-কোরআন আল্লাহর কালাম, সাধারণ কথাবার্তার পদ্ধতি ছাড়াই তাঁর থেকে প্রকাশ হয়েছে।

কালাম! আল্লাহ তায়ালার ছিফাতসমূহের মধ্যে একটি ছিফাত। তিনি তাঁর এ ছিফাত অনুসারে স্বীয় শব্দাবলীর মাধ্যমে কথোপকথন করেন। কিন্তু তাঁর এ কালাম-কথোপকথনটি মানবজাতি তথা কোনো মাখলুকের কথাবার্তার পদ্ধতিতে নয়। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.)-এর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন করেছেন।

অন্য আয়াতে বলেছেন :

تِلْكَ اٰيَاتُ اللهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ.

"এগুলো আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ, একে আমি যথাযথভাবে পড়ে আপনাকে শোনাচ্ছি। আর নিশ্চয় আপনি রাসূল (আ.)গণের অন্তর্ভুক্ত।"

তেলাওয়াত করাটাও এক প্রকার কথা বলা। প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কথা বলা সবই সমান। অতএব প্রমাণিত হয়ে গেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে কথোপকথন করেন এবং গোপনীয়ভাবে কথা বলেন অর্থাৎ,

মাখলুকের অন্তরে কোনো কথা ঢেলে দেন। মোটকথা, আল্লাহ্ তায়ালা কথা বলেন, কিন্তু আমাদের কথার মতো নয়। তিনি শোনেন কিন্তু আমাদের শোনার মতো নয়। কারণ মানুষের কথা বলার কাইফিয়াত ও কাম্মিয়াত তথা পদ্ধতি ও পরিমাণ নেই। কারণ পদ্ধতি ও পরিমাণ হওয়া দেহের বৈশিষ্ট্য আর আল্লাহর সত্তা দেহ এবং দেহের বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে মুক্ত ও পবিত্র। যেমন আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন, তাঁর সাদৃশ্য (মতো) কোনো কিছু নেই, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

অতএব প্রমাণিত হয়ে গেলো, কোরআন আল্লাহর কালাম। তাঁর থেকেই প্রকাশ হয়েছে। তাই লেখক লেখেছেন :

مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَةٍ قَوْلًا

"এ কোরআন আল্লাহর সত্তা থেকেই প্রকাশ হয়েছে কথাবার্তার পদ্ধতি ছাড়া।" কেনোনা, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনকে স্বীয় সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন এবং তাঁর থেকে এর প্রকাশ বা অবতীর্ণ হওয়ার কথা স্বয়ং কোরআনে ঘোষণা করেছেন।

تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ.

"পরম ক্ষমতাশীল প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কেতাব অবতীর্ণ।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :

تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"এ কেতাব (আল-কোরআন) অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্ব পালনকর্তার কাছে থেকে এতে কোনো সন্দেহ নেই।" •

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, কোরআন আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে, অন্য কোথা থেকে নয়।

অন্য আয়াতে বলেছেন :

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا.

"এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত, আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছি।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ পরিষ্কার প্রমাণ দিচ্ছে, কোরআন আল্লাহর কালাম, তাঁর কাছে থেকেই কোরআন হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু মুতাজিলা সম্প্রদায় বলে, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে (কালাম) কোরআনকে এক স্থানে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এই কালাম কোরআনকে এই স্থান থেকে অবতীর্ণ করেছেন। তাদের এ

কথাটির বিভ্রান্তি ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ এবং আরো অনেক আয়াতে কোরআনী ও আহাদিসে নববি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে।

وَاَنْزَ لَهٗ عَلٰى نَبِيِّهٖ وَحْيًا الخ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনকে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ (سورة انعام)

"আর আমার প্রতি এ কোরআন ওহি-প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, যাতে আমি তোমাদের এবং যাদের কাছে এ কোরআন পৌঁছবে সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি।" (সূরা আনআম)

অন্য আয়াতে বলেছেন :

بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَ الْقُرْاٰنَ

"সে মতে, আমি এ কোরআন তোমার কাছে ওহী (অবতীর্ণ) করেছি।" (সূরা ইউসুফ)

অন্য আয়াতে বলেছেন :

اُتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

"তুমি পাঠ কর তোমার প্রতি ওহীকৃত (প্রত্যাদিষ্ট) কেতাব।" (সূরা আনকাবুত)

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। এটি শুধু কোরআন অথবা নবীজীর দাবি নয়; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়ায়ে নবুওতের প্রথম দিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সব যুগের এক আল্লাহ বিশ্বাসী এবং নবী বিশ্বাসী লোকদের এই বিশ্বাস, আল-কোরআন স্বীয় শব্দাবলী ও (মায়ানী) অর্থসমূহসহ আল্লাহর কালাম, আল্লাহর বাণী। শব্দাবলী ও অর্থসহ আল্লাহ তায়ালা কালাম (কথোপকথন) করেছেন। এতে কোনো মুমিনের দ্বিমত নেই।

কিন্তু মু'তাযেলি সম্প্রদায় বলে, কোরআন ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে জিব্রাঈলের অন্তরে অবতরণ করেছে, অতঃপর জিব্রাঈল (আ.) একে তাঁর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এবং প্রত্যেক যুগের নাস্তিক, মুরতাদরা বলে থাকে, কোরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীয় চিন্তা, গবেষণা, বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা বানিয়েছেন।

ওপরোল্লিখিত আয়াত এবং আরো অনেক আয়াতে কোরআনী ও আহাদিসে নববি এসব বাতিল পথভ্রষ্ট কাফির সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তিকর উক্তির ভ্রান্তি প্রমাণ করেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত একে প্রত্যাখ্যান করতেই থাকবে।

وَاَيْقَنُوْا اَنَّهٗ كَلَامُ اللهِ تَعَالٰى الخ

অর্থাৎ, সর্বযুগের সত্যিকারের মুমিনগণ এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, কোরআন বাস্তবিকই আল্লাহর কালাম, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই এবং এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন, মাখলুকের সৃষ্ট কালামের মতো কোরআন সৃষ্ট বস্তু নয়। যেহেতু পবিত্র কোরআন ও হাদিসের কোথাও কোরআনকে মাখলুক বলা হয়নি। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا.

"আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.)-এর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন করেছেন।"

অত্র আয়াতে এ কথা বলা হয়নি, اِنَّ اللهَ خَلَقَ كَلَامَهٗ لِمُوْسٰى অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা মূসা (আ.)-এর জন্য স্বীয় কালাম সৃষ্টি করেছেন।

অন্য আয়াতে বলেছেন :

وَلَمَّا جَاءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ.

"যখন মূসা (আ.) আমার প্রতিশ্রুতির সময় অনুযায়ী এসে হাযির হলেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রতিপালক কথা বললেন।" অত্র আয়াতে এ কথা বলেন নি, خَلَقَ كَلَامَهٗ رَبُّهٗ তাঁর প্রতিপালক তাঁর সঙ্গে স্বীয় কালাম সৃষ্টি করলেন।

সেহেতু সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা বিশ্বের খাঁটি মুসলমানগণের মধ্যে কেউ কোরআনকে মাখলুক বলেননি।

কিন্তু মুতাযেলী সম্প্রদায় কোরআনকে মাখলুক বলে।

ওপরোল্লিখিত প্রমাণাদিতে মু'তাযেলিদের এ বিভ্রান্তিকর উক্তির ভ্রান্তি প্রমাণিত হলো।

যারা পবিত্র কোরআনকে আল্লাহর কালাম মানে না তারা কাফির

فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ اَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ.

অনুবাদ : অতএব যে ব্যক্তি কোরআন শোনে এই ধারণা পোষণ করে, এটি মানুষের কালাম, তাহলে নিশ্চয় সে কাফির হয়ে যাবে।

فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ اَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ.

"যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআন শোনে একে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করার পরিবর্তে মানুষের কালাম বলে বিশ্বাস বা ধারণা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে।" যেহেতু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনকে কালামুল্লাহ বলেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ (سورة توبة)

"আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দাও, যে পর্যন্ত সে আল্লাহর কালাম শোনতে পারে। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দাও। কারণ তারা অজ্ঞ সম্প্রদায়।" (সূরা তওবা)

ওপরযুক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে কালামুল্লাহ বা আল্লাহর কালাম বলেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোরআনকে মানুষের কালাম বলবে, সে উক্ত আয়াতকে অস্বীকার করলো এবং এর বিরোধী বা প্রতিবাদী ও বিবাদী প্রমাণিত হলো, আর যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের কোনো একটি আয়াত অস্বীকার করবে অথবা এর বিরোধী বা প্রতিবাদী ও বিবাদী প্রমাণিত হবে নিঃসন্দেহে সে কাফির।

وَقَدْ ذَمَّهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعَابَهُ وَاَوْعَدَهُ عَذَابَهُ حَيْثُ قَالَ سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ فَلَمَّا اَوْعَدَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ عَلِمْنَا اَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ وَلَا يُشْبِهُهُ قَوْلُ الْبَشَرِ.

অনুবাদ : আর আল্লাহ তায়ালা এরূপ ধারণা পোষণকারীর প্রতি নিন্দাবাদ ও দোষারোপ করেছেন এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি প্রদানের ধমক দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, অতিসত্বর আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যখন ওই ব্যক্তিকে (ছকর নামী) জাহান্নামের ধমক দিলেন যে বলে, إِنْ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ এটা তো মানুষের কথা বৈ কিছু নয়; তখন আমরা জানতে পারলাম, নিঃসন্দেহে কোরআন মানুষের সৃষ্টিকর্তার কালাম। সুতরাং মানুষের কালামের সঙ্গে এর কোনো সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য রাখেনি এবং কোনো সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য নেই।

وَقَدْ ذَمَّهُ الخ : অর্থাৎ, কোরআন শরিফ আল্লাহর কালাম, কোনো মানুষ তথা কোনো মাখলুকের কালাম নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা এসব লোকদের নিন্দা ও ঘৃণা এবং তিরষ্কার করেছেন এবং তাদের জাহান্নামের ধমক দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যারা পবিত্র কোরআনকে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করে না; বরং একে মানুষের কালাম মনে করে বেড়ায়। কোরআন যদি আল্লাহর কালাম না হতো তাহলে আল্লাহ তায়ালা এর অস্বীকারকারীকে নিন্দা ও জাহান্নামের ধমক দিতেন না। সুতরাং কোরআন আল্লাহর কালাম অমান্যকারীকে জাহান্নামের ধমক বা ভীতি প্রদর্শন করাটাই কোরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

وَلَا يُشْبِهُهُ قَوْلُ الْبَشَرِ : অর্থাৎ, আল্লাহর কালাম (কোরআন) মানুষের কথার সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য রাখে না। কারণ আল্লাহর সত্তা এবং তাঁর অন্যান্য ছিফাত যেমন অনাদি, তেমন তাঁর কালাম গুণটিও অনাদি। আর মানুষ এবং তার সমস্ত ছিফাত যেমন নতুন সৃষ্ট। মানুষের কালামও নবসৃষ্ট। আর হাদেস-নবসৃষ্ট বস্তু, কাদীম-অনাদি বস্তুর সঙ্গে সামাঞ্জস্য রাখে না। সুতরাং আল্লাহর কালাম মানুষের কালামের সঙ্গে কোনো ধরনের সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য রাখতে পারে না।

অতএব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, যেমন আল্লাহ তায়ালা জানেন, কিন্তু আমাদের জানার মতো নয়। তিনি ক্ষমতা ও শক্তি রাখেন, কিন্তু আমাদের ক্ষমতা ও শক্তির মতো নয়। তিনি দেখেন ও শোনেন, কিন্তু আমাদের দেখা ও শোনার মতো নয়। তেমন আল্লাহ তায়ালা কালাম করেন, কিন্তু আমাদের কালামের মতো নয়।

আল্লাহকে যে কোনো ব্যাপারে মানুষের গুণের সঙ্গে তুলনা দেয়া বৈধ নয়

وَمَنْ وَصَفَ اللهَ تَعَالَىٰ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَهُ فَمَنْ اَبْصَرَ هٰذَا فَقَدِ اعْتَبَرَ وَعَنْ مِثْلَ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ وَعَلِمَ اَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে মানবীয় গুণসমূহের মধ্যে থেকে যে কোনো গুণ দ্বারা বিশেষিত করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। অতএব যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে জ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টিতে দেখবে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে। আর সে (আল্লাহ সম্পর্কে) কাফিরদের ন্যায় (অবাস্তব) কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। আর সঠিকভাবে জানতে পারবে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় গুণাবলীতে মানুষের মতো নন।

وَمَنْ وَصَفَ اللهَ الخ : অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানবীয় গুণাবলীর মধ্য থেকে কোনো একটি গুণ আল্লাহর সত্তার জন্য সাব্যস্ত করবে অথবা আল্লাহর সত্তাকে মানবিক কোনো গুণে গুণী বলে বিশ্বাস করবে সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা মানবীয় গুণাবলীর ঊর্ধ্বে। তাই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

"কোনো কিছুই আল্লাহর অনুরূপ (মতো) নয়। তিনিই সব শোনেন দেখেন।"

ওপরযুক্ত আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহর জাত বা ছিফাতসমূহের সঙ্গে মানুষ কোনো মাখলুকের জাত বা গুণাবলীর কোনো ধরনের তুলনা নেই ও হতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর জাত বা ছিফাতকে মানুষ তথা কোনো মাখলুকের গুণাবলীর সঙ্গে তুলনা দিলো, সে ওপরযুক্ত আয়াতে কোরআনীকে যেনো অস্বীকার করলো। আর যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের কোনো একটি আয়াত অস্বীকার করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। অতএব আল্লাহর জাত বা ছিফাতকে মাখলুকের সঙ্গে তুলনা দাতা এবং আল্লাহর জন্য মাখলুকের কোনো গুণ সাব্যস্তকারী কাফির।

এভাবে আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করা কুফরী। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় সত্তার সঙ্গে বিভিন্ন গুণাবলী সংযুক্ত করে পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াত

অবতীর্ণ করেছেন। যেমন এক আয়াতে বলেছেন, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদর্শী- وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

অন্য আয়াতে বলেছেন, তিনিই প্রজ্ঞাবান সূক্ষ্ম জ্ঞানী- وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

অন্য আয়াতে বলেছেন, তিনি সর্বোচ্চ, মহান শ্রেষ্ঠ- وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

অন্য আয়াতে বলেছেন, তিনিই সূক্ষ্ম জ্ঞানী সম্যক জ্ঞাত- وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

অন্য আয়াতে বলেছেন, তিনিই সর্বজ্ঞানী, পরমশক্তিশালী- وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ

অন্য আয়াতে বলেছেন, তিনিই পরম ক্ষমতাবান, ক্ষমাশীল- وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ

আল্লাহর আরো অনেক আছমায়ে হুছনা বা গুণবাচক সুন্দর নাম রয়েছে। যা পবিত্র কোরআন হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ছিফাত অস্বীকার করবে, সে যেনো আল্লাহর ছিফাত সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদিসসমূহ অস্বীকার করলো। আর যে ব্যক্তি কোরআনের কোনো আয়াত অস্বীকার করবে, সে কাফিরা হয়ে যাবে।

অতএব আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকারকারী কাফির, ফালাসফী এবং মুতাযিলীরা আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করে। আর কাররামীয়ারা আল্লাহর ছিফাতসমূহকে হাদেস-নবাগত, ক্ষণস্থায়ী মানেন এবং চিরস্থায়ী হওয়াকে অস্বীকার করেন।

মোটকথা, আল্লাহর-ছিফাত গুণাবলী অস্বীকারকারীদের অনেক দল রয়েছে। তাদের সব দলই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ, আর এদের কোনো কোনো দল কাফির হয়ে যাবে।

فَمَنْ اَبْصَرَ هٰذَا لَقَدْ اِعْتَبَرَ

অর্থাৎ, আল্লাহর ছিফাত অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে সতর্কবাণী শোনে উপদেশ গ্রহণকারীগণ, কাফিরদের মতো কথা বলা থেকে বিরত থাকবেন। যেমন ইহুদীরা মূসা (আ.)কে বলেছিলো :

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً.

"আমরা কখনো ঈমান আনবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহকে সম্মুখে দেখবো না।"

তাদের এই বিভ্রান্তিকর কথার কারণ ছিলো, আল্লাহর সত্তা এবং তাঁর গুণাবলীকে মাখলুকের সত্তার সাদৃশ্য এবং গুণাবলীর মতো মনে করা। যেমন মানুষ একে অন্যের সঙ্গে আলাপ করার বেলায় একে অন্যকে সামনা সামনি স্বচক্ষে দেখতে পায়, তেমন আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার দাবি বা শর্ত তারা লাগল, তাদের ধারণা আল্লাহর সত্তা ও মানুষের মতো আকার-আকৃতি সম্পন্ন, আর যেমন মানুষের মুখের কথা আমাদের কানে শোনতে পারি, তেমন আল্লাহর কথাও আমাদের কানে শোনতে পারবো। তাই তারা ওপরোল্লিখিত দাবি বা শর্ত পেশ করেছিলো। অথচ তাদের এই ধারণা ও দাবি একেবারে ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তি কর। কারণ, আল্লাহর জাত ও ছিফাতের সঙ্গে মাখলুকের জাত ও ছিফাত-গুণাবলীর কোনো তুলনা হতে পারে না। তাই লেখক মাখলুক এবং তার গুণাবলীকে আল্লাহর জাত এবং তাঁর গুণাবলীর সঙ্গে তুলনা দেয়াকে কুফরী বলে আখ্যা দিয়েছেন।

কেনোনা, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ : অর্থাৎ, আল্লাহর জাত ও ছিফাতের মতো কোনো কিছু নেই। সুতরাং আল্লাহর জাত ও ছিফাতের সঙ্গে কোনো কিছুকে তুলনা দেয়া থেকে বিরত থাকা সত্যিকারের মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহর দর্শন সম্পর্কে আকিদা

وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ اِحَاطَةٍ وَلَاكَيْفِيَةٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

অনুবাদ : জান্নাত বাসীদের জন্য আল্লাহর তায়ালার দর্শন লাভ সত্য। তা হবে বিনা পরিবেষ্টনে এবং (আমাদের বোধগম্য) কোনো ধরণ বা প্রকৃতি ব্যতিরেকে। যেমন আমাদের প্রতিপালকের কেতাবে এই সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে : সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল সজীব হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টিমান থাকবে। (সূরা কিয়ামাহ)

ওপরযুক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, পরকালে জান্নাতিগণ চর্মচক্ষে আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন। সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এ মতো পোষণ করেন, এতে কারো দ্বিমত নেই।

আল্লাহর দর্শন সম্পর্কে আলোচনার কয়েক পর্যায় রয়েছে।

প্রথমতঃ দুনিয়াতে দৃষ্টিশক্তি বা চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখা কি সম্ভব?

উত্তর : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতামত হলো, দুনিয়াতে দৃষ্টিশক্তি বা চক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখা সম্ভব। এ কথাটি যুক্তি এবং শরিয়ত দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে মু'তাজিলা, খাওয়ারিজ, ইমামিয়া জাহমিয়া সাধারণভাবে অর্থাৎ, ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য আল্লাহর দর্শন অস্বীকার করে এবং অসম্ভব বলে। কিন্তু তারা তাদের এই ভ্রান্ত মতামতের পক্ষে একটি যুক্তি পেশ করেন, কোনো জিনিসের দর্শন লাভের জন্যে কয়েকটি শর্ত রয়েছে। (১) দর্শকের মধ্যে বস্তু দর্শন করার শক্তি থাকা। (২) দর্শনের বস্তুটি আলোর মধ্যে থাকা। (৩) এই বস্তুটি দর্শকের সামনের দিকে থাকা। (৪) এই বস্তুটি অত্যধিক দূরে এবং অত্যধিক কাছে না হওয়া; বরং দেখার উপযুক্ত স্থানে হওয়া। কারণ অত্যধিক দূরের কারণে দেখা অসম্ভব হয় এবং অত্যধিক কাছে হলেও দেখা অসম্ভব হয়। অতএব দেখার উপযোগী স্থানে বস্তুটি থাকতে হবে। কিন্তু আল্লাহর সত্তা স্থান, কাল ও দিক থেকে মুক্ত ও পবিত্র। সুতরাং আল্লাহর সত্তার মধ্যে দর্শনের শর্তসমূহ পাওয়া অসম্ভব। অতএব আল্লাহর দর্শন অসম্ভব। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন স্বীয় দর্শনের কথা বলেছেন এবং তাঁর সত্যবাদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন, তখন এ দর্শনের বিপক্ষে কোনো ধরনের প্রশ্ন বা যুক্তি উত্থাপন করা মুমিনের জন্য ঠিক হবে না। কারণ মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাগুলো নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা এবং নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া এবং কাইফিয়াত– পদ্ধতি তালাশ না করা; বরং এ সবের ইল্ম আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করা।

বিরোধীদের প্রমাণ খণ্ডনে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, যেসব কারণে আল্লাহর দর্শন অসম্ভব মনে করা হয়, এসব কারণ বা বস্তুকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর শক্তি দ্বারা সম্ভব করে বান্দার জন্য তাঁর দিদার সহজ করে দিতে পারেন। যেহেতু তিনি সর্বক্ষমতার অধিকারী। যেমন আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামনে ও পেছনে উভয়দিক দিয়ে দেখার ক্ষমতা দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআনে আছে, আল্লাহর নবী মূসা (আ.) আল্লাহর কাছে আবদার করেছেন : رَبِّ اَرِنِیْۤ اَنْظُرْ اِلَیْكَ

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখবো তোমার দিকে তাকাবো।"

যদি দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব হতো, তবে মূসা (আ.) আল্লাহর কাছে তাঁর দর্শনের আবদার করতেন না। সুতরাং ইহা সম্ভব। তাইতো তিনি আল্লাহর দর্শনের আবদার করেছিলেন। নতুবা এ কথা বলতে হবে, মূসা (আ.) জানেন না, আল্লাহর জাত সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা করাটা কোনোক্রমেই বৈধ হবে না। কারণ মূসা (আ.)-এর এ আবদার করাটা ঠিক ছিলো তাই আল্লাহ তায়ালা প্রতি উত্তরে বলেছিলেন :

لَنْ تَرَانِىْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرَانِىْ

"তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবে না, তবে পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি সে স্বীয় স্থানে অটল থাকে, তবে শ্রীঘ্রই আমাকে দেখতে পাবে।

ওপরযুক্ত আয়াত মূসা (আ.)-এর জন্য আল্লাহর দর্শন লাভ হওয়াকে পাহাড় স্বীয় স্থানে অটল থাকার ওপর স্থগিত রাখা হয়েছে। যেহেতু পাহাড় স্বীয় স্থানে স্থীর বা অটল থাকা সম্ভব। সেহেতু দুনিয়াতেই আল্লাহর দর্শন লাভ সম্ভব। যদিও মানসিক দুর্বলতার কারণে মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর দর্শন লাভ করতে পারছে না।

পরকালে আল্লাহর দিদার লাভ হবে

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, মুমিনগণ পরকালে আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

"ওইদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল সজীব হবে, স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাকাতে থাকবে।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (رواه وسلم)

"নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে শীঘ্রই এভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা চৌদ্দই রাত্রের চাঁদ দেখতে পাও।" (মুসলিম)

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মুসলিমগণ পরকালে স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখতে পাবেন এবং তাঁর দর্শন লাভে ধন্য হবেন।

কিন্তু মু'তাযেলা, খাওয়ারিজ, ইমামিয়া, জাহমিয়া পরকালে মুমিনগণের জন্যে আল্লাহর দর্শন লাভ করাকে অস্বীকার করবে।

তাদের এই মতামতটি পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। তাই তাদের এহেন মতামত গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহর দর্শন সম্পর্কে ঈমান সঠিক রাখতে হলে কি করা কর্তব্য?

وَتَفْسِيْرُهُ عَلٰى مَا اَرَادَ اللهُ تَعَالٰى وَعَلِمَهُ وَكُلُّ مَاجَاءَ فِيْ ذٰلِكَ مِنَ الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَعْنَاهُ عَلٰى مَا اَرَادَ وَلَانَدْخُلُ فِيْ ذٰلِكَ مُتَأَوِّلِيْنَ بِاٰرَائِنَا وَلَا مُتَوَهِّمِيْنَ بِاَهْوَائِنَا فَاِنَّهُ مَاسَلِمَ فِيْ دِيْنِهٖ اِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَلِرَسُوْلِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ اِلٰى عَالِمِهٖ.

অনুবাদ : ওপুরোল্লিখিত আয়াতের তাফসির আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা এবং জ্ঞান অনুসারে (বা প্রদত্ত শিক্ষার ভিত্তিতে) হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব সহীহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তা এভাবেই গ্রহণ করতে হবে, যেভাবে তিনি বলেছেন এবং এর দ্বারা তিনি যে অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন তা স্বীকার করে নিতে হবে। এতে আমরা নিজেদের মতামত অনুসারে অপব্যাখ্যা বা অসঙ্গত ব্যাখ্যা দ্বারা বা নিজেদের প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোনো অর্থে সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করবো না। কারণ দীনের ব্যাপারে কেবল সেই ব্যক্তিই ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে নিরাপদ থাকতে পারে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সমর্পণ করে এবং যেসব বিষয় তার কাছে সংশয়যুক্ত হয়, এর সঠিক জ্ঞান আলিমদের ওপর ছেড়ে দেয়।

وَتَفْسِيْرُهُ عَلٰى مَا اَرَادَ الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা হকপন্থী লোকেরা নিজের ইচ্ছা ও কামনা অনুযায়ী কোরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা বা অসঙ্গত ব্যাখ্যা করে দীনী ব্যাপারে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করেন না বরং সব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য করেন। আর যেসব বিষয়ে তাদের সঠিক কোনো জানা থাকে না, তখন তারা সে বিষয়টিকে আলিমগণের কাছে ন্যস্ত করেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

"যদি তোমরা না জান, তবে আলিমগণকে জিজ্ঞাসা করো।" ওপরযুক্ত আয়াতের ওপর আমল করার নীতি সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগ থেকে নিয়ে সর্ব যুগের হকপন্থী লোকগণ থেকে এ যুগের হকপন্থীদের কাছে চলে আসছে। এর মাধ্যমে দীনের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘনকারীদের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা এবং বাতিল পন্থীদের কথা চুরি করা, আর জাহেলদের অপব্যাখ্যা করা থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে।

وَلَا يَثْبُتُ قَدَمُ الْاِسْلَامِ اِلَّا عَلٰى ظَهْرِ التَّسْلِيْمِ وَالْاِ سْتِسْلَامِ فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَاحَجَرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيْمِ فَهْمُهُ حَجَبَهُ مُرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيْدِ وَصَا فِى الْمَعْرِفَةِ وَصَحِيْحِ الْاِيْمَانِ فَيَتَذَ بْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ وَالتَّصْدِيْقِ وَالتَّكْذِيْبِ وَالْاِقْرَارِ وَالْاِنْكَارِ مُوَ سْوِسًا تَائِهًا شَاكًّا زَائِغًا لَا مُؤْ مِنًا مُصَدِّ قًا وَلَا جَاحِدًا مُكَذِّبًا●

অনুবাদ : পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া কারো ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হবে, যার জ্ঞান তার থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে এবং আত্মসমর্পণের মাধ্যম যার বোধশক্তি সন্তুষ্ট হয় না, তার এ উদ্দেশ্যে খালিছ-নির্ভেজাল তাওহিদ, নিষ্কলুষ ও পরিচ্ছন্ন মা'রিফাত-জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ ঈমান থেকে তাকে দূরে রাখবে। অতঃপর সে কুফরি ও ঈমান, সমর্থন ও অস্বীকৃতি এবং গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের মাঝামাঝি প্রবঞ্চক, দিশেহারা ও সংশ্রয়ী হয়ে দু'টানায় দোদুল্যমান থেকে যায়। সে না হয় পূর্ণ সমর্থক মু'মিন এবং না হয় দৃঢ় অবিশ্বাসী মিথ্যাশ্রয়ী।

وَلَايَثْبُتُ قَدَمُ الْاِ سْلَامِ الخ : অর্থাৎ, ইসলামের ওপর অটল বা প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য কোরআন-হাদিসের সামনে আত্মসমর্পণ করা অত্যাবশ্যকীয়। অর্থাৎ, কোরআন-হাদিস দ্বারা যে কথা বা বিষয় সাব্যস্থ বা প্রমাণিত হয়েছে, তা বিনা আপত্তিতে মেনে নেয়া। আর নিজ ইচ্ছা ও কামনা অনুসারে কোনো রায় বা মুক্তি দ্বারা এর বিরোধিতা না করা। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম ইবনে শিহাব জুহরী (রহ.) থেকে নকল করেছেন, আল্লাহর কাজ হলো রাসূল প্রেরণ করা, আর রাসূল (সা.)-এর কাজ হলো আল্লাহর আহকাম বান্দার কাছে পৌঁছানো, আর আমাদের (বান্দার) কাজ হলো একে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া।

فَيَتَذَ بْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ الخ : অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোরআন-হাদিস বাদ দিয়ে নিজ রুচি মতে দীনের অপব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন মতবাদ ও মতামতের অনুসরণ করবে, সে দিশাহারা, হতবুদ্ধি এবং পথভ্রষ্ট হয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের ঘূর্ণিফাঁদে পড়ে যাবে। আর এ সব লোক যারা কোরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থেকে বিমুখ হয়ে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তথ্যাদি এবং ইলমে কালামের বিভিন্ন অনুসন্ধানাদির অনুসারী হয়ে, তাদের এমন অবস্থা হবে, কুমন্ত্রণা এবং কুধারণাসমূহ তাকে প্রতারিত করবে এবং তাকে এমন স্তরে নিয়ে দাঁড় করাবে, তাকে প্রকৃত মুমিন বলা যাবে না এবং প্রকৃত কাফিরও বলা যাবে না। যেমন আজকের কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবি আতেল রয়েছে, যাদের মুসলমানও বলা যায় না এবং কাফিরও বলা যায় না।

وَلَا يَصِحُّ الْإِيْمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ (اَيِ الْجَنَّةِ) لِمَنِ اعْتَبَرَ مِنْهُمْ بِوَهْمٍ اَوْتَأَوَّلَهَا بِفَهْمٍ (مِنْ رَأْيِهِ) اِذْكَانَ تَأْوِيْلُ الرُّؤْيَةِ وَتَأْوِيْلُ كُلِّ مَعْنًى يُضَافُ اِلَى الرُّبُوْبِيَّةِ فَلَا يَصِحُّ الْاِيْمَانُ بِالرُّؤْيَةِ اِلَّابِتَرْكِ التَّأْوِيْلِ وَلُزُوْمِ التَّسْلِيْمِ وَعَلَيْهِ دِيْنُ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ.

অনুবাদ : জান্নাতবাসীদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ সম্পর্কে এমন লোকের ঈমান বিশুদ্ধ হবে না, যে এটাকে তাদের পক্ষে বিশেষ কল্পনার বিষয় মনে করবে বা স্বীয় জ্ঞানানুসারে এর অপব্যাখ্যা করবে। কেনোনা আল্লাহর দর্শন সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ের মনগড়া তাৎপর্য ও অপব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। সুতরাং অপব্যাখ্যা ছেড়ে দিয়ে এর থেকে বিরত হয়ে অবিকৃতভাবে তা গ্রহণ করলেই ঈমান বিশুদ্ধ হবে। আর এর ওপরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের দীন-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

وَلَايَصِحُّ الْاِيْمَانُ بِالرُّؤْيَةِ الخ : অর্থাৎ, জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহর দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা দিয়ে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না। এতে ঈমান ঠিক থাকবে না। বরং আল্লাহর দর্শন এবং তাঁর রবুবিয়্যাত সম্পর্কিত বিষয়ের কোনো ব্যাখ্যা না করে এগুলোকে যথাযথভাবে আনুগত্যের সঙ্গে মেনে নিলেই ঈমান ঠিক থাকবে। কেনোনা, আল্লাহর গুণাবলী মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। আর মুতাশাবিহাতের হাকিকত আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে : وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ

ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) ওপরযুক্ত ইবারত দ্বারা মুতাযেলাদের কথা খণ্ডন করেছেন, যারা আল্লাহ তায়ালার দর্শনকে অস্বীকার করে এবং এ সব লোকের কথা খণ্ডন করেছেন, যারা আল্লাহ তায়ালাকে মাখলুক এবং মাখলুকের গুণাবলীর সঙ্গে তুলনা দিয়ে বিভিন্ন অপব্যখ্যা ও যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহর দর্শনকে অস্বীকার করে।

আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে আকিদা

وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْىَ وَالتَّشْبِيْهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْـــزِيْهَ فَاِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوْفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ- مَنْعُوْتٌ بِنُعُوْتِ الْفَرْدَانِيَّةِ لَيْسَ بِمَعْنَاهُ اَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ.

অনুবাদ : আর যে ব্যক্তি (আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে) অস্বীকৃতি ও সাদৃশ্যপনা হতে আত্মরক্ষা না করবে, অবশ্যই তার পদস্খলন ঘটবে এবং সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতায় বিশ্বাস স্থাপনে ব্যর্থ হবে। কেনোনা, আমাদের মহামহিম প্রভু একক গুণাবলীর দ্বারা বিশেষিত এবং অনন্য বিশেষণে বিভূষিত। ভূমণ্ডলের কেউ তাঁর গুণে গুণান্বিত নয়।

وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْىَ وَالتَّشْبِيْهَ الخ : অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর দর্শন, ছিফাত অস্বীকার করা থেকে এবং আল্লাহকে মাখলুকের সঙ্গে তুলনা দেয়া থেকে বাঁচতে পারলো না, সে সত্যের পথ থেকে সরে গেলো এবং সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতায় বিশ্বাসী হতে ব্যর্থ হয়ে গেলো। কেনোনা, আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার করা অথবা তাঁকে মাখলুকের সঙ্গে তুলনা দেয়া উভয়টি এমন একটি রোগ, যা গাইব-অনুপস্থিত বস্তুকে উপস্থিত বস্তুর ওপর অনুমান করার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। অথচ গাইবকে হাযির এর ওপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কারণ, এতে সীমালঙ্ঘন (অতিরঞ্জিত) করে, আল্লাহকে মাখলুকের সঙ্গে তুলনা দিয়েছে যেমন 'মুশাব্বিহীরা'। আবার কেউ আল্লাহর ছিফাত অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে নিজ রুচিসম্মত অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লাহকে 'মুয়াত্তাল' একেবারে অকেজো বানিয়েছে। যেমন 'মুয়াত্তিলারা'। তাই বলা হয় اَلْمُعَطِّلُ يَعْبُدُ عَدَمًا

মুয়াত্তিলারা আল্লাহর ছিফাতসমূহ অস্বীকার করে অস্তিত্বহীনের এবাদত করে।

মুশাব্বিহীরা আল্লাহকে মাখলুকের সঙ্গে তুলনা দিয়ে মুতী, প্রতিমা وَالْمُشَبِّهُ ও দেবতার এবাদত করে। আর এক আল্লাহর বিশ্বাসীগণ وَالْمُوَحِّدُ يَعْبُدُ صَنَمًا يَعْبُدُ صَمَدًا ছামাদ ও অমুখাপেক্ষী সত্তার (আল্লাহর) এবাদত করেন।

فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوْفٌ الخ : অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবের উর্ধ্বে, তাঁর সত্তায় একাধিক্যের কোনো সম্ভাবনা নেই, যেহেতু তিনি একত্বের গুণে গুণান্বিত এবং তিনিই সর্বগুণের অধিকারী। তাঁর গুণের তুল্য কেউ নেই।

ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) প্রথম বাক্য দ্বারা اَللهُ اَحَدٌ-এর প্রতি এবং দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা اَللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ এর প্রতি এবং তৃতীয় বাক্য দ্বারা وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেনোনা, আল্লাহর সত্তা একক এবং তাঁর সমূহ গুণাবলীও একক অর্থাৎ, তিনি সত্তাগত দিক দিয়ে যেমন একক, তাঁর কেউ শরিক নেই, তেমন গুণগত দিক দিয়েও তিনি একক, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

আল্লাহর সত্তা সীমা, পরিধি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উর্ধ্বে

تَعَالَى عَنِ الْحُدُوْدِ وَالْغَايَاتِ وَالْاَرْكَانِ وَالْاَعْضَاءِ وَالْاَدْوَاتِ لَاتَحْوِيْهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ.

অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালা সীমা ও পরিধি এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও উপাদান-উপকরণের বহু উর্ধ্বে, যাবতীয় উদ্ভাবিত সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাঁকে ষষ্ঠ দিক পরিবেষ্টন করতে পারে না।

ওপরযুক্ত এবারত দ্বারা ইমাম ত্বাহাবী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এ কথা বোঝানো, সৃষ্টিজগতের সাদৃশ্য থেকে আল্লাহর সত্তা একেবারে মুক্ত পবিত্র।

تَعَالَى عَنِ الْحُدُوْدِ وَ الْغَايَاتِ : আল্লাহর সত্তা সীমা, পরিধি ও প্রান্তসমূহের উর্ধ্বে, তাঁর সীমা বা প্রান্ত নেই। কারণ সমগ্র সৃষ্টি জাতিগত ও গুণগতভাবে আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের থেকে যে সৎকর্ম প্রকাশ পায়, সবই সীমিত বা সীমাবদ্ধ ও পরিমিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

"আর তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে।" অন্য আয়াতে বলেছেন :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

"নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জিনিস তার পরিমাণ পরিমাপ মতো সৃষ্টি করেছি।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, প্রত্যেক বস্তুই তাঁর সৃষ্টি। শরীর, আত্মা এবং আরো যত কিছুর মাধ্যমে প্রাণী বেঁচে থাকে সবই নির্দিষ্ট পরিমাণের সঙ্গে সীমাবদ্ধ। এই সীমা বা পরিমাণ কোনো অবস্থাতেই লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। আর এ কথা সবারই জানা যে, সব বস্তুর সীমা ও পরিমাণ নির্ধারণকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। যেহেতু তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছুই তাঁর বেষ্টনীর ভেতরে সীমাবদ্ধ। এই সীমার বাইরে কোনো কিছু নেই। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত, বেষ্টনকারীকে বেষ্টিত বস্তু কোনো ক্রমেই বেষ্টন করতে পারে না। সুতরাং আল্লাহর কোনো সৃষ্টি আল্লাহকে বেষ্টন করতে পারে না। অতএব আল্লাহ তায়ালা সীমা, পরিধি ও প্রান্তের ঊর্ধ্বে। তাঁর কোনো সীমা নেই।

প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর কাছে গিয়ে শেষ হয় এবং তাঁর কাছেই সবকিছুর প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবং তাঁর দিকেই সবকিছু ফিরে আসবে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ "তোমার পালনকর্তার কাছে সবকিছুর সমাপ্তি।"

وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ "নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে।"

وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ "আর আল্লাহর দিকেই সবকিছু ফিরিয়ে আনা হবেঅ"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহর কাছেই প্রত্যেক বস্তুর সমাপ্তি-শেষ ও প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবং তাঁর কাছেই সবকিছু ফিরে যাবে কিন্তু আল্লাহর সমাপ্তি বা শেষ নেই, কোথাও গিয়ে তার সমাপ্তি ঘটবে 'না।

وَالْأَرْكَانُ وَالْأَعْضَاءُ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঊর্ধ্বে। কারণ অঙ্গ-প্রতঙ্গ মূল পদার্থের অংশ হয়ে থাকে। আর আল্লাহর সত্তা বাছীত (অকৃত্রিম) তাঁর কোনো অংশ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই এবং এগুলোর কোনো প্রয়োজনও নেই। তাঁর কোনো কাজ করতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা কোনো বস্তুর প্রয়োজন হয় না; বরং তাঁর আদেশমাত্র সবকিছু হয়ে যায়। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"একমাত্র আল্লাহর কাজ হলো, যখন কোনো বস্তুর ইচ্ছা করেন, তখন এই বস্তুকে হয়ে যাও বলা, তখন তা হয়ে যায়।" পক্ষান্তরে মানুষ তথা মাখলুক কোনো কাজ করতে হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন হয়। তাই মানুষ তথা মাখলুককে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সংঘটিত করা হয়েছে। অতএব প্রমাণিত হয়ে গেলো, আল্লাহর সত্তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উর্ধ্বে, তিনি এ সব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

একটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর

প্রশ্ন হতে পারে, পবিত্র কোরআন-সুন্নায় আল্লাহর অঙ্গ-প্রতঙ্গের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন يَدُ اللهِ আল্লাহর হাত, وَجْهُ اللهِ আল্লাহর চেহারা, اَلْقَدَمُ পা, اَلْاَصَابِعُ অঙ্গুলীসমূহ ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) কিভাবে বললেন, আল্লাহর সত্তা অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে পবিত্র ও মুক্ত।

উত্তর : পূর্ববর্তী আলিমগণের মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালার আরশের ওপর বিরাজমান হওয়ার বা অন্যান্য অর্থ বিশ্লেষণে যে সীমারেখা উল্লেখ করেছেন, তাতে উদ্দেশ্য সেই সীমারেখা যা কেবল আল্লাহ তায়ালাই জানেন, বান্দা তা জানে না। আর সীমা-পরিধি, অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও উপাদান-উপকরণ দ্বারা ইমাম ত্বাহাবী এই অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর জ্ঞান-হিকমত জাতীয় (মৌলিক) গুণাবলী যথা– চেহারা, হাত, পা, আঙ্গুল, কোমর ইত্যাদির ক্ষেত্রে সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি এসব গুণের দ্বারা বিশেষিত। তবে তাঁর এই গুণাবলী সৃষ্টির গুণাবলীর মতো নয়। এগুলো কেমন তা কেবল তিনিই জানেন। যেমন এ সম্পর্কে ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন :

اِنَّ مَعْنَاهَا مَعْلُوْمٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ وَالْاِيْمَانُ بِهَا وَاجِبٌ وَالسُّوَالُ عَنْهَا بِدْعَةٌ.

"এ সবের আভিধানিক অর্থ জানা আছে, তবে এর কাইফিয়াত-পদ্ধতি জানা নেই, এগুলোর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব, আর এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত।"

وَلَا اَدَوَاتٌ : অর্থাৎ, উপাদান ও উপকরণ থেকে আল্লাহর সত্তা পবিত্র। কেনোনা, আল্লাহর সত্তা লাভ বা ক্ষতি থেকে মুক্ত। তাই আর কোনো উপাদান-উপকরণের প্রয়োজন নেই। যেহেতু দুনিয়ার কোনো কিছু তাঁর কোনো লাভ বা ক্ষতি করতে পারবে না। বরং তিনিই সব কিছুর লাভ-ক্ষতির মালিক, সবকিছুই তাঁর অনুগত ও অধীনে।

যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে

قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

অর্থাৎ, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের ক্ষতি বা উপকার সাধনের ইচ্ছা করেন, তবে কে তাঁকে বিরত রাখতে পারে।

বরং তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত এবং অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

لَنْ يَّضُرَّ اللهَ شَيْئاً

"কোনো কিছু কখনো আল্লাহ তায়ালার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা কারো কোনো উপকার অথবা ক্ষতি সাধন করতে চাইলে তা দুনিয়ার কোনো কিছু খণ্ডন করতে পারবে না এবং দুনিয়ার কোনো কিছু আল্লাহর কোনো লাভ বা ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব আল্লাহর দুনিয়ার কোনো উপাদান ও উপকরণের প্রয়োজন নেই, আল্লাহ তায়ালা এ সবের উর্ধ্বে।

وَلَا تَحْوِيْهِ جِهَاتُ السِّتِّ : অর্থাৎ, সৃষ্ট বস্তুসমূহকে ষষ্ঠ দিক (অর্থাৎ) ১। আসমান (উপর) ২। জমিন (নিচ), ৩। আগ ৪। পশ্চিম ৫। উত্তর ৬। দক্ষিণ বেষ্টন করে রেখেছে, তেমন এই ষষ্ঠ দিক আল্লাহকে বেষ্টন করতে পারবে না। বরং তিনি সবকিছুকে বেষ্টন করে রেখেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ مُّحِيْطًا.

"আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই আর আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর বেষ্টনকারী।"

ওপরযুক্ত আয়াত পরিষ্কার প্রমাণ দিচ্ছে, ষষ্ঠ দিক আল্লাহর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারবে না এবং তাঁর সত্তাই সব দিকসমূহসহ সববস্তুকে বেষ্টন করে রেখেছেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ ও ইসরা সম্পর্কে আকিদা

وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ قَدْ اُسْرِىَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِجَ بِشَخْصِهٖ فِى الْيَقْظَةِ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اِلٰى حَيْثُ مَا شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْعُلٰى وَاَكْرَمَهُ اللّٰهُ بِمَاشَاءَ وَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَااَوْحٰى.

অনুবাদ : মেরাজের ঘটনা ধ্রুব সত্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাত্রে ভ্রমণ করানো হয়েছে। আর তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে প্রথমে আকাশে উঠানো হয়, অতঃপর উর্ধ্বজগতে যেখানে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিলো সেখানে নেয়া হয়। তথায় আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা তা দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন এবং তাঁর প্রতি যে বার্তা দেয়ার ছিলো, তা প্রদান করেন।

مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى "রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে।" (সূরা নাজম : ১১)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি বর্ষণ করুন।

মেরাজ ও ইসরার পার্থক্য

وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ : **ইসরা-** মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করাকে ইসরা বলা হয়। যেমন :

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى (سورة بنى اسرائيل)

"পরম পবিত্রময় ও মহিমাময় সত্তা তিনি যিনি নিজ বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত।"

অতএব ইসরা পবিত্র কোরআনের অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এর অস্বীকারকারীকে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির বলা যায়।

মেরাজ : মসজিদে আক্সা থেকে সপ্তম আকাশ ও ঊর্ধ্বজগত পর্যন্ত ভ্রমণ করাকে মেরাজ বলা হয়। মেরাজ সূরা নজমের এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى.

"তিনি তাঁকে ছিদরাতুল মুনতাহায় দ্বিতীয় বার দেখেছেন।" মেরাজ অনেক মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। অতএব মেরাজ অস্বীকারকারীকে মতান্তরে কাফির বা ফাসেক বলা যাবে।

শায়খ আহমদ মোল্লা জুয়োন (রহ.) স্বীয় কেতাব তাফসিরাতে আহমদীর ৩২৮ পৃষ্টায় লেখেছেন :

قَالَ اَهْلُ السُّنَّةِ بِاَجْمَعِهِمْ اَنَّ الْمِعْرَاجَ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى قَطْعِىٌّ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَاِلٰى سَمَاءِ الدُّنْيَاثَابِتٌ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ وَاِلٰى مَا فَوْقَهٗ مِنَ السَّمٰوٰتِ ثَابِتٌ بِالْاٰحَادِ فَمُنْكِرُ الْاَوَّلِ كَافِرٌ اَلْبَتَّةَ.وَمُنْكِرُ الثَّانِىْ مُبْتَدِعٌ مُضِلٌّ-وَمُنْكِرُ الثَّالِثِ فَاسِقٌ.

"আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত সম্বলিতভাবে বলেন, (১) মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্সা পর্যন্ত মেরাজ আল্লাহর কেতাব (কোরআন) দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। (২) আর মসজিদে আক্সা থেকে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত মেরাজ "হাদিসে মাশহুর" দ্বারা প্রমাণিত। (৩) আর দুনিয়ার আসমান থেকে ছিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্তের মেরাজ "খবরে আহাদ" দ্বারা প্রমাণিত। অতএব প্রথমটির অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফির। দ্বিতীয়টির অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট বিদআতী। তৃতীয়টির অস্বীকারকারী ফাসেক পাপী।

অতঃপর তিনি অত্র কেতাবে লেখেছেন :

وَلَنَا فِىْ كَلَامِ الْقَوْمِ اِشْكَالٌ وَهُوَاَنَّ الْمِعْرَاجَ اِلٰى مَافَوْقَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ اَيْضًا ثَابِتٌ بِالْقُرْاٰنِ وَقَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَاذُكِرَ فِىْ سُوْرَةِ النَّجْمِ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ذُوْمِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْاَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَااَوْحٰى مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاٰى اَفَتُمَارُوْنَهٗ عَلٰى مَايَرٰى وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَايَغْشٰى مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى.

"তাদের কথার মধ্যে আমাদের এ সন্দেহ বা অভিযোগ রয়েছে, মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্তের মেরাজ যেমন কোরআন দ্বারা প্রমাণিত, তেমন বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ঊর্ধ্বজগত পর্যন্তের মেরাজ কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। যেমন সূরা নাজমের এ আয়াত প্রমাণ দিচ্ছে যার অর্থ হচ্ছে, তাঁকে (নবী সা.) কে শিক্ষা দান করেছেন এক কথায় বড় শক্তিশালী সত্তা, সহজাত

শক্তি সম্পন্ন সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল এমন অবস্থায় ঊর্ধ্ব দিগন্তে, অতঃপর নিকটবর্তী হলো ও ঝুলে গেলো, তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিলো, অথবা আরো কম। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করলেন। (রাসূলের) অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে, যা সে দেখেছে! নিশ্চয় সে তাঁকে আরেকবার দেখেছিলো 'ছিদরাতুল মুন্তাহার' কাছে। যার কাছে জান্নাতুল মা'ওয়া। যখন বৃক্ষটাকে আচ্ছন্ন করলো যা আচ্ছন্ন করছিলো। তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং সীমালঙ্ঘন করেনি। নিশ্চয় সে তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছেন।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ দিচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম شَدِيْدُ الْقُوٰى (আল্লাহ তায়ালা অথবা জিব্রিল)-এর অতি কাছে পৌঁছেছিলেন। আর একথা সবাই জানেন, "ছিদরাতুল মুন্তাহা" এবং "জান্নাতুল মা'ওয়া" উভয়ই সাত আসমানের ওপরে। অতএব এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যাবে, পবিত্র কোরআন সাক্ষ্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত আসমানের ওপর পর্যন্ত মেরাজ করেছেন। সুতরাং যারা বলেন, নবীজী সাত আসমান পর্যন্ত মেরাজ করার কথা কোরআনে নেই, তাদের এ কথা ঠিক নয়। (৩৩০ পৃষ্ঠা তাফসিরে আহমদী)

মেরাজ স্বশরীরে হয়েছিলো না রূহানীভাবে?

وَعُرِجَ بِشَخْصِهٖ فِى الْيَقْظَةِ ۔ الخ : অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন।

মেরাজ স্বশরীরে সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিলো না; বরং দৈহিক ছিলো। এ কথা কোরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

১। আগে উল্লেখিত আয়াতের প্রথম سُبْحَانَ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেনোনা, এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। মেরাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ, স্বপ্নজগতে সংঘটিত হতো তবে আশ্চর্যের কি আছে? স্বপ্ন তো প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে, সে আকাশে উঠছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে।

২। عَبْدٌ-শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, শুধু আত্মাকে عَبْدٌ বা বান্দা বলে না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই عَبْدٌ-বান্দা বলা হয়।

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেরাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন, আপনি কারো কারো একথা প্রকাশ করবেন না। প্রকাশ করলে কাফেররা আপনার প্রতি আরো বেশি মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হতো তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিলো।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফিররা মিথ্যারোপ করলো এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলো। এমন কি কতক নও-মুসলিম এসংবাদ শোনে ধর্ম ত্যাগী হয়ে গেলো। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নের হতো তবে এত সব তুল-কালাম কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিলো কি? তবে এ ঘটনার আগে এবং পরে স্বপ্নের আকারে কোনো আত্মিক মেরাজ হয়ে থাকলে, তা এর পরিপন্থী নয়।

একটি প্রশ্নের সমাদান

প্রশ্ন : এখন প্রশ্ন হতে পারে, মেরাজের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ. (بنی اسر ائیل)

"এবং যে বৃক্ষ আমি আপনাকে দেখিয়েছি তাও এ কোরআনে উল্লেখিত। অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য।"

ওপরযুক্ত আয়াতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ স্বপ্ন যোগে হয়েছিলো।

উত্তর : উক্ত আয়াতে رُؤْيَا শব্দটি বলে সংখ্যাগরিষ্ট তাফসিরবিদদের মতে, رؤیت অর্থ : দেখা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু একে رُؤْيَا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই হতে পারে, এ ব্যাপারটি রূপক অর্থে رُؤْيَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এর দৃষ্টান্ত এমন যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে যদি رُؤْيَا শব্দের অর্থ স্বপ্নই হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ মেরাজ হয়ে থাকবে। এ কারণে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.) থেকে যে স্বপ্ন যোগে

মেরাজ হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে তাও যথাস্থানে নির্ভুল। কিন্তু এতে শারীরিক মেরাজ না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তাফসির কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদিসসমূহ মুতাওয়াতির নাক্কাশ এ সম্পর্কে বিশজন সাহাবির রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন এবং কাজি আয়ায শেফা গ্রন্থে আরো বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাছির (রহ.) স্বীয় তাফসির গ্রন্থে এসব রেওয়ায়াত পূর্ণরূপে যাচাই বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পঁচিশজন সাহাবির নাম উল্লেখ করেছেন, তাদের কাছ থেকে এসব রেওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। এরপর ইবনে কাসির বলেন :

فَحَدِيْثُ الْإِسْرَاءِ اَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَالْمُلْحِدُوْنَ.

"ইসরার হাদিসের ওপর সব মুসলমানদের ঐক্যমত রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী এবং জিন্দীকরা একে মানে নি।"

ইসরা ও মেরাজের ঘটনা কবে ঘটেছিলো?

ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসির গ্রন্থে বলেন, মেরাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। ১। মুসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়াতে আছে, মেরাজের ঘটনাটি হিজরতের ছয়মাস আগে সংঘটিত হয়।

২। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত খাদিজা (রা.)-এর ওফাত নামাজ ফরজ হওয়ার আগেই হয়েছিলো। ইমাম জহুরী বলেন, হযরত খাদিজার ওফাত নবুওত প্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিলো।

৩। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে রয়েছে, মেরাজের ঘটনা নবুওত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পরে ঘটেছে। ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, মি'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিলো যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিলো। এসব রেওয়ায়াতের সারমর্ম হচ্ছে, মেরাজের ঘটনাটি হিজরতের এক বছর আগে সংঘটিত হয়েছিলো।

৪। হরবী বলেন, ইসরা ও মেরাজের ঘটনা রবিউস সানী মাসের ২৭তম রাতই হিজরতের এক বছর আগে ঘটেছে।

৫। সাহাবি ইবনে কাসিম (রা.) বলেন, নবুওত প্রাপ্তির আঠারো মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে।

মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রেওয়ায়াত উল্লেখ করার পরে কোনো সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি। কিন্তু সাধারণভাবে খ্যাত এই, রজব মাসের ২৭তম রাতই মেরাজের রাত। (মা'আরিফুল কোরআন)

হাউজে কাওছার সম্পর্কে আকিদা

وَالْحَوْضُ الَّذِىْ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى غَيَاثًا لِاُمَّتِهٖ حَقٌّ

অনুবাদ : হাওজে কাওছার সত্য, যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে উম্মতের পিপাসা নিবারণার্তে দান করে সম্মানিত করেছেন।

اَلْحَوْضُ الخ : অর্থাৎ কঠিন পিপাসার সময়ে উম্মতে মুহাম্মাদীর পিপাসা নিবারণের জন্যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হাউজে কাওছার দান করে সম্মানিত করেছেন। তা পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন :

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ : নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি। হাউজে কাওছার সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে :

بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فِى الْمَسْجِدِ اِذْ اُغْفِىَ اِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهٗ مُتَبَسِّمًا قُلْنَا مَا اَضْحَكَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ سُوْرَةٌ اٰنِفًا فَقَرَاَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ الخ- ثُمَّ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَاالْكَوْثَرُ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهٗ نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّىْ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ وَهُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ اُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اٰنِيَتُهٗ عَدَدُ نُجُوْمٍ فِى السَّمَاءِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَاَقُوْلُ رَبِّ اِنَّهٗ اُمَّتِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ (رواه البخارى ومسلم)

"একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে তন্দ্রা অথবা এক প্রকার অচেতনার ভাব দেখা দিলো। অতঃপর তিনি হাসিমুখে মস্তক মুবারক উত্তোলন করলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন, এই মুর্হূতে আমার প্রতি একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহসহ সূরা কাওসার পাঠ করলেন এবং বললেন, তোমরা কি জান হাউজে কাওছার কি? আমরা বললাম, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে আমাকে এটা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউজে কেয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকা পরিমাণ হবে। তখন কতেক লোককে ফেরেশতাগণ হাউজ থেকে হটিয়ে দেবেন। আমি বলব,

পরওয়ারদেগার সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মতো ও পথ অবলম্বন করেছিলো।"

(বুখারী ও মুসলিম)

হাওজে কাওসার সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস তাওয়াতুরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে ত্রিশের অধিক সাহাবি (রা.) হাউজে কাওসারের হাদিস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য হাউজে কাওসারকে স্বীকার করা।

শাফাআত সম্পর্কে আকিদা

وَالشَّفَاعَةُ الَّتِيْ اِدَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ لِمَا رُوِىَ فِى الْاَخْبَارِ.

অনুবাদ : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আত সত্য। তিনি তা আপন উম্মতের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন। যেমন হাদিসে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

وَالشَّفَاعَةُ : অর্থাৎ, আল্লাহর অনুমতিক্রমে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.), ফেরেশতা, আলিম, শহিদ, পুণ্যবান মুমিন ও কোরআনে হাফেজগণ পরকালে গুনাহগার মুমিনদের জন্য শাফা'আত সুপারিশ করতে পারবে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা বলা হয়েছে :

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ.

"এমন কে আছে, যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে।"

ওপরযুক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, আল্লাহর অনুমতিক্রমে কিছু সংখ্যক লোক সুপরিশ করবেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) লেখেছেন, কেয়ামতের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আত ছয় রোকমের হবে।

প্রথমতঃ ময়দানে হাশরের কষ্ট ও মুসিবত হতে মুক্তির জন্য সুপারিশ করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো কাফিরের আজাব সহজ করার জন্য সুপারিশ করা হবে। যেমন আবু তালিবের ব্যাপারে সুপারিশের কথা বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ যেসব মুমিন জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তাদের জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য সুপারিশ করা হবে।

চতুর্থতঃ যেসব মুমিন স্বীয় বদ আমলের কারণে জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত হয়েছেন, তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হবে।

পঞ্চমতঃ কোনো কোনো মুমিন বিনা হিসেবে জান্নাতে গমন করার জন্য সুপারিশ করবেন।

ষষ্ঠতঃ মুমিনদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করবেন। আর যেসব মুমিন কবিরা গোনাহতে লিপ্ত থাকার কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, এদেরকে নবীজীর সুপারিশের মাধ্যমে মুক্তি দেয়া হবে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

شَفَاعَتِيْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِيْ

"আমার শাফাআত, আমার উম্মতের কবিরা গোনাহগারদের জন্য (কার্যকর) হবে।"

কিন্তু মুতাযেলা এবং খাওয়ারিজরা ওই শাফাআতকে অস্বীকার করে। অথচ তাদের পক্ষে কোরআন-সুন্নাহর নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণাদি নেই।

আল্লাহর ওয়াদা সম্পর্কে আকিদা

وَالْمِيْثَاقُ الَّذِيْ اَخَذَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ اٰدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ حَقٌّ.

অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.) ও তাঁর সন্তান সন্ততিদের কাছে থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা সত্য।

والميثاق : আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.) এবং তাঁর সমস্ত সন্তান-সন্ততিদের কাছে থেকে নিজ প্রভুত্বের যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তা সত্য। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। যেহেতু তা কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ.

অর্থাৎ, আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করে তাদের সন্তানদের এবং নিজের ওপর তাদের প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বললো, অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। কেয়ামতের দিন তোমরা বলতে পারো, আমরা এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম।

(সূরা আরাফ)

কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর

এখানে কয়েকটি প্রশ্ন হতে পারে, ১। এ অঙ্গিকার কি? ২। এবং কোথায় এবং কখন নেয়া হয়েছিলো ৩। এবং কিভাবে নেয়া হয়েছিলো?

প্রথম উত্তর : ওপরযুক্ত আয়াতে সেই বিশ্বজনীন, শ্রেষ্ট মর্যাদাশীল অঙ্গীকারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সমস্ত আদম সন্তানের কাছ থেকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানুষ এই দুনিয়াতে আসার আগেই সৃষ্টি লগ্নে নিয়েছিলেন। যাকে সাধারণ ভাষায় عَهْد اَلَسْتُ বলা হয়।

দ্বিতীয় উত্তর : এ সম্পর্কে মুফাসসিরে কোরআন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও হাকেম (রহ.) যে রেওয়ায়াত পেশ করেছেন তা হচ্ছে এই, এই অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতির স্থানটি হলো ওয়াদিয়ে নামান, যা আরাফাতের ময়দান নামে প্রসিদ্ব ও খ্যাত রয়েছে।

তৃতীয় উত্তর : মুসলিম ইবনে ইয়াছার (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত উমর ফারুক (রা.) কে ওপরযুক্ত আয়াত সম্পর্কে প্রশ্নকারীর জবাবে তিনি বলেছিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেন। তারপর স্বীয় কুদরতের হাত যখন তার পিঠে বুলিয়েছিলেন, তখন তার ঔরসে যত সৎমানুষ জন্মাবার ছিলো তারা বেরিয়ে এলো। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন. এদেরকে আমি জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করেছি এবং জান্নাতবাসীদের (মত) আমল করার জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা জান্নাতের আমল করবে। পুনরায় তার পিঠে স্বীয় কুদরতের হাত বুলালেন। তখন যত পাপী তাপী মানুষ তার ঔরসে জন্মাবার ছিলো তাদের বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি দোযখের জন্য এবং দোযখীদের (মতো) আমল করার জন্য সৃষ্টি করেছি। সুতরাং এরা দোযখে যাবার আমল করবে। তখন একজন নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই যখন জান্নাতি ও দোযখী সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে তখন

তার আমল করার প্রয়োজন কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন আল্লাহ তায়ালা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন সে জান্নাত বাসীর আমলই শুরু করে। পরিশেষে তার মৃত্যু এমন কাজের ওপর হয় যা জান্নাতবাসীর কাজ। আর আল্লাহ যখন কাউকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেন তখন সে দোযখের আমল আরম্ভ করে। পরিশেষে তার মৃত্যু এমন কাজের ওপর হয় যা দোযখীদের কাজ। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

মোটকথা, মানুষ যখন জানে না, সে কোনো শ্রেণীর্ভুক্ত, তখন তার পক্ষে নিজের সামর্থ্য, শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা জান্নাত বাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কর্তব্য, সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

জান্নাতি এবং জাহান্নামিদের সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নন

وَقَدْ عَلِمَ اللهُ فِيْمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَعَدَدُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَلَايَزْدَادُ ذٰلِكَ الْعَدَدُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ.

অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালা অনাদিকাল হতে সামগ্রিকভাবে জানেন কিছু সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর কিছু সংখ্যক লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এই সংখ্যা আর বৃদ্ধি পাবে না এবং হ্রাসও হবে না।

অর্থাৎ, ইতঃপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয় সামগ্রিকভাবে জানেন। তাঁর জানার বাইরে একটি বালিকণাও নেই এবং সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন, অনুপস্থিত, উপস্থিত, দৃশ্য, অদৃশ্য সবকিছু তিনি জানেন। তিনি মাখলুক সৃষ্টির আগ থেকেই তাঁর অনাদি জ্ঞান দ্বারা সামগ্রিকভাবে জানেন, কারা এবং কি পরিমাণ লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে? এ পরিমাণ থেকে একজন লোকও বৃদ্ধি এবং হ্রাস পাবে না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ.

"একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :

وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

"আল্লাহ তায়ালা তাদের সবকিছু বেষ্টন করে রেখেছেন এবং প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা (গণনা) হিসাব করে রেখেছেন।"

যেমন, প্রত্যেক বস্তুর পরিসংখ্যান আল্লাহরই গোচরীভূত। পাহাড়ের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ পানি বিন্দু আছে, প্রত্যেক বৃষ্টিতে কত সংখ্যক ফোঁটা বর্ষিত হয় এবং সারা জাহানের বৃক্ষ সমূহের পাতার সঠিক পরিসংখ্যান তাঁর জানা আছে। তেমনিভাবে কি পরিমাণ লোক জান্নামে যাবে এবং কি পরিমাণ লোক জাহান্নামে যাবে, এর সংখ্যা মাখলুক সৃষ্টির আগে থেকে সামগ্রিকভাবে জানেন। এই সংখ্যা থেকে একজন লোক বাড়বে না এবং কমবেও না।

আল্লাহ্ বান্দার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত

وَكَذٰلِكَ اَفْعَالُهُمْ عَلِمَ مِنْهُمْ اَنْ يَّفْعَلُوْهُ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ وَالْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ.

অনুবাদ : তদ্রূপ আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কেও আগ হতে অবগত আছেন। যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পক্ষে সে কাজ সহজসাধ্য করা হয়েছে। আর সকল কাজের মূল্যায়ন শেষ পরিণতির ওপর নির্ভর করে।

كَذٰلِكَ اَفْعَالُهُمْ : অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালা যেমন অনাদিকাল থেকে জান্নাতি এবং জাহান্নামিদেরকে তাদের সংখ্যাসহ পরিপূর্ণভাবে জানেন। তেমনিভাবে তিনি বান্দাদের সব কাজ-কর্ম সম্পর্কেও পূর্ণভাবে অবগত আছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ.

"আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে এবং তোমাদের কাজ-কর্মকে (যা তোমরা করে থাক) সৃষ্টি করেছেন।" আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত সত্য, সৃষ্টিকর্তা তার সমগ্র সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন। অতএব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সমস্ত কাজ-কর্ম সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত আছেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছু নেই।

وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

"যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে কাজ তার জন্য সহজসাধ্য করে দেয়া হয়।" সুতরাং যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য জান্নাতের কাজ করা সহজ করে দেয়া হয়। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.

"যে আল্লাহর পথে দান করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং উত্তম বিষয় (জান্নাত)কে সত্য মনে করে। তখন আমি সত্বর তাকে সহজ করে দেই সেই সুখের জন্য। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.

"যে কৃপণতা করে আর বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়ে (জান্নাত)কে অস্বীকার করে তখন আমি তাকে সহজ করে দেই কষ্টের জন্য।"

এখানে বাহ্যতঃ এরূপ বলা সঙ্গত ছিলো, আমি তাদের জন্যে জান্নাতের অথবা জাহান্নামের কাজ সহজ করে দেই। কেনোনা কাজ-কর্মই সহজ অথবা কঠিন হয়ে থাকে, ব্যক্তি সহজ বা কঠিন হয় না। কিন্তু কোরআন পাক এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, স্বয়ং তাদের সত্তাকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেয়া হবে।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে, প্রথম দলের জন্যে জান্নাতের কাজ-কর্ম তাদের স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হবে। আর এর বিপরীত কাজ করতে তারা কষ্ট অনুভব করবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় দলের জন্যে জাহান্নামের কাজ-কর্ম তাদের স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত করে দেয়া হবে, ফলে তারা এ জাতীয় কাজই পছন্দ করবে এবং এতেই শান্তি পাবে। উভয় দলের স্বভাবে ও মজ্জায় এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেয়াকেই একথা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, স্বয়ং তাদের এসব কাজের জন্য সহজ করে দেয়া হবে। বুখারী ও মুসলিম শরিফের একটি হাদিস এ কথার সমর্থন করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ يُسْرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ.

"তোমরা কাজ করতে থাকো; কেনোনা প্রত্যেকের জন্য ওই কাজই সহজ করে দেয়া হয়, যে কাজের জন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সে ব্যক্তি জান্নাতি, পুণ্য ও সৌভাগ্যবানদের অর্ন্তভুক্ত, তার জন্যে পুণ্য ও সৌভাগ্যবানগণের কাজ সহজ করে দেয়া হয়। আর যে জাহান্নামি দুর্ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত তার জন্যে দুর্ভাগ্যবানদের কাজ সহজ করে দেয়া হয়।"

وَالْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ : অর্থাৎ, সব কাজের মূল্য বা মর্যাদা তার শেষ পরিণতির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যথা : (১) কোনো মানুষ যদি সারা জীবন কাফির থাকে, অবশেষে সে মুসলমান হয়ে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে

ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার প্রথম জীবনের কৃতকর্মের ওপর কোনো ধর তায়ালাড়াও হবে না। (২) পক্ষান্তরে কেউ মুসলমান অবস্থায় সারা জীবন নেক আমল করেছে। পরিশেষে সে মুরতাদ হয়ে গেলো এবং মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হলো, نَعُوْذُ بِاللهِ তাহলে তার প্রথম জীবনের কোনো নেক আমলের কোনো ফল পাবে না। প্রথম ব্যক্তি নেক আমল ও ঈমানের ওপর মৃত্যুবরণ করার কারণে জান্নাতি হবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বদ আমল কুফরীর অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার কারণে জাহান্নামি হবে। যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا فَاِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهٗ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ وَاَنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهٗ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ.

"তোমরা সৎপথে থেকে ঠিকভাবে (নেক) কাজ করতে থাকো এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হও। কেনোনা জান্নাতি লোকের শেষ নিঃশ্বাস হবে জান্নাতিগণের আমলের ওপর। আগে সে যে ধরনের আমল করুক না কেন। এরূপভাবে জাহান্নামি ব্যক্তির শেষ নিঃশ্বাস জাহান্নামিদের কাজের ওপর হবে, ইতিপূর্বে সে যে ধরনের কাজ করুক না কেনো।" (তিরমিযী)

হাদিস শরিফে বলা হয়েছে :

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ.

"আমলের মূল্যায়ন শেষ পরিণতির ওপর নির্ভর করে।"

তাকদির সম্পর্কে আকিদা

সৌভাগ্যবান ও হতভাগ্য কে?

وَالسَّعِيْدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللهِ وَالشَّقِىُّ مَنْ شَقِىَ بِقَضَاءِ اللهِ.

অনুবাদ : প্রকৃত সৌভাগ্যবান সেই, যে আল্লাহর ফয়ছালায় সৌভাগ্যবান হয় এবং প্রকৃত দুর্ভাগা সেই, যে আল্লাহর ফয়ছালায় দুর্ভাগা হয়।

وَالسَّعِيْدُ وَالشَّقِىُّ : অর্থাৎ, কোনো মানুষ তার চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হতে পারবে না। বরং সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি যাকে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা সৌভাগ্যবান বলে ফয়সালা করে দিয়েছেন। আর

কোনো মানুষ তার চেষ্টা সাধনার ত্রুটির কারণে হতভাগা বা দুর্ভাগ্য হতে পারবে না; বরং হতভাগা বা দুর্ভাগা ওই ব্যক্তি যে তার মায়ের পেটে থাকাকালীন অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা হতভাগা বা দুর্ভাগা ফয়সালা করেছেন। যেমন হাদিস শরিফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَاَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ اَوْسَعِيْدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحُ.

"অতঃপর আল্লাহ তায়ালা চারটি বিষয় দিয়ে একজন ফেরেশতাকে তার কাছে প্রেরণ করেন। তখন ফেরেশতা (১) তার আমল (সে কি কি আমল করবে), (২) তার মৃত্যু, (৩) রিযিক-ধন সম্পদ, (৪) দুর্ভাগা-হতভাগা, না সৌভাগ্যবান তা লেখে দেন। অতঃপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন।" কেউ বলেন, **سَعَادَة** দ্বারা হেদায়াত উদ্দেশ্য। আর **شَقَاوَة** দ্বারা ভ্রষ্টতা উদ্দেশ্য। আর উভয়টাই আল্লাহর ফয়সালা অনুসারে হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ.

"আল্লাহ্ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই। আর আল্লাহ তায়ালা যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই।"

সুতরাং সৌভাগ্যবান হওয়া এবং দুর্ভাগা হওয়া মানুষের চেষ্টা সাধনার বাইরের বিষয়। এতে মানুষের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। তাই ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) বলেছেন :

তাকদির বলতে কী বোঝায়?

وَاَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ خَلْقِهٖ لَمْ يَطَّلِعْ عَلٰى ذٰلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَانَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظْرُ فِىْ ذٰلِكَ ذَرِيْعَةُ الْخُذْلَانِ وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ فَالْحَذْرُ كُلَّ الْحَذْرِ مِنْ ذٰلِكَ نَظْرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً.

অনুবাদ : তাকদির (সম্পর্কে) মূল কথা হলো, (এই, এটি) সৃষ্টি জগতে আল্লাহর (এমন এক গোপন) রহস্য। এ সম্পর্কে আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত কোনো ফেরেশতা যেমন অবগত নন, তেমনি কোনো নবী রাসূলও অবগত নন। এই বিষয়ে গভীরভাবে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা বা চিন্তা-ভাবনা করার পরিণতি

ব্যর্থতা, বঞ্চনার সিঁড়িতে সীমা লঙ্ঘনের সোপান ব্যতীত আর কিছু নয়। অতএব এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও কুমন্ত্রণা থেকে পূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে হবে।

اَصْلُ الْقَدْرِ : যেহেতু তাকদির এমন এক গোপন রহস্য যার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী-রাসূল (আ.)গণকে অবগত করেন নি। তারাও আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে এর ওপর অভিহিত হতে পারেননি। সুতরাং অন্য কোনো জ্ঞানী, গুণীর পক্ষে এ বিষয়ে চিন্তা, গবেষণা করে কোনো তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব নয়, বরং এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাই তাকদির সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনাকারী সাহাবি (রা.)গণের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়েছিলেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে :

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتَّى اِحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتّٰى كَاَنَّمَا فُقِئَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ اَبِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُمْ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ عَزِمْتُ عَلَيْكُمْ عَزِمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لَّا تَنَازَعُوْا فِيْهِ.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এমতাবস্থায় বের হয়ে এলেন, আমরা তাকদির সম্পর্কে পরস্পর বিতর্ক করছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন, তাঁর চেহারা মুবারক লাল বর্ণ হয়ে গেলো যেনো তাতে আনারের দানা নিংড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কি এ সম্পর্কে আলোচনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা আমি কি এ নিয়ে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি। তোমাদের আগের লোকেরা একমাত্র এ সম্পর্কে বিতর্ক করে ধ্বংস হয়েছে। আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি, তোমরা এ সম্পর্কে বিতর্ক করো না। (তিরমিযী)

ওপরযুক্ত হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, তাকদির আল্লাহ তায়ালার একটি গোপন রহস্য এ সম্পর্কে পর্যালোচনা বা বিতর্ক করার কারো কোনো অধিকার নেই। তাই ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) বলেছেন,

তাকদির সম্পর্কে আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ অবগত নয়

فَإِنَّ اللهَ طَوٰى عِلْمَ الْقَدْرِعَنْ اَنَامِهٖ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهٖ كَمَاقَالَ تَعَالٰى لَايُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ-فَمَنْ سَئَلَ لِمَ فَعَلَ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ.

অনুবাদ : কারণ আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাকদিরের জ্ঞান তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে গোপন রেখেছেন এবং তাদের এর তত্ত্ব উদঘাটনের প্রচেষ্টা চালানো থেকে নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা তার পবিত্র কেতাবে বলেন :

لَايُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ : তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তারাই গোপন কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে, (সূরা আম্বিয়া-২৩) সুতরাং যে ব্যক্তি প্রশ্ন করবে, তিনি কেন এ কাজ করলেন? সে আসলে আল্লাহর কেতাবের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করলো। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কেতাবের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করবে, সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

فَإِنَّ اللهَ طَوٰى عِلْمَ الْقَدْرِ : যেহেতু তাকদির দীনের মৌলিক আকিদাসমূহের এমন এক রহস্য, যা মানুষের বুদ্ধি ও বিবেকসমূহের ঊর্ধ্বে এবং কাজ সমূহের এমন এক কাজ, যার ওপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। বরং তারা (তাদের কৃতকর্মের ওপর) জিজ্ঞাসিত হবে। তাকদিরের বিষয়টি বুদ্ধির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তার সীমার চেয়ে অধিক সূক্ষ্ম, এর সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও গোপন রহস্য আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না এবং মাখলুকের বুদ্ধি ও ধারণা বা কল্পনা এগুলো জানার ক্ষমতাও রাখে না। তাই যে ব্যক্তি তাকদিরের গোপন রহস্য অন্বেষণে লিপ্ত হয়েছে, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা না করে, একে আনুগত্যের সঙ্গে মেনে নিয়েছে সে হেদায়াত পেয়েছে। অতএব মুমিনের ঈমানের হেফাজতের পন্থা হলো, তাকদির সম্পর্কে আলোচনা না করে আনুগত্যের সঙ্গে তা মেনে নেয়া।

فَهٰذِهٖ جُمْلَةٌ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ مَنْ هُوَمُنَوَّرٌ قَلْبُهٗ مِنْ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهِىَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِيْنَ فِى الْعِلْمِ لِاَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ عِلْمٌ فِى الْخَلْقِ مَوْجُوْدٌ وَعِلْمٌ فِى الْخَلْقِ مَفْقُوْدٌ فَاِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُوْدِ كُفْرٌ وَاِدِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُوْدِ كُفْرٌ.

অনুবাদ : এগুলো এমন সব কথা যার প্রতি মুখাপেক্ষী আল্লাহর ওলিগণের মধ্যে যাদের অন্তর আলোকোজ্জ্বল আর এটাই জ্ঞানের মধ্যে সুগভীর প্রাঞ্জলসম্পন্ন ব্যক্তিদের জ্ঞানের পর্যায় বা স্তর। কারণ জ্ঞান দু'প্রকার। (১) এক প্রকার জ্ঞান যা সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিদ্যমান। জ্ঞানের অস্বীকৃতি কুফরী কাজ এবং অবিদ্যমান জ্ঞানের দাবি করাও কুফরী কাজ।

فَهٰذِهٖ جُمْلَةٌ اِلٰخ : আগে তাকদির সম্পর্কে যা আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলোর ওপর যথাযথভাবে আকিদা রাখা অত্যাবশ্যকীয়, যেগুলো ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। তাই আল্লাহর ওলিগণের মধ্যে এসব লোক যাদের অন্ত র আলোকিত তারা এসব কথা মানার মুখাপেক্ষী, এটাই জ্ঞানের গভীরতা অর্জনকারীদের স্তর। কারণ তারা নির্দ্বিধায় আনুগত্যের সঙ্গে আল্লাহর সব আদেশ, নিষেধ পালন করে।

عِلْمُ الْمَوْجُوْدِ : বিদ্যমান বা উপস্থিত জ্ঞান, অর্থাৎ, যে জ্ঞান সামগ্রিকভাবে এবং বিস্তারিতভাবে এবং আদেশ, নিষেধ হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছিলেন। এটি জ্ঞানের মধ্যে গভীরতা অর্জনকারীদের স্তর। যেমন পবিত্র করআনে বলা হয়েছে :

مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ.

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের যা (আদেশ) দেন তা গ্রহণ করো এবং যা তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :

وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ، كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا.

"যারা জ্ঞানে গুণে গভীর তারা বলেন, আমরা এর প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছি। এ সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে।" এ জ্ঞান সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلْعِلْمُ ثَلٰثَةٌ اٰيَةٌ مُّحْكَمَةٌ اَوْسُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْفَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ (رواه ابوداود)

অর্থাৎ, জ্ঞান তিনটি (১) মুহকাম আয়াতসমূহ (২) অরহীত সুন্নাতসমূহ (৩) কোরআন ও সুন্নাহর মুয়াফিক কিয়াসসমূহ। কেউ বলেন, علم الموجود-এর উদ্দেশ্য হলো শরিয়তের জ্ঞান। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত সত্য, শরিয়তে ইসলামিয়ার জ্ঞানের অস্বীকারকারী কাফির। সুতরাং ইলমুল মাওজুদের অস্বীকারকারী কাফির।

عِلْمُ الْمَفْقُوْدُ : অর্থাৎ, অবিদ্যমান বা অদৃশ্য জ্ঞান। এতে কতেক বস্তুর জ্ঞান উদ্দেশ্য হতে পারে।

(১) তাকদিরের গোপন তথ্যের জ্ঞান যা আল্লাহ তায়ালা মানুষ থেকে গোপন রেখেছেন এবং এর উদ্দেশ্য তালাশ করতে নিষেধ করেছেন।

(২) রূহের হাকিকতের জ্ঞান যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا.

অর্থাৎ, আপনি বলে দিন রূহ আমার পালনকর্তার আদেশে ঘটিত, আর তোমাদেরকে অতি অল্প জ্ঞান দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, সাধারণ সৃষ্ট জীবের মতো উপাদনের সমন্বয়ে এবং বংশ বিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি। বরং তা সরাসরি আল্লাহ তায়ালার আদেশ كُنْ (হও) দ্বারা সৃজিত।

(৩) কেয়ামতের নির্ধারিত সময়ে জ্ঞান যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا قُلْ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّاهُوَ.

"এরা আপনার কাছে কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তা কবে আসবে? আপনি বলে দিন, এর নির্দিষ্ট জ্ঞান আমার পালনকর্তারই রয়েছে।" এ ব্যাপারে আগ থেকে কারো জানা নেই এবং সঠিক সময়ও কেউ জানতে পারবে না। নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে। ঠিক তখনই আল্লাহ তায়ালা তা প্রকাশ করে দেবেন– এতে কোনো মাধ্যম থাকবে না।

(৪) মাফাতিহুল গাইব– গাইবের চাবিকাঠিসমূহের জ্ঞান। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَا اِلَّاهُوَ.

"আল্লাহর কাছেই (গাইব) অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠিসমূহ রয়েছে এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।"

(৫) আবিষ্কার করা এবং ধ্বংস করার ক্ষমতার পদ্ধতির জ্ঞান অথবা এই দুটির হাকিকতের জ্ঞান ইত্যাদি ওপরোল্লেখিত বিষয়সমূহের জ্ঞান এক আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই জানে না। যেহেতু এগুলোকে 'ইলমে মাফকুদ' বলা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সব বিষয়ের জ্ঞানের দাবি করবে সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ এই জ্ঞান আল্লাহর বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব। আর যে ব্যক্তি এই জ্ঞানের দাবি করবে তার ঈমান থাকবে না। অতএব সে কাফির হয়ে যাবে। তাই ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) বলেছেন যে :

وَلَا يَصِحُّ الْاِيْمَانُ اِلَّا بِقَبُوْلِ الْعِلْمِ الْمَوْجُوْدِ وَتَرْكِ الْعِلْمِ الْمَفْقُوْدِ.

অনুবাদ : বিদ্যমান জ্ঞান গ্রহণ করা আর অবিদ্যমান অদৃশ্য জ্ঞানের অন্বেষণ ছেড়ে দেয়া ছাড়া ঈমান বিশুদ্ধ হবে না।

লাওহে মাহফুজ এবং কলম সম্পর্কে আকিদা

وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيْعِ مَاقَدْ رُقِمَ فَلَوْ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ اَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوْهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوْا عَلَيْهِ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا كُلُّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ فِيْهِ لِيَجْعَلُوْهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوْا عَلَيْهِ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অনুবাদ : আমরা লাওহে মাহফুজ (সংরক্ষিত ফলক) ও কলম এবং এতে লিপিবদ্ধ সবকিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি। অতএব যদি সমস্ত সৃষ্টিকুল একত্রিত হয়ে চেষ্টা করেন এ বিষয় না হওয়ার জন্য, যা হওয়ার কথা আল্লাহ তায়ালা 'লাওহে মাহফুজে' লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তারা এতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে যদি সমস্ত সৃষ্টি একত্রিত হয়ে এমন বিষয় হওয়ার জন্য চেষ্টা চালায়, যা হওয়ার কথা আল্লাহ তায়ালা 'লাওহে মাহফুজে' লেখেননি, তারা এতেও সক্ষম হবে না। কেয়ামত পর্যন্ত যা হবার তার লেখা চূড়ান্ত হয়ে কলম শুকিয়ে গেছে।

লাওহে মাহফুজ বলতে কী বোঝায়?

اَللَّوْحُ : সংরক্ষিত ফলক এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ.

বরং এ সম্মানিত কোরআন 'লাওহে মাহফুজে' সংরক্ষিত। ইমাম বাগাবী মুয়ালিমুত তানজীলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সনদে উল্লেখ করেছেন, 'লাওহে মাহফুজ' সাদা মুক্তার তৈরি। এর দৈর্ঘ্য আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত দূরত্বের মতো। অর্থাৎ, পাঁচশ বছরের পথ। এর কিনারসমূহে পদ্মরাগ মণি বসানো। আর এর প্রান্তসমূহ পদ্মরাগের তৈরি এবং এতে নূরের কলম 'কলমে কাদীম' দ্বারা লিখিত আছে। এই ফলকের ওপর প্রান্ত আরশে এলাহীর সঙ্গে ঝুলন্ত আছে এবং নিচ প্রান্ত একজন সম্মানিত ফেরেশতার কোলে রেখেছেন আর তিনি আরশের ডান পার্শ্বে দাঁড়ানো রয়েছেন। 'লাওহে মাহফুজের (সংরক্ষিত ফলকের) ওপরে এই এবারত (বাক্য) লিখিত আছে :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ دِيْنُهُ الْاِسْلَامُ وَمُحَمَّدٌ عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ فَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَصَدَّقَ بِوَعْدِهٖ وَاتَّبَعَ رَسُوْلَهٗ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ (تفسير فتح العزيز)

"আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি একা, তাঁর (পছন্দনীয়) দীন ইসলাম, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে আর তাঁর ওয়াদা (অঙ্গিকার) বিশ্বাস করবে আর তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।" (তাফসিরে ফাতহুল আজিজ)

কলম বলতে কী বোঝায়?

وَالْقَلَمُ بِجَمِيْعِ مَا قَدْ رُقِمَ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কলম এবং তার সমস্ত লেখনীর ওপর ঈমান রাখেন।

কলম : হযরত কাতাদা (রহ.) বলেন, কলম আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় নেয়ামত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাত দ্বারা এটি সৃষ্টি করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهٗ اُكْتُبْ قَالَ مَا اَكْتُبُ قَالَ اُكْتُبِ الْقَدْرَ فَكَتَبَ مَاكَانَ وَمَاهُوَ كَائِنٌ اِلَى الْاَبَدِ. (رواه الترمذى)

"আল্লাহ্ তায়ালা সর্বপ্রথম যে বস্তু সৃষ্টি করেছিলেন, তা হচ্ছে কলম। অতঃপর তিনি কলমকে (আদেশক্রমে) বললেন, লেখ, কলম আরজ করলো কি লেখবো? তিনি বললেন, ক্বদর, তাকদির লিপিবদ্ধ কর। কলম আদেশ অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হওয়া সমস্ত বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করলো।" (তিরমিযী)

ইমামে তাফসির মুজাহিদ আবু আমর থেকে নকল করেছেন, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় কুদরতি হাত দ্বারা চারটি বস্তু বানিয়েছেন, এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট সব মাখলুক তাঁর আদেশ (كُن) দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এই চার বস্তু হলো (১) কলম (২) আরশ (৩) জান্নাতে আনন্দ (৪) আদম (আ.)।

কলম তিন প্রকার : (১) সর্বপ্রথম মাখলুক কলম, যাকে আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় কুদরতী হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সমগ্র জগতের তাকদির লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। (২) ফেরেশতাদের কলম, যার দ্বারা তারা সংঘটিত হওয়ার মতো সমস্ত ঘটনাবলী এবং এর পরিমাণসমূহ, আর মানুষের আমল সমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। (৩) সাধারণ লোকের কলম, যার দ্বারা তার স্বীয় কথা লেখেন ও উদ্দেশ্যগত কাজ সমাধান করেন।

কলম দ্বারা কোন্ কলম উদ্দেশ্য

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, এখানে কোন্ কলম উদ্দেশ্য?

জবাব : এখানে আল্লাহ্ তায়ালার সর্ব প্রথম মাখলুক এই কলম উদ্দেশ্য, যার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টির তাকদির লেখেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হওয়ার মতো কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করেছেন। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ فَلَوْ اِجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ الخ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালা যে সব বিষয়াদি হওয়ার কথা লাওহে মাহফুজে লেখে রেখেছেন, যদি সমস্ত মাখলুক একত্রিত হয়ে এসব বিষয়াদির কোনো একটি খণ্ডন করতে চায় তবে তারা তা করতে পারবে না। যেহেতু তারা এর কোনো ক্ষমতা বা অধিকার রাখে না। পক্ষান্তরে যে সব বিষয়াদি না হওয়ার কথা আল্লাহ্ তায়ালা লাওহে মাহফুজে লেখেছেন, যদি সমস্ত মাখলুক একত্র হয়ে এর মধ্যে কোনো একটি বিষয় ঘটাতে চায়, তবে তারা তা করতে পারবে না। যেহেতু তারা এর কোনো ক্ষমতা বা অধিকার রাখে না। আর 'লাওহে মাহফুজে' নতুনভাবে কোনো কিছু লেখা হবে না। কেনোনা, কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু

হওয়ার বা না হওয়ার সব কিছু তিনি তাতে লেখে সমাপ্ত করে ফেলেছেন এবং কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। অতএব লাওহে মাহফুজের লেখনীর মধ্যে নতুনভাবে কোনো কিছু সংযোজন বা সংশোধন করা হবে না।

মানুষের ভাগ্যে লিখিত সবকিছুই তার ওপর আসে

مَا اَخْطَأَ الْعَبْدُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ وَمَا اَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَعَلَى الْعَبْدِ اَنْ يَّعْلَمَ اَنَّ اللهَ تَعَالٰى سَبَقَ عِلْمُهُ فِيْ كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهٖ فَقَدَّرَ ذٰلِكَ بِمَشِيَّتِهٖ تَقْدِيْرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا لَيْسَ لَهُ نَاقِضٌ وَلَا مُعَقِّبٌ وَلَا مُزِيْلٌ وَلَا مُغَيِّرٌ وَلَا مُحَوِّلٌ وَلَا زَائِدٌ وَلَا نَاقِصٌ مِنْ خَلْقِهٖ فِيْ سَمٰوَاتِهٖ وَاَرْضِهٖ.

অনুবাদ : যা বান্দার কাছে পৌঁছেনি, তা তার কাছে পৌঁছার ছিলো না, আর যা তার কাছে পৌঁছেছে তা তার কাছে কখনোও না পৌঁছার ছিলো না। বান্দার জন্য এ কথা জেনে রাখা কর্তব্য, আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাখলুক থেকে সংঘটিত হওয়ার মতো সর্ব বিষয়াদি সম্পর্কে আগ থেকেই অবগত। অতএব তিনি এগুলোকে স্বীয় ইচ্ছানুসারে সুনিয়ন্ত্রিত ও অকাট্য তাকদির হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে তাঁর সৃষ্টিকুলের মাঝে এমন কেউ নেই যে তা নাকচ মূলতবী, বিলুপ্ত বা এর পরিবর্তন এবং এদিক-সেদিক কিংবা হ্রাস-বৃদ্ধি করার সাধ্য রাখে।

وَمَا اَخْطَأَ الْعَبْدُ : অর্থাৎ, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তি, দুঃখ-কষ্ট, মান-সম্মান ইত্যাদি যা কিছু বান্দা থেকে দূরে রয়েছে এগুলো বান্দার কাছে পৌঁছার কথা– 'লাওহে মাহফুজে' লেখা ছিলো না, এমন হবে না, বান্দার ভাগ্যে কিছু লেখা আছে। আর কার কোনো ক্রুটির কারণে এগুলো বান্দার কাছে পৌঁছেনি। পক্ষান্তরে যে সব ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তি, দুঃখ-কষ্ট, মান-সম্মান, বান্দার কাছে পৌঁছে এগুলো তার কাছে পৌঁছার কথা 'লাওহে মাহফুজে' তার জন্য নির্ধারণ ছিলো। এমন নয়, এগুলো তার চেষ্টা, সাধনার বদৌলতে অর্জন হয়েছে, তার ভাগ্যে এগুলো ছিলো না।

وَعَلَى الْعَبْدِ اَنْ يَّعْلَمَ الخ : অর্থাৎ, বান্দার জন্য এ কথার প্রতি বিশ্বাস রাখা একান্ত কর্তব্য, আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি থেকে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটবে, সে সম্পর্কে তিনি মাখলুক সৃষ্টির আগ থেকেই অবগত ছিলেন, তার জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই নেই এবং কখনো ছিলো না।

যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَايَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ.

"তাঁর (আল্লাহর) কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি কাঠি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। আর স্থলে ও জলে যা আছে, তিনি তা জানেন। আর এমন কোনো পাতা ঝরে না যা তিনি জানেন না এবং যমীনের অন্ধকার সমূহে এমন কোনো শস্যের দানা এবং আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য নেই, যা প্রকাশ্য কেতাবে নেই। সবকিছু আল্লাহর জানা এবং প্রকাশ্য কেতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সব কিছুই আল্লাহর জানা এবং প্রকাশ্য কেতাবের বাইরে একটি বিন্দু কণাও নেই।"

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِ كُمْ اَوْتُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. (سوره ال عمران)

"তুমি বলে দাও যে, তোমরা যদি অন্তরে কোনো কথা গোপন রাখো অথবা প্রকাশ করো; আল্লাহ তায়ালা সে সবই জানেন এবং আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সে সবও তিনি জানেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।"

(সূরা আলে-ইমরান)

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় এবং আরো অনেক আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আদিকাল থেকে যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছু হবে, মাখলুক সৃষ্টির আগ থেকেই আল্লাহ্ তায়ালা এসব অবগত আছেন এবং তিনি এসব 'লাওহে মাহফুজে' লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

পক্ষান্তরে ফালাসাফিদের বিশ্বাস হলো, মাখলুক সৃষ্টির আগে এবং মাখলুক থেকে কোনো কিছু সংঘটিত হওয়ার আগে, জুযয়ীয়্যাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা অবগত ছিলেন না। তাদের এ বিশ্বাস পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী, তাই এ ধরনের বিশ্বাস বা ধারণা রাখা কোরআন সুন্নাহ অস্বীকার করার নামান্তর। সুতরাং যারা এধরনের আকিদা (বিশ্বাস) বা ধারণা রাখবে তারা পথভ্রষ্ট, কাফির।

ال فَقَدَّرَ ذٰلِكَ بِمَشِيَّتِهِ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় ইচ্ছানুসারে সুনিশ্চিত ও অকাট্য তাকদির নির্ধারণ করে রেখেছেন। এটাকে কোনো মাখলুক ভঙ্গ করতে পারবে না এবং وَلَا مُعَقِّبَ পশ্চাতে নিক্ষেপ করতে ও ধ্বংস করতে পারবে না

এবং কোনো অবস্থাতে এতে কোনো ধরনের পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে পারবে না।

যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهٖ.

অর্থাৎ, আল্লাহ যদি তোমাদের ওপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত কেউ তা খণ্ডাবার নেই। (পক্ষান্তরে) আর যদি তিনি কোনো কল্যাণ তোমাকে দান করার ইচ্ছা করেন, তাহলে তাঁর অনুগ্রহকে ফেরাবার কেউ নেই।

وَلَا نَاقِص : আল্লাহর এ অনুগ্রহ (মাখলুক) সৃষ্টি করার ব্যাপারে হউক অথবা শরিয়তের বিধান চালু করার ব্যাপারে হউক। এটাকে ভঙ্গকারী বা ধ্বংসকারী কেউ নেই। যেমন আল্লাহতায়ালা বলেছেন :

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেন তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই।

وَلَامُغَيِّرَ وَلَا مُحَوِّلَ الخ : অর্থাৎ, আর আল্লাহর লিখিত তাকদিরকে কেউ কোনো অবস্থাতে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারবে না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ. (سورة انعام)

অর্থাৎ, আল্লাহর বাণীসমূহকে পবির্তনকারী কেউ নেই। অন্য আয়াতে বলেছেন : مَايُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ অর্থাৎ, আমার কাছে কথার রদ-বদল হয় না। (সূরা কাফ) ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহর কোনো কথা বা কাজ পরিবর্তন হয় না এবং এর পরিবর্তনকারী কেউ নেই।

وَلَازَائِدٌ وَلَا نَاقِصٌ : অর্থাৎ, আল্লাহর সিদ্ধান্তে বা কথায় কেউ কোনো কিছু বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَمْحُوْ اللّٰهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ (سورة رعد)

অর্থাৎ, আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূল গ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে। (সূরা রাদ)

ওপরযুক্ত আয়াতে 'লাওহে মাহফুজ' বোঝানো হয়েছে যাতে কোনো রূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হতে পারে না।

আয়াতের আসল অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অপার শক্তি ও অসীম রহস্য জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়কে ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা বহাল ও বিদ্যমান রাখেন। এরপর যা কিছু হয় তা আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত থাকে। এর ওপর কারো কোনো ক্ষমতা চলে না এবং তাতে হ্রাস, বৃদ্ধি ও কেউ করতে পারে না।

আল্লাহ সৃষ্টি করা ব্যতীত কোনো কিছু সৃষ্টি হয় না

وَلَا يَكُوْنُ مُكَوَّنٌ اِلَّا بِتَكْوِيْنِهٖ، وَالتَّكْوِيْنُ لَا يَكُوْنُ اِلَّا حُسْنًا جَمِيْلًا، وَذٰلِكَ مِنْ عَقْدِ الْاِيْمَانِ، وَاُصُوْلِ الْمَعْرِفَةِ، وَالْاِعْتِرَافُ بِتَوْحِيْدِ اللهِ تَعَالٰى وَرَبُوْبِيَّتِهٖ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالٰى وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا وَقَالَ تَعَالٰى وَكَانَ اَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا.

অনুবাদ : আল্লাহর সৃষ্টি করা ব্যতীত কোনো বস্তু (সৃষ্টি) হবে না। আর আল্লাহর সৃষ্টি করাটা উত্তম এবং সুন্দরই হয়ে থাকে। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের মূলভিত্তি, মারিফাতের মৌলিক নীতিমালা এবং আল্লাহ তায়ালার একত্ব ও প্রভুত্বের সঠিক স্বীকৃতি। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন : وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا আল্লাহ তায়ালা সব বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোকে যথাযথ অনুপাতে করেছেন। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে আরো বলেছেন : وَكَانَ اَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا আর আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত অবধারিত।

وَلَا يَكُوْنُ مُكَوَّنٌ اِلَّا بِتَكْوِيْنِهٖ الخ : অর্থাৎ, আল্লাহর সৃষ্টি করা ব্যতীত কোনো বস্তু সৃষ্টি হয় না এবং তাঁর অস্তিত্ব প্রদান ছাড়া কোনো বস্তু অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না এবং আল্লাহর সৃষ্টি করাটা অত্যন্ত সুন্দর ও সুসংহত। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

صُنْعَ اللهِ الَّذِىْ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ.

"এটা আল্লাহরই কারিগরী। যিনি সব কিছুকে সুসংহত করেছেন।" একটি হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে আমার বান্দারা! নিশ্চয় আমি

আমার ওপর জুলুম অত্যাচার হারাম করেছি এবং একে তোমাদের জন্যেও হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের ওপর জুলুম করবে না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই পথহারা ওই ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি; সুতরাং তোমরা আমার কাছে সৎপথ চাও, আমি তোমাদের সৎপথ প্রদর্শন করবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত ওই ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে আমি ক্ষুধা নিবারণ করেছি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই উলঙ্গ ওই ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে আমি কাপড় পরিধান করেয়েছি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দেবো। হে আমার বান্দারা তোমরা দিবা-রাত্র গোনাহে লিপ্ত থাকো, আর আমি যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করে থাকি, সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। হে আমার বান্দারা! আমার কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমাদের কারো নেই এবং কেউ আমার কোনো উপকার করারও কোনো ক্ষমতা রাখেনি। (মুসলিম) ওপরযুক্ত হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, সবকিছুর মালিক এবং সর্ব বিষয়ের ওপর ক্ষমতাশালী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তিনি ব্যতীত কেউ কোনো কিছু সৃষ্টি করা বা দেয়ার ক্ষমতা রাখে না।

ذٰلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيْمَانِ الخ : অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহকেই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও ভাগ্য নির্ধারণকারী সর্বগুণের অধিকারী বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখাটা হচ্ছে ঈমানের মূলভিত্তি, মা'রিফাতের মৌলিক নীতিমালা ও আল্লাহর একত্ব ও রবুবিয়্যাতের সঠিক স্বীকৃতি। কারণ আল্লাহ তায়ালার জাত ও সিফাতের মা'রিফাত ব্যতীত ঈমানের কোনো মূল্য হয় না; আর মারিফাতের মূল স্তম্ভ হলো, আল্লাহর একত্বের স্বীকারোক্তি।

আর তাওহিদের স্বীকারোক্তি দু'টি বিষয়ের স্বীকরোক্তি ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না।

প্রথমতঃ একমাত্র আল্লাহকেই সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব দানকারী বলে আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে স্বীকার করা, অন্য কাউকে অস্তিত্ব দানকারী মনে না করা। এটাকে 'তাওহিদ ফিল খালক' تَوْحِيْد فِي الْخَلْقِ বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ একমাত্র আল্লাহকেই 'রব' সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালক রিযিকদাতা, সৃষ্টিজগতের সমূহ বিষয় নিয়ন্ত্রণকারী এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের যাবতীয় বিষয়াদি পরিচালনাকারী প্রভু বলে আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে স্বীকার করা এবং এতে কাউকে তাঁর শরিক মনে না করা এবং একমাত্র তাঁকেই আসমান, যমীন

তথা সমস্ত সৃষ্টির স্থায়িত্ব দানকারী ও সমস্ত মাখলুকের লাভ-ক্ষতির মালিক বলে আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে স্বীকার করা। এটাকে 'তাওহিদ ফির রবুবিয়্যাত' تَوْحِيْد فِى الرَّبُوْبِيَّة বলা হয়।

তৃতীয়তঃ একমাত্র আল্লাহকে বিধান, আইনদাতা বলে আন্তরিকতার সঙ্গে স্বীকার করা এবং একমাত্র তাঁকেই আদেশকর্তা, তিনি যাদের কথা মনে প্রাণে মানা ও আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

اَطِيْعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ.

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ এবং (তাঁর) রাসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্যে (কোরআন-সুন্নাহর অনুসারী) দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করো।"

তাদের আনুগত্যের কথা আন্তরিকতার সঙ্গে স্বীকার করা এটাকে 'তাওহিদ ফিল আমর' تَوْحِيْد فِى الْاَمْرْ বলা হয়। আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি ও সমস্ত আদেশ উত্তম ও সুন্দর হয়ে থাকে। আর এ সব তাওহিদ ও ত্বাকদীরের স্বীকারোক্তি ব্যতীত কারো ঈমান পূর্ণ হয় না।

كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالٰى وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا وَقَالَ تَعَالٰى وَكَانَ اَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا.

এই তাকদির সম্পর্কেই মুছান্নিফ (রহ.) ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় পেশ করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো তাকদিরের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা নতুবা মুমিন বলে গণ্য হবে না।

তাকদির অস্বীকারকারীরা কাফির

فَوَيْلٌ لِّمَنْ صَارَ لِلّٰهِ فِى الْقَدْرِ خَصِيْمًا وَاَحْضَرَ لِلنَّظْرِ فِيْهِ قَلْبًا سَقِيْمًا لَقَدْ الْتَمَسَ بِوَهْمِهٖ فِىْ فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيْمًا وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيْهِ اَفَّاكًا اَثِيْمًا.

অনুবাদ : অতএব, এমন লোকের ধ্বংস অবধারিত, যে তাকদির ভাগ্যের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত এবং রোগাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে এতে চিন্তা ভাবনায় প্রবৃত্ত হয়। নিশ্চয়ই সে নিজ ধারণার বশবর্তী হয়ে অদৃশ্য জগতের একটি গুপ্ত রহস্যের অনুসন্ধানে সচেষ্ট হলো এবং এ বিষয়ে (ভাগ্য সম্পর্কে) অসঙ্গত ও অবান্তর কথা বলে সে নিজেকে মিথ্যুক ও পাপিষ্টে পরিণত করলো।

فَوَيْلٌ لِّمَنْ صَارَلِلّٰهِ الخ : অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বীয় চিন্তা, ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে তাকদির (ভাগ্য) সম্পর্কে নানা প্রলাপ করে সে তার ধ্বংসের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলো। কারণ তাকদির হলো আল্লাহ এবং তাঁর মাখলুকের মধ্যে এমন এক গোপন রহস্য, যার খবর এক আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তাই কোনো মানুষ তার চিন্তা, ধারণা ও জ্ঞান দ্বারা এর রহস্য উদঘাটন করতে পারে না। সে যতই মহাজ্ঞানী হোক না কেনো। অতএব যে ব্যক্তি তাকদিরের তত্ত্ব বা রহস্য উদঘাটন করতে না পেরে তাকদিরকে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তাকদিরকে অস্বীকার করে না, কিন্তু সে এ সম্পর্কে স্বীয় ধারণা অনুসারে অহেতুক অবাস্তব কথা বলে, সে চরম মিথ্যুক ও মহাপাপী তার ধ্বংস অনিবার্য।

قَلْبًا سَقِيْمًا রোগাক্রান্ত অন্তর : অন্তরের রোগ দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার : তাকদির সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া। অর্থাৎ, দীনী বিষয়াদি বিশেষতঃ তাকদির সম্পর্কে নানা অহেতুক সন্দেহমূলক প্রশ্নাদি উপস্থাপন করে, পরিশেষে অন্তর মরে যাওয়া। আর হক ও বাতিল পরিচয় করার মতো যোগ্যতা হারিয়ে ফেলা। অবশেষে ঈমান হারা হয়ে মারা যাওয়া। এ রোগটি একেবারেই নিকৃষ্টতম। এ থেকে বেঁচে থাকা একান্ত কর্তব্য।

দ্বিতীয় প্রকার : কুপ্রবৃত্তি রোগে রোগাক্রান্ত হওয়া, অর্থাৎ, গোনাহর কাজের দিকে মন ধাবিত হওয়া। এ রোগ থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা হলো, দীনের উপদেশগুলো মনযোগ সহকারে শোনে গ্রহণ করা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর ভয়-ভীতি অন্তরে রাখা।

আল্লাহর আরশ ও কুরসি সম্পর্কে আকিদা

আরশ ও কুরসির হাকিকত

وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقٌّ كَمَا بَيَّنَ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهِ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَادُوْنَهُ مُحِيْطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ وَقَدْ عَجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقُهُ.

অনুবাদ : আরশ, কুরসি সত্য-বিদ্যমান, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কেতাবে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি আরশ ও অন্য সবকিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী (তাঁর আরশ এবং অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই) সবকিছু তাঁর (জ্ঞান ও কর্তৃত্বের)

পরিবেষ্টন রয়েছে এবং তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তাঁকে (পূর্ণভাবে) আয়ত্ত করা থেকে তাঁর সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি জগত অক্ষম।

وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ الخ : অর্থাৎ, আল্লাহর আরশ এবং কুরসি বিদ্যমান রয়েছে যেমন তায়ালা পবিত্র কোরআনে স্বীয় আরশ এবং কুরশী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ : অর্থাৎ, অতঃপর আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ : অর্থাৎ, তাঁর কুরসি আসমান, জমিন পরিবেষ্টিত করে রেখেছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে আরশ এবং কুরসির অর্থ বা এর হাকিকত কি? এবং এগুলো কেমন বা কিরূপ?

জবাব : 'আরশ' রাজ সিংহাসনকে বলা হয় এবং 'কুরসি' সিংহাসনকে বলা হয়। আর আল্লাহর আরশ এবং কুরসি কিরূপ? ফেরেশতারা একে কিভাবে বহন করছে? এসব প্রশ্নের সমাধান মানুষের আকল-বুদ্ধি দিতে পারবে না। তাই এ সম্পর্কে নির্মল পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ মাযহাব সাহাবি ও তাবেঈনদের কাছ থেকে এবং পরবর্তী কালের সুফী বুর্জুগদের কাছ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে, মানব জ্ঞান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম, এর অনুসন্ধানে ব্যস্ত হওয়া অর্থহীন; বরং ক্ষতিকরও বটে। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, এসব বাক্যের যে অর্থ আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য, তাই শুদ্ধ ও সত্য এর পর নিজে কোনো অর্থ উদ্ভাবন করার চিন্তা করা অনুচিত।

কারণ আল্লাহ তায়ালা উঠা, বসা, আর স্থান, কাল থেকে মুক্ত। এ ধরনের আয়াতকে মানুষের কার্য-কলাপের আচার-আচরণের সঙ্গে তুলনা করা উচিৎ নয়। এর অবস্থা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা মানব জ্ঞানের ঊর্ধ্বে তবে হাদিসের বর্ণনা দ্বারা এতোটুকু বোঝা যায়, আরশ ও কুরসি এত বড়, তা সমগ্র আকাশ ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। ইবনে কাসীর হযরত আবুজর গিফারী (রহ.)-এর উদ্ধিতিতে বর্ণনা করেছেন, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কুরসি কি এবং কেমন?

তিনি বলেছেন, যার এখতিয়ারে আমার প্রাণ তাঁর কসম, কুরসির সঙ্গে সাত আকাশ সাত আকাশ ও সাত যমীনের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মতো। অন্য এক বর্ণনাতে আছে, আরশের তুলনায় কুরসিও অনুরূপ। (মাআরিফুল কোরআন)

অর্থাৎ, কুরসি এতো বড়, সাত আকাশ এবং সাত যমীন কুরসির সামনে এত তুচ্ছ বা ছোট যেমন একটি বড় ময়দানের সামনে ফেলে দেয়া একটি আংটিকে আরশের সামনে এতো তুচ্ছ বা ছোট দেখা যায়।

وَهُوَ مُسْتَغْنٍ الخ : আল্লাহ তায়ালার আরশ বা কুরসির কোনো প্রয়োজন নেই। যেহেতু তিনি সবের খালিক ও রব, আর খালিক মাখলুকের মুখাপেক্ষী নন এবং রব মারবুবের (পালতু বস্তু) মুখাপেক্ষী নন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা বিরাট আরশের রব। অন্য আয়াতে বলেছেন : اَللّٰهُ الصَّمَدُ আল্লাহই একমাত্র অমুখাপেক্ষী সত্তা। আল্লাহই এই সত্তা যিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। اَللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ ওপরযুক্ত আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা কোনো মাখলুকের মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোনো মাখলুকের প্রয়োজন নেই। আর আরশ, কুরসি এসব মাখলুকের অন্তর্গত। অতএব তাঁর আরশের প্রয়োজন নেই।

مُحِيْطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ : অর্থাৎ, আরশের ওপরে বা নিচে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালা বেষ্টন করে রেখেছেন, তাঁর বেষ্টনির বাইরে কোনো কিছু নেই। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ সব কিছু বেষ্টন করে রেখেছেন :

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

"আল্লাহর কুরসি সমগ্র আসমান এবং জমিনকে বেষ্টন করে রেখেছেন।" আর আরশকে আল্লাহর সত্তা বেষ্টন করে রেখেছেন। অতএব আল্লাহ তায়ালা সব কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছেন। তাঁর বেষ্টনীর বাইরে কোনো কিছু নেই।

وَعَجِزَ عَنِ الْاِحَاطَةِ خَلْقُهُ : অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তাকে কোনো মাখলুক বেষ্টন করতে পারবে না। সমগ্র মাখলুক তাকে বেষ্টন করতে অক্ষম, এ ক্ষমতা কারো নেই। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا আল্লাহকে তারা জ্ঞান দ্বারা করতে পারে না।

আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, কোনো বস্তু জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না। ওই বস্তুকে ক্ষমতা এবং কার্যদ্বারা আয়ত্ত-বেষ্টন করা সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহর সত্তাকে কোনো মাখলুক কোনোক্রমে আয়াত্ত বা বেষ্টন করতে পারবে না। তা থেকে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) খলিলুল্লাহ এবং হযরত মূসা (আ.) কালিমুল্লাহ ছিলেন

وَنَقُوْلُ اِنَّ اللهَ اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً وَكَلَّمَ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا اِيْمَانًا وَتَصْدِيْقًا وَ تَسْلِيْمًا.

অনুবাদ : আমরা একথার ওপর ঈমান রেখে এবং বিশ্বাস করে ও আনুগত্য স্বীকার করে বলছি, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে বন্ধু বা খলিলরূপে নিযুক্ত করেছেন এবং হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ-সরাসরি বাক্যালাপ করেছেন।

اِتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً الخ : অর্থাৎ, আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এ কথার ওপর ঈমান রাখি ও বিশ্বাস করি এবং আন্তরিকভাবে স্বীকার করি, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে খলিল বানিয়েছেন।

যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে– وَاتَّخَذَ اللهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম (আ.)কে বন্ধু বা খলিল নিযুক্ত করেছেন।

وَكَلَّمَ مُوْسٰى الخ অর্থাৎ, আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এ কথার ওপর ঈমান রাখি ও বিশ্বাস করি এবং আনুগত্যের সঙ্গে স্বীকার করি, আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে সরাসরি সুস্পষ্টভাবে কালাম করেছেন। যেমন : পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا আর আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.)-এর সঙ্গে সুস্পষ্ট বাক্যালাপ করেছেন।

আল্লাহর ফেরেশতা, নবী এবং কেতাবসমূহ সম্পর্কে আকিদা

وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ.

অনুবাদ : আর আমরা সমস্ত ফেরেশতা এবং নবী (আ.)গণের ওপর ঈমান রাখি এবং আমরা রাসূল (আ.)গণের ওপর নাযিলকৃত কেতাবসমূহের প্রতি ঈমান রাখি এবং আমরা এ কথার সাক্ষী প্রদান করি, সমস্ত নবী রাসূল (আ.)গণ (আজীবন)-সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল ছিলেন।

وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ الخ অর্থাৎ, আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, কোনো মানুষ মুমিন হতে হলে প্রথমে আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে হবে, অতঃপর তার সমস্ত ফেরেশতা ও নবী-রাসূল (আ.)গণের ওপর নাযিলকৃত কেতাবসমূহের ওপর ঈমান আনতে হবে এবং এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে, যে সমস্ত নবী-রাসূল (আ.)গণ সত্যের ওপর আজীবন অটল ছিলেন এবং তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। এতে তাঁরা বিন্দু পরিমাণ ক্রুটি করেননি এবং পরকাল ও তাকদির এবং জান্নাত ও জাহান্নাম-এ সবের ওপর ঈমান আনতে হবে। এগুলোর মধ্যে কোনো একটি অস্বীকারকারী মুমিনদের মধ্যে গণ্য হবে না। কারণ নবী-রাসূল (আ.)গণ এগুলোর সংবাদ দিয়েছেন, পবিত্র কোরআন-হাদিসে এগুলোর ওপর ঈমান আনার নির্দেশ রয়েছে।

যেমন– আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا.

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে এবং তাঁর ফেরেশতাসমূহকে এবং তাঁর কেতাবসমূহকে এবং তাঁর নবী-রাসূলগণকে এবং পরকালের দিনকে অস্বীকার করবে, নিশ্চয় সে পথভ্রষ্ট দূরে গিয়ে পড়েছে।" ফালাসাফীগণ এ সব বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে। আর যারাই এ সবগুলোকে অথবা কোনো একটিকে অস্বীকার করবে, সে মুমিন থাকবে না; বরং কাফির হয়ে যাবে।

যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا اُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا (سورة نساء)

"যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (আ.)কে অস্বীকার করে, আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের বিশ্বাসের মধ্যে তারতম্য করতে চায়, আর তারা বলে, আমরা কতেককে বিশ্বাস করি, আর কতেককে অস্বীকার করি, আর তারা চায়, এরই মধ্যবর্তী কোনো পথ বানিয়ে নিতে, এরাই প্রকৃত (অস্বীকারকারী) কাফির।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় পরিষ্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে, আগে উল্লেখিত বিষয়সমূহের বিশ্বাসকারী মুমিন। আর এর মধ্যে কোনো একটি অস্বীকারকারী মুমিন নয় ও মুমিন হতে পারে না; বরং কাফির।

মুসলমানদের কেবলা বিশ্বাসীকে মুসলমান বলার সীমা কতটুকু

وَنُسَمِّيْ اَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ مَادَامُوْا بِمَاجَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِفِيْنَ وَلَهٗ بِكُلِّ مَا قَالَهٗ وَاَخْبَرَ مُصَدِّقِيْنَ.

অনুবাদ : আমরা আমাদের কেবলাপন্থী লোকদের মুসলমান ও মুমিন নামে আখ্যায়িত করবো যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নবী (আ.) কর্তৃক আনিত দীনের সমস্ত বিধি-বিধান স্বীকার করতে থাকবে এবং তারা নবী (আ.)-এর সমস্ত কথা ও সংবাদসমূহকে বিশ্বাস করতে থাকবে।

وَنُسَمِّيْ اَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِيْنَ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ সব মুসলমানকে মুসলমান মনে করেন, যারা আমাদের কেবলা বায়তুল্লাহ শরিফকে কেবলা মানবে। আমরা তাদের মুসলমান ও মুমিন নামে আখ্যায়িত করবো যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দীনের স্বীকারোক্তির ওপর অটল থাকবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত বাণী ও সংবাদসমূহকে বিশ্বাস করবে। এসব গুণের অধিকারীগণ তথা এই উম্মতকে মুসলমান নামে বহু আগ থেকে অভিহিত করা হয়েছে। مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ

যেমন– পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ

অন্য আয়াতে ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে,

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ.

"হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের তোমার আনুগত্যশীল বানাও এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে তোমার জন্য মুসলমান উম্মত বানাও।" হাদিস শরিফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম বলে উল্লেখ করেছেন,

وَمَنْ صَلّٰى صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهٗ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ.

"যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামাজ পড়ে, আমাদের ন্যায় কেবলাকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশুর গোশত খায়, সে অবশ্যই মুসলমান।" (মুসলিম)

"তাঁর জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।" (বুখারী)

অতএব, উল্লেখিত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে মুসলমান নামে অবহিত করা, পবিত্র কোরআন-হাদিসসম্মত, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশেষ গুণ।

আল্লাহ ও তাঁর দীন এবং কোরআন নিয়ে ঝগড়া করা যাবে না

وَلَا نَخُوْضُ فِى اللّٰهِ وَلَا نُمَارِىْ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَلَا نُجَادِلُ فِى الْقُرْاٰنِ.

অনুবাদ : আমরা আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অহেতুক চিন্তা গবেষণায় প্রবৃত্ত হই না। আর আমরা আল্লাহর দীনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করি না এবং আমরা কোরআনের ব্যাপারে কোনো ধরনের বিবাদ সৃষ্টি করি না।

وَلَا نَخُوْضُ فِىْ اللّٰهِ الخ অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ আল্লাহ তায়ালার সত্তা নিয়ে অহেতুক চিন্তা-ভাবনা করা অথবা তাতে কাল্পনিকভাবে নানা ধারণা করা অথবা আল্লাহ সম্পর্কে দার্শনিক

কোনো বিশ্লেষণ করা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদার পরিপন্থী মনে করেন। কারণ, মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহর সত্তাকে উপলব্ধি করা বা অনুধাবন করতে পারবে না। বরং বিভ্রান্তির শিকার হবে। কেনোনা, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা, গবেষণা, অনুভূতি সবই সীমিত আর তাদের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম সমূহও সীমিত। আর সীমিত মাধ্যম দ্বারা সীমিত জ্ঞানই অর্জন হয়। অতএব মানুষের জ্ঞান সীমিত।

আর আল্লাহর সত্তা অসীম এবং একথা সর্বজন স্বীকৃত সত্য, সসীম জ্ঞান, বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে অসীম বস্তুকে অনুধাবন করা বা এর মৌলতত্ত্বে উপনীত হওয়া অসম্ভব।

অতএব মানুষ তার সীমিত জ্ঞান, বুদ্ধি ও গবেষণা দ্বারা অসীম আল্লাহকে অনুধাবন করা বা এর মৌলতত্ত্বে উপনীত হওয়া অসম্ভব। তাই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন : وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

"তারা আল্লাহকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারবে না।"

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে থাকার জন্য আল্লাহ সম্পর্কে সব ধরনের অহেতুক চিন্তা, গবেষণা পরিহার করা একান্ত কর্তব্য।

وَلَا نُمَارِىْ فِىْ دِيْنِ اللهِ : অর্থাৎ, আল্লাহর দীনের মধ্যে কোরআন-সুন্নাহ তথা শরিয়তের নির্ধারিত বিধি-বিধানের পরিপন্থী মতামত প্রকাশ করে বা মতবাদ সৃষ্টি করে দ্বন্দ্ব উঠানো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের খেলাফ বা পরিপন্থী। অতএব যারা কোরআন-সুন্নাহ তথা শরিয়তের নির্ধারিত বিধি-বিধানের পরিপন্থী মতামত প্রকাশ করে আল্লাহর দীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব!! কলহ সৃষ্টি করে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ, যেমন– বর্তমান যুগে মওদুদি ও শিয়া এবং রেজভীরা নতুন মতবাদ প্রকাশ করে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে।

وَلَا نُجَادِلُ فِى الْقُرْاٰنِ : অর্থাৎ, পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা করে এবং কোরআনের শব্দাবলী উচ্চারণ ও কিরাত নিয়ে কোরআনে ঝগড়া-বিবাদ, সৃষ্টি না করা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য।

অতএব যারা কোরআনের অপব্যাখ্যা করে এবং কোরআনের শব্দাবলীর উচ্চারণ বা কিরাত নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করে। তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কীভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা কর্তব্য

نَشْهَدُ اَنَّهٗ كَلَامُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ نَزَلَ بِهٖ رُوْحُ الْاَمِيْنُ فَعَلَّمَهٗ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

অনুবাদ : আমরা একথা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় কোরআন নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের (কালাম) বাণী, জিব্রাঈল (আ.) এটাকে নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন।

অতঃপর তিনি নবী-রাসূল আলাইহিস সাল্লামগণের সায়্যিদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা শিক্ষা দিয়েছেন এবং রহমত অবতীর্ণ হউক সমস্ত সাহাবি (রা.)গণের ওপর।

وَنَشْهَدُ اَنَّهٗ كَلَامُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য কর্তব্য হলো, একবার সাক্ষ্য প্রদান করা, এই কোরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম, আল্লাহর নাজিলকৃত কেতাব, জিব্রাইল (আ.) এটাকে আল্লাহর কাছে থেকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ হয়েছেন।

যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

اِنَّهٗ تَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ.

"এই কোরআন সমস্ত জাহানের পালনকর্তার কাছে থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছেন। আপনার অন্তরে যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।"

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى এই কোরআন অত্যন্ত শক্তিশালী সত্তা (জিব্রাঈল আ.) শিক্ষা দিয়েছেন।

অতএব প্রকৃত মুসলমানদের জন্য কর্তব্য হলো, কোরআনকে আল্লাহর কালাম-বাণী বলে বিশ্বাস করা এর সাক্ষ্য দেয়া এবং বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ.) আল্লাহর কাছে থেকে এই কোরআন নিয়ে অবতরণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে সাক্ষ্য প্রদান করা। কিন্তু কাররামিয়্যা ও অন্যান্য ভ্রষ্ট ও ভ্রান্তদলগুলো তা অস্বীকার করে এবং তারা বলে, কোরআন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার পদ্ধতি ইলহাম হিসেবে অবতরণ করেছে। তাদের একথাটি কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী। তাই তারা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। মুসলমান থেকে খারিজ বলে গণ্য হয়েছে।

وَكَلَامُ اللهِ تَعَالٰى لَايُسَاوِيْهِ شَيْئٌ مِنْ كَلَامِ الْمَخْلُوْقِيْنَ وَلَا نَقُوْلُ بِخَلْقِهٖ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অনুবাদ : আর আল্লাহর কালাম (এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ,) সমস্ত মাখলুকের কোনো কালাম এর একটুও সমকক্ষ হতে পারে না এবং আমরা কোরআনকে মাখলুক বলে মন্তব্য করি না এবং মুসলমানদের জামাআতে বিরোধিতা করি না।

وَكَلَامُ اللهِ لَايُسَاوِيْهِ الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ বলেন, কোনো মাখলুকের কোনো কালাম আল্লাহর কালামের একটুও সমতুল্য বা সমকক্ষ হতে পারে না এবং কেয়ামত পর্যন্ত কোনো মাখলুক কোরআনের সমতুল্য কোনো কালাম বানাতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা কোরআনের অনেক আয়াতে এই চ্যালেঞ্জ করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا.

"তুমি বলে দাও, যদি মানব ও জিন একত্রিত হয় এই কোরআনের মতো কোনো কেতাব (বানিয়ে) আনার জন্য, তবুও তারা এই কোরআনের মতো কোনো কেতাব (বানিয়ে) আনতে পারবে না। যদিও তাঁরা একে অন্যের সাহায্যকারী হয়। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَائَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

"আর যদি তোমরা এর (এই কেতাবের) মধ্যে কোনো সন্দেহ পোষণ কর, যা আমি আমার বান্দার ওপর অবতীর্ণ করেছি। তাহলে একটি সূরা নিয়ে আস, কোরআনের (সূরার) মতো। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে ডাকো, যদি তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, কোরআনের সমতুল্য কোনো কালাম নেই এবং কেয়ামত পর্যন্ত কেউ এর সমতুল্য কোনো কালাম বানাতে পারবে না। সুতরাং পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানব ও জিন জাতির সম্মুখে চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকবে।

وَلَا نَقُوْلُ بِخَلْقِهٖ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, কোরআন আল্লাহর কালাম এটা আল্লাহর অন্যান্য মাখলুকের কালামের মতো মাখলুক নয়; বরং আল্লাহর সত্তা ও তাঁর অন্যান্য সিফাতসমূহ যেভাবে কাদীম, তেমনি তাঁর কালামও কাদীম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আগে করা হয়েছে।

وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের আকিদা হলো, কোরআন আল্লাহর কালাম এটি সৃষ্ট নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কোরআনকে মাখলুক বলবে, সে মুসলিম উম্মাহর বিরোধিতা করলো।

কতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুসলমানকে কাফির বলা যাবে না

وَلَا نُكَفِّرُ اَحَدًا مِّنْ اَهْلِ قِبْلَتِنَا بِذَنْبٍ مَالَمْ يَسْتَحِلَّهٗ وَلَا نَقُوْلُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْاِيْمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهٗ.

অনুবাদ : কোনো পাপের কারণে আমরা আমাদের কেবলাপন্থী (মুসলমান)কে কাফির বলব না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো গুনাহকে হালাল মনে করবে না। আমরা একথা বলি না, ঈমান থাকা অবস্থায় কোনো পাপির কোনো পাপ ক্ষতিসাধন করবে না।

وَلَا نُكَفِّرُ اَحَدًا : অর্থাৎ, কোনো মুসলমান কোনো গুনাহকে হালাল মনে না করে এবং তাঁর প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো গুনাহ করে ফেলে, তবে তাকে এই গুনাহর কারণে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমদের প্রতি নিহতের ব্যাপারে কেসাস্র গ্রহণ করার বিধি লেখা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলে, দাস দাসের বদলে দানে এবং নারীর বদলে নারী। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে।

ওপরযুক্ত আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর বিধান লংঘন করে বেআইনিভাবে হত্যা করার মতো কবিরা গুনায় লিপ্ত হয়েও মুমিনদের দল থেকে বের হয় না এবং সে নিহত ব্যক্তির বদলা প্রার্থী জিম্মাদারদের দীনী ভাই থাকে। অতএব প্রমাণিত হয়ে গেলো, হত্যার মতো কবিরা গুনাহর মধ্যে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন হিসেবে থাকে, এ কারণে তাঁর থেকে ঈমান বের হয় না এবং সে ঈমানদারদের দল থেকে খারিজ হয় না। বরং তাদের দীনী ভাই থাকে। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে তাকে মুমিন গণ্য করেন। কাফির আখ্যা দেন না।

পক্ষান্তরে খারিজিরা কবিরা গুনাহে লিপ্ত প্রত্যেক মুমিনকে কাফির আখ্যা দিয়ে থাকে এবং মুতাযেলারা একে ঈমান থেকে খারিজ বলে আকিদা রাখে। তাদের এ মতামতটি ওপরযুক্ত আয়াত এবং কোরআনের আরো অনেক আয়াতের পরিপন্থী। তাই এরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ। হ্যাঁ, যদি কোনো মুমিন কোনো গুনাহকে হালাল মনে করে এতে লিপ্ত হয়, অথবা স্বজ্ঞানে আল্লাহর রাসূল, কোরআন বা দীন ইসলাম সম্পর্কে এমন কথা বলে বা লেখে যা তাদের হেয় প্রতিপন্ন করে তাহলে তার ঈমান থাকবে না। সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যাবে। যেমন বর্তমান যুগের নাস্তিক-মুরতাদরা প্রলাপ বকে থাকে।

وَلَا نَقُوْلُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيْمَانِ ۔ الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনরা এ কথা বলেননি, মুমিনের ঈমান থাকা অবস্থায় কোনো গুনাহ করলে এই গুনাহ তার কোনো ক্ষতি সাধন করবে না; বরং এই বিশ্বাস রাখতে হবে, মুমিনের গুনাহ তাকে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিসাধন করে।

যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ.

অর্থাৎ, তোমাদের ওপর যে বিপদ আসে, তা তোমাদের হাতে অর্জিত গুনাহের কারণে আসে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

اَنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ.

"যে ব্যক্তি গুনাহগার অবস্থায় তার প্রতিপালকের কাছে আসবে, নিশ্চয় তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত রয়েছে।" ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় এবং আরো অনেক আয়াতে অসংখ্য হাদিস এ কথা প্রমাণ করে, যার মধ্যে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। গুনাহর কারণে জাহান্নামে

নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে মারাত্মক ক্ষতি আর কি হতে পারে! এভাবে শাফায়াত সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদিস সাক্ষ্য দিচ্ছে, গুনাহ মুমিনের ক্ষতি করে।

পক্ষান্তরে মুরজিয়ারা বলে, মুমিনের ঈমান থাকা অবস্থায় গুনাহ কোনো ক্ষতি করে না। যেমন কুফরের অবস্থায় নেকি কোনো উপকার সাধন করে না। কিন্তু তাদের এই মতামতটি কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। তাই তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ।

মুমিনের জন্য কর্তব্য আল্লাহর রহমতের আশাবাদী হওয়া এবং আজাব থেকে নিশ্চিন্ত না হওয়া

وَنَرْجُوْ لِلْمُحْسِنِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ.

অনুবাদ : মুমিনগণের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের সম্পর্কে আমরা আশা-পোষণ করি, আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দেবেন এবং আমরা তাদের ব্যাপারে নির্ভীক নই।

وَنَرْجُوْ لِلْمُحْسِنِيْنَ : অর্থাৎ, পুণ্যবান সৎকর্মশীল মুমিনদের সম্পর্কে প্রকৃত মুমিনগণ অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এই আশাপোষণ করেন, তাদের সৎকর্মগুলো আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করে গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ নিশ্চয় (সৎকর্মের) নেকি, (অসৎকর্মের) গুনাহকে দূর করে দেয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা গুনাহ ক্ষমা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেবো এবং আমি তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেবো।

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীল মুমিনদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। অতএব খাঁটি মুসলমানদের জন্য সত্যিকারের মুমিনের ব্যাপারে এই আকিদাও আশাপোষণ করা কর্তব্য, আল্লাহ তায়ালা তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। সুতরাং গুনাহগার মুমিনকে জাহান্নামি

বলে আকিদা রাখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পরিপন্থী। তাই এই আকিদা বিশ্বাসকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ। যেমন খাওয়ারিজরা।

وَلَانَامَنُ عَلَيْهِمْ : অর্থাৎ, গুনাহগার-মুমিন সম্পর্কে মুমিনগণ নির্ভীক হওয়া এবং নিশ্চিন্ত থাকা সমীচীন নয়, আল্লাহ তায়ালা এদেরকে তাদের পাপের কারণে শাস্তি দেবেন না। যেমন মুরজিয়াদের আকিদা রয়েছে। বরং খাঁটি মুমিনদের এই ভয় থাকা উচিত, আল্লাহ তায়ালা তার ন্যায় বিচার হিসেবে গুনাহগার-মুমিনকে শাস্তি দিতে পারেন এবং এই আশা পোষণ করা উচিত, আল্লাহতায়ালা স্বীয় অনুগ্রহ হিসেবে গুনাহগার-মুমিনকে মাফ করে দিতে পারেন। যেমন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ بِعَمَلِهِ قِيْلَ وَلَااَنْتَ قَالَ وَلَا اَنَا

"কেউই নিজ আমলে দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না আল্লাহর রহমত ও দয়া ব্যতীত। বলা হলো, আপনিও না। হুজুর বললেন, হ্যাঁ, আমিও না।"

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ.

"তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে, বস্তুতঃ আল্লাহর তায়ালাড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত ও নির্ভীক হতে পারে যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।" يَغْفِرُلِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ "তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংসের সম্মুখীন লোকেরাই গুনাহর শাস্তি থেকে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হতে পারে। যেমন মুরজিয়ারা গুনাহর শাস্তি থেকে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হয়েছে। অতএব খাঁটি মুসলমানদের জন্য কর্তব্য হলো, আল্লাহর রহমতের আশা রাখা, আজাব ও গজব থেকে নির্ভীক না হওয়া।

কারো সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জান্নাত বা জাহান্নামের সাক্ষ্য দেয়া যাবে না

وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيْئِهِمْ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا نُقَنِّطُهُمْ.

অনুবাদ : আর আমরা মুমিনদের জন্যে (নিশ্চিতভাবে) জান্নাতি বলে সাক্ষ্য প্রমাণ প্রদান করি না। আর মুমিনগণের মধ্যে যারা অসৎকর্মী গুনাহগার, আমরা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাদের ব্যাপারে আশংকাও পোষণ করি। আর তাদের ব্যাপারে আমরা নিরাশও হই না।

وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ কোনো ব্যক্তি সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে এই সাক্ষ্য দেন না, এই ব্যক্তি জান্নাতি বা এই ব্যক্তি জাহান্নামি। কারণ, এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত কারোও নেই। অনুমানের ভিত্তিতে কোনো কথা বলতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন। যেমন বলেছেন :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরিফে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, এরা জান্নাতি না জাহান্নামি ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি উত্তরে বললেন :

اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ (متفق عليه)

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, কোনো মানুষের কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জান্নাত অথবা জাহান্নামের সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়া ঠিক নয়। কারণ এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান কোনো মাখলুকের নেই। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, মুমিন ও মুত্তাকিদের বেলায় সামগ্রিকভাবে এই সাক্ষ্য প্রমাণ করা, তারা জান্নাতবাসী হবেন এবং কাফির ও মুনাফিকরা জাহান্নামবাসী হবে। এর প্রমাণে কোরআনুল কারিমের অসংখ্য আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগণিত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّاتٍ وَّنَعِيْمٍ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণ উদ্যানসমূহে ও নিয়ামতের মধ্যে থাকবেন। অন্য আয়াতে বলেছেন :

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা মুমিনপুরুষ এবং মুমিননারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের ওয়াদা করেছেন, যার নিম্নদেশে নদ-নদী প্রবাহিত হবে। এর মধ্যে তারা অনন্তকাল থাকবে। আরো ওয়াদা করেছেন সেই উত্তম বাসস্থান সমূহের জান্নাতে আদনে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এটা হচ্ছে অতি মহান সাফল্য। (সূরা তাওবা)

কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَايُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ.

অর্থাৎ, যারা কুফুরী করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না, তারা মরে যাবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের জাহান্নামের শাস্তি ও লাঘব করা যাবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক কাফিরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (সূরা ফাতির)

এবং মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন :

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا.

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে এবং তাদের জন্য তুমি কখনো কোনো সাহায্যকারী পাবে না। (সূরা নিসা)

উভয় স্তরের লোকদের ব্যাপারে আরো অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে। তবে কোরআন হাদিস অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায়, ১০টি কারণে আল্লাহ তায়ালা অনেক মুমিন বান্দা থেকে জাহান্নামের আগুন হটিয়ে রাখবেন। (১) তওবার কারণে। (২) ক্ষমা প্রার্থনার কারণে। (৩) পুণ্য অত্যধিক হওয়ার কারণে (৪) দুনিয়াতে বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়ে ধৈর্য ধারণ করার কারণে। (৫) কবরের ভয়ংকর দৃশ্য ও শাস্তির কারণে। (৬) ময়দানে হাশরের ভয়ংকর অবস্থার কারণে। (৭) এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য দোয়া করার কারণে। (৮) শাফাআতকারীগণের শাফাআতের কারণে। (৯) আরহামুর রাহিমীনের অপার

দয়ার কারণে। (১০) আল্লাহর কোনো সৃষ্টির প্রতি মুমিনের বিশেষ দয়া হওয়ার কারণে।

وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيْئِهِمْ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ অন্য মুমিনের জন্য দোয়া করা কর্তব্য মনে করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা সত্যিকারের মুমিনদের নিদর্শন বর্ণনা করে বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ جَائُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَاتَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوْفٌ الرَّحِيْمٌ.

এদের পরে যারা আসবে তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু, আমাদের এবং আমাদের ওই সব ভাইদের যারা ঈমানে আমাদের অগ্রণী ছিলেন তাদের ক্ষমা করেন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো ধরনের বিদ্বেষ বা কুটিলতা রেখো না। হে আমাদের প্রভু, তুমি তো দয়ালু পরম করুণাময়।"

ওপরযুক্ত আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, জীবিত প্রত্যেক মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো, প্রত্যেক মৃত মুমিনের জন্য দোয়া করা, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের প্রতি অন্তরে কোনো ধরনের কুটিলতা বা বিদ্বেষ না রাখা।

وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ, গুনাহগার মুমিনদের ব্যাপারে ভীত ও সংকিত থাকেন, এদের সম্পর্কে নিশ্চিত ও নির্ভীক হন না। কেনোনা, হতে পারে এদের ক্ষমা হয়নি অথবা এদের তওবা কবুল হয়নি। যেহেতু এগুলো গোপনীয় বিষয়, এ সম্পর্ক কেউ সঠিকভাবে অবগত নয় ও হতে পারবে না। তাই সত্যিকারের মুমিনদের ব্যাপারে ভীত ও সংকিত থাকা এবং তাদের জন্য দোয়া করা।

وَلَا نَقْنَطُهُمْ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ কোনো গুনাহগার মুমিনের ক্ষমার ব্যাপারে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না এবং অন্যকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করেন না। বরং তারা সর্বদাই আল্লাহর রহমতের আশাবাদী থাকেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا.

"তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।"

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

لَاتَيْأَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللهِ اِنَّهٗ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়োনা। কেনোনা, কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

সেহেতু ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রেক্ষিতে খাঁটি মুমিনদের জন্য কর্তব্য, সর্বাবস্থায় আল্লাহর রহমতের আশা রাখা, কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া। সুতরাং যেসব গুনাহগার মুমিনদের চিরস্থায়ী জাহান্নামি বলে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করবে অথবা নিজেরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।

আল্লাহর আজাব থেকে নিশ্চিত নির্ভীক হওয়া এবং রহমত থেকে নিরাশ হওয়া ইসলামের বহির্ভূত

وَالْاَمْنُ وَالْاِ يَاسُ سَبِيْلَانِ عَنْ غَيْرِ مِلَّةِ الْاِسْلَامِ وَسَبِيْلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِاَهْلِ الْقِبْلَةِ.

অনুবাদ : নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হওয়া এবং নিরাশ ও হতাশা হওয়া উভয়টিই মিল্লাতে ইসলামের বহির্ভূত পথ। আর কেবলা পন্থীদের (মুসলমানদের) জন্য এতদুভয়ের মাঝামাঝিতেই রয়েছে সত্যের পথ।

الْاَمْنُ وَالْاِيَاسُ الخ : অর্থাৎ, আল্লাহর আজাব ও গজব থেকে একেবারে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হওয়া এবং আল্লাহর রহমত ও দয়া থেকে একে বারে নিরাশ হওয়া ইসলামী বিধি-বিধানের বহির্ভূত পন্থা, এতদুয়ের কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যেহেতু এগুলো কাফিরদের কাজ। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

اِنَّهٗ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ.

"নিশ্চয় কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে না।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ

"আল্লাহর আজাব ও গজব থেকে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হবে একমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংস প্রাপ্ত লোকেরাই।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের একটুও আশা রাখে না; বরং সে আল্লাহর রহমত থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে যায়, তাহলে সে ব্যক্তি কাফির। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর আজাব ও গজব এমন নির্ভীক হয়, তার অন্তরে একটুও ভয় থাকে না, সে ক্ষতিগ্রস্থ, ধ্বংস ও কাফিরের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ আল্লাহর আজাব ও গজব থেকে নির্ভীক হন না এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশও হন না।

وَسَبِيْلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِاَ هْلِ الْقِبْلَةِ : অর্থাৎ, সত্যিকার অর্থে আহলে কেবলা মুমিনদের জন্য সত্য ও মুক্তির পথ হলো, আল্লাহর আজাব ও গজবের ভয় এবং তাঁর রহমত দয়ার আশার মধবর্তী। সুতরাং খাঁটি মুমিনদের জন্য কর্তব্য হলো আল্লাহর রহমতের পূর্ণ আশাবাদী হওয়া এবং তাঁর গজব ও শাস্তির পূর্ণ ভয়, ভীতি অন্তরে রাখা। মোটকথা মুমিন বান্দা আল্লাহর রহমত থেকে একেবারে নিরাশ হতে পারে না এবং তাঁর গজব ও শাস্তি থেকে একেবারে নিশ্চিন্ত ও নির্ভীক হতে পারে না। বরং তার অন্তরে আল্লাহর রহমতের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয় নিয়ে এবাদত বন্দেগী করেন, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে তাদের অনেক প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিছু সংখ্যক মুমিন বান্দার প্রশংসা স্বরূপ বলেছেন :

تَتَجَافٰى جُنُوْ بُهُمْ عَنِ الْمَضَا جِعِ يَدْ عُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمعًا.

'তারা স্বীয় পার্শ্বকে শয্যাস্থান থেকে পৃথক রেখে তাদের প্রতিপালকের (শাস্তির) ভয় এবং (রহমতের) আশা নিয়ে তাদের প্রতিপালককে ডাকতে থাকেন।' (সূরা আলিফ লাম মিম সিজদা)

ওপরযুক্ত আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, সত্যিকারের মুমিনদের অন্তরে আল্লাহর রহমতের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয় থাকবে। পক্ষান্তরে যারা মুমিন নয়, তাদের অন্তরে আল্লাহর রহমতের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয় থাকবে না। অতএব সত্যিকারের মুমিন হতে হলে সর্বদা স্বীয় অন্তরে আল্লাহর রহমতের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয় রাখতে হবে।

দীনের কোনো বিধান অস্বীকার করা ব্যতীত কেউ ঈমান থেকে বের হবে না

وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْاِيْمَانِ اِلَّا بِجُحُوْدِ مَا اَدْخَلَهُ فِيْهِ

অনুবাদ : বান্দা ঈমান থেকে বের হবে না। কিন্তু এ সব বিষয়ের কোনো একটি অস্বীকার করলে, যেগুলোর স্বীকারোক্তি বান্দাকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْاِ يْمَانِ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কোনো মুমিনকে কোনো গুনাহের কাজ যেমন– যিনা, মদ্যপান, সুদ গ্রহণ ইত্যাদির কারণে কাফির তথা ঈমান থেকে বহিভূত মনে করেন না। হ্যাঁ, যদি সে এ ধরনের কোনো গুনাহকে হালাল বা জায়িয মনে করে লিপ্ত হয়, তাহলে সে কাফির তথা ঈমান থেকে বেরুয় যাবে। অথবা যদি এমন কোনো বিষয়কে সে অস্বীকার করে যার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তাকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো, তাহলে সে ঈমান থেকে বেরুয় যাবে। যে সব বিষয়াদির স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বান্দা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা অস্বীকার না করলেও সে আরো অনেক কারণে ইসলাম থেকে বেরুয় যেতে পারে। যেমন ঈমানের কোনো বিষয় বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দোষারোপ করা অথবা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসূল, তাঁর কেতাব বা তাঁর প্রবর্তিত কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা করা। এতদ্ব্যতীত প্রতিমা পূজা, মূর্তিপূজা, মৃতদেহকে ডাকা, তাদের আশ্রয় প্রার্থনা, তাদের সাহায্য সহায়তা তলব করা ইত্যাদি ক্রিয়া কাণ্ডের কারণেও বান্দা ইসলাম থেকে বেরুয় যেতে পারে। কেনোনা, এ ধরনের কাজ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর পরিপন্থী।

পক্ষান্তরে খাওয়ারিজ ও মু'তাযেলাদের মতে, কবিরা গুনাহর কারণে বান্দা ঈমান থেকে বেরুয় যাবে। আর এমতাবস্থায় মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে। কিন্তু উভয় দলের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু, খাওয়ারিজরা কবিরা গুনাহগারকে কাফির বলে, আর মু'তাযেলারা একে ফাসেক, কুফর এবং ঈমানের মধ্যবর্তী স্থলে মনে করে। তাদের একথাগুলো পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী তাই এ কথাগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

ঈমান সম্পর্কে আলোচনা

ঈমানের সংজ্ঞা

وَالْإِيْمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِا للِّسَانِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ وَاَنَّ جَمِيْعَ مَاأَنْزَلَ اللهُ تَعَالىٰ فِي الْقُرْاٰنِ وَجَمِيْعَ ما صَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ.

অনুবাদ : ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাস সত্যায়ন করা যা কিছু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে শরিয়তের যে বিধান বর্ণিত হয়ে আসছে তা সবই সত্য।

وَالْإِيْمَان : অর্থাৎ, যেসব বিষয়কে দীন ইসলামের ঈমানিয়াতের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, এই সব বিষয়কে মুখে স্বীকার করা এবং অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়।

ইমাম আবু হানিফা ও শায়খ আবু মনছুর মাতুরিদী (রহ.)-এর মতে ঈমান বাছীত-অবিমিশ্র। অর্থাৎ, ঈমানের মৌলতত্ত্ব-ধাতু শুধু আন্তরিক বিশ্বাস। আর ইসলামের বিধি-বিধান চালু করার জন্য মৌখিক স্বীকারোক্তি শর্ত।

আর মুহাক্কিকগণের একদল ঈমানকে মুরাক্কাব মিশ্রিত জানেন। তারা আবার দু'দলে বিভক্ত। একদল বলেন, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তি উভয়ের সমষ্টির নামই ঈমান।

অপর দল বলেন, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা দীনের কর্মসমূহ সম্পাদন করা, এই তিন বস্তুর সমষ্টির নাম ঈমান।

ইমাম মালিকী, শাফিয়ী, আহমদ (রহ.) আমলকে ঈমানের পরিপূরক অংশ (জুযয়ে মুকাম্মিলা) মনে করেন।

মুতাযেলা এবং খাওয়ারিজরা আমলকে ঈমানের শক্তিশালী অংশ 'জুযয়ে মুকাওয়িমাহ' মনে করেন।

ওপরযুক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, আমলে ত্রুটিকারী গুনাহগার মুমিন কাফির হবে না এবং তাকে কাফির বলা যাবে না। কিন্তু মুতাযেলা ও খাওয়ারিজদের মতে, আমলে ত্রুটিকারী, কবিরা গুনাহগার মুমিন ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায়

মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে। তাদের এ মতামতটি পবিত্র কোরআন সুন্নাহর পরিপন্থী।

وَاَنَّ جَمِيْعَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِى الْقُرْاٰنِ : অর্থাৎ, প্রত্যেক মুমিনের জন্য একথা বিশ্বাস করা একান্ত কর্তব্য, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন সবই সত্য, এতে সন্দেহ মাত্র নেই। কেনোনা, কোরআন আল্লাহ পক্ষ থেকে অকাট্য ওহী, আর ওহী এমন অকাট্য সত্য যার সঙ্গে কোনো ধরনের বাতিল (মিথ্যা) মিশ্রিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যেমন আল্লাহর তায়ালা বলেছেন :

لَايَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ.

অর্থাৎ, তার (কোরআনের) সামন অথবা পেছন দিক দিয়ে বাতিল এসে মিশতে পারবে না। (কারণ) এটি প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত সত্তার। (আল্লাহর) পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

অন্য আয়াতে ইরশাত হয়েছে :

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

"এটি এমন এক কেতাব যাতে কোনো ধরনের সন্দের অবকাশ নেই। মুত্তাকীগণের জন্য পথ প্রদর্শক।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, কোরআনের মধ্যে কোনো ধরনের সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। বস্তং নিঃসন্দেহে এই কেতাব মুত্তাকি আল্লাহ ভীরু লোকদের পথ প্রদর্শন করে। এই আকিদা প্রত্যেক মুমিনের মধ্য থাকতে হবে। নতুবা ঈমান থাকবে না। সুতরাং কোরআন অস্বীকারকারী কোনো ক্রমেই মুমিন থাকতে পারে না।

وَجَمِيْعَ مَاصَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ : অর্থাৎ, প্রত্যেক মুমিনের জন্য একথাও বিশ্বাস করা কর্তব্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শরিয়তের যে বিধি-বিধান বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে, সবই সত্য, এতে কোনো সন্দেহে নেই। যেহেতু এগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি হিসেবে এসেছে। কোরআন ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্য শুধু ওহীয়ে মাতলু (পঠিত) ও গায়রে মাতলু (আনপঠিত) অনুসারে। কোরআন ওহীয়ে মাতলু আর হাদিস ওহীয়ে গায়রে মাতলু, তবে উভয়টাকে ওহী হিসেবে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য।

কিন্তু মু'তাজিলা, রাওয়াফিজ, জাহমিয়্যা, মুয়াত্তিলা এবং এ যুগের কিছুসংখ্যক ভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবী লোক পবিত্র কোরআন ও হাদিসকে অকাট্য দলীল বা

প্রমাণ মানে না। এদের বিভ্রান্তিকর উক্তিসমূহের ভ্রান্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যেই ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) ওপরযুক্ত কথাগুলো আকিদা হিসেবে পেশ করেছেন।

যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসসমূহ পবিত্র কোরআনের এমন তাফসির বা ব্যাখ্যা এবং শরিয়তের বিধি-বিধানের এমন দলীল বা প্রমাণ, যা মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা, ধারণা ও কল্পনার ঊর্ধ্বে। সেহেতু বুদ্ধি, চিন্তা, ধারণা ও কল্পনা দ্বারা এর বিরোধিতা করা কোনো ক্রমেই জায়িয হবে না। বরং যেই একাজে হাত বাড়াবে, সেই পথভ্রষ্ট (গুমরাহ্) প্রমাণিত হবে। তাই আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

مَاآتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা কিছুর আদেশ দেন তা তোমরা আকড়ে ধর, আর তিনি তোমাদের যা কিছু থেকে নিষেধ করেন, তোমরা তা থেকে বিরত থাক।

ওপরযুক্ত আয়াত সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ-নিষেধ তথা সমগ্র কোরআন-হাদিসকে বিশ্বাস করা মুমিনের ঈমানী কর্তব্য, তাছাড়া কেউ মুমিন হতে পারবে না। আর পরিপূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ ও নিষেধকে যথাযথভাবে পালন করা কর্তব্য। যেমন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

তোমাদের মধ্যে কেউ (প্রকৃত) মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার চাহিদা আমার আনিত দীন ও শরিয়তের অনুগত না হবে।

ওপরযুক্ত হাদিস থেকে পরিষ্কার বোঝা গেলো, প্রকৃত মুমিনের কামনা ও বাসনা এবং চাহিদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দীন ও শরিয়তের অনুগত হওয়া এবং অস্বীকার না করা। কারণ যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরিয়ত ও হাদিসকে অস্বীকার করবে সে মুমিন থাকবে না।

ঈমানের মৌলিক বিষয়ে কি মুমিনগণ এক এবং তাদের গুণাবলী অনুসারে পার্থক্য?

وَالْاِيْمَانُ وَاحِدٌ وَاَهْلُهٗ فِيْ اَصْلِهٖ سَوَاءٌ وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِيْقَةِ بِالْخَشْيَةِ وَالتَّقْوٰى وَمُخَالَفَةُ الْهَوٰى وَمُلَازَمَةُ الْاَوْلٰى.

অনুবাদ : ঈমান একই আর ঈমানদারগণ ঈমানের মৌলিক বিষয়ে সবাই সমান। তবে আল্লাহর ভয়, তাক্বওয়া, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং সর্বদা উত্তম কর্ম সম্পাদনের অনুপাতে তাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে স্তর ও মর্যাদাগত পার্থক্য হয়ে থাকে।

اَلْإِيْمَانُ وَاحِدٌ الخ : অর্থাৎ, ঈমান এক বস্তু তার মৌলিক বিষয়ে (যে বিষয়ের ওপর আনা কর্তব্য এসব বিষয়ের ওপর ঈমান আনার ব্যাপারে) সব মুমিনগণ সমান। তবে তাদের মধ্যে স্তর ও মর্যাদাগত দিক দিয়ে প্রভেদ বা পার্থক্য দেখা দেয়, আল্লাহর ভয়, তাকওয়া কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং সর্বদা উত্তম কর্ম সম্পাদনের কারণে এবং এ সবের মধ্যে ত্রুটি করার কারণে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ.

"অতঃপর আমি ওইসব লোকদের কেতাবের অধিকারী করেছি যাদের আমি আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে মনোনিত করেছি। তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ।

(সূরা ফাতির : ৩২)

হাফীজ ইবনে কাসীর ওপরযুক্ত আয়াতে তিন প্রকারের লোকের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন,

(১) যালিম : সে ব্যক্তি যে কোনো ফরজ ও ওয়াজিব কাজে ত্রুটি করে এবং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজেও জড়িত হয়ে পড়ে।

(২) মধ্যপন্থী : সে ব্যক্তি যে সমস্ত ফরজ ও ওয়াজিব কাজ সম্পাদন করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য থেকে বেঁচে থাকে, কিন্তু মাঝে মধ্যে কোনো মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোনো মাকরূহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে।

(৩) সৎকর্মে অগ্রগামী : সে ব্যক্তি যে যাবতীয় ফরজ, ওয়াজিব এবং মুস্ত াহাব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো মুবাহ বিষয় এবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয়। (ইবনে কাছির)

ওপরযুক্ত আয়াত ও তাফসির থেকে সম্পূর্ণভাবে বোঝা যাচ্ছে, মুমিনের তিনটি স্তর রয়েছে। কিন্তু এগুলো মুমিনের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত প্রকার। নতুবা

যেমন অস্তিত্ব এক বস্তু। কিন্তু অস্তিত্বপ্রাপ্ত অনেক বস্তু। আর নূর এক বস্তু। কিন্তু অলৌকিক হয় অনেক বস্তু। তেমনিভাবে ঈমান এক বস্তু! কিন্তু মুমিন অসংখ্য, এদের মধ্যে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া সর্বদা উত্তম কাজ সম্পাদনের কারণে এবং কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে অনেক প্রভেদ বা পার্থক্য হয়ে থাকে। তাই সকল ঈমানদারের ঈমান সমান নয়। তাদের ঈমানে অনেক প্রভেদ আছে। নবী-রাসূল (আ.)গণের ঈমান যেমন অন্যদের মতো নয়, তেমনি খোলাফায়ে রাশেদিন ও সাহাবিগণের ঈমান অন্যদের ঈমানের মতো নয়। এইভাবে সত্যিকারের মুমিনগণের ঈমান, ফাসেকদের ঈমানের মতো নয়। আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা।

মুমিনগণ আল্লাহর ওলি

وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ اَوْلِيَاءُ الرَّحْمٰنِ وَاَكْرَمُهُمْ اَطْوَعُهُمْ بِا لتُّقٰى وَالْمَعْرِفَةِ وَاَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْاٰنِ.

অনুবাদ : আর ঈমানদারগণ সবাই পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার ওলি। তাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত, যিনি তাক্ওয়া ও মা'রিফাতের মাধ্যমে তাঁর অধিকতর অনুগত ও কোরআন শরিফের সর্বাধিক অনুসারী।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ الخ : অর্থাৎ, সমস্ত মুমিনগণ আল্লাহর ওলি, এই গুণের মধ্যে সব মুমিন সমান। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ.

"আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ওলি, তিনি তাদের অন্ধকার (কুফর) থেকে আলোর (ঈমানের) দিকে বের করেছেন।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ "আর ঈমানদারগণ আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মুমিনগণ আল্লাহর ওলি এবং আল্লাহ মুমিনগণের ওলি। ইমাম ত্বাহাবীর ওপরোল্লিখিত এবারতের দ্বারা উদ্দেশ্য

একথা বোঝানো, মুমিনগণ সবাই মূল বেলায়তের মধ্যে সমান, কিন্তু বেলায়তের স্তরসমূহের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ ও পার্থক্য রয়েছে। যেভাবে মুমিনগণ ঈমানের মূল বিষয়ে সবাই সমান, কিন্তু ঈমানের স্তরসমূহের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে প্রভেদ ও পার্থক্য হয়ে থাকে।

অতএব আল্লাহর ওলিদের মধ্যে কেউ পরিপূর্ণ ওলি, আবার কেউ অসম্পূর্ণ ওলি। তবে আল্লাহর ওলিগণের মধ্যে উভয় জাহানে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত ওই ব্যক্তি যিনি তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয়-ভীতি ও মারিফাতের ব্যাপারে অধিক আনুগত্যশীল এবং কোরআনের অনুসারী। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ "আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সমচেয়ে বেশি সম্মানিত ওই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ (سورة يونس)

"জেনে রেখো, নিশ্চয় যারা আল্লাহর ওলি (বন্ধু) তাদের না কোনো ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে। তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, আল্লাহর ওলিগণের মধ্যে উভয় জগতে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত হলেন ওই ব্যক্তি, যিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করেন এবং কোরআন-সুন্নাহর সর্বাধিক অনুসারী হন।

কোন্ কোন্ বিষয়াদির ওপর ঈমান রাখা অত্যাবশ্যকীয়

وَالْإِيْمَانُ هُوَ الْإِيْمَانُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حُلْوِهٖ وَمُرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَنَحْنُ مُؤْمِنُوْنَ بِذٰلِكَ كُلِّهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ، وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلٰى مَاجَاءُوْا بِهِ-

অনুবাদ : ঈমান হলো আল্লাহর ওপর এবং তাঁর ফেরেশতাকুল এবং তাঁর কেতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণ এবং আখেরাতের দিনের এবং মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়া এবং কল্যাণ-অকল্যাণ ও মিষ্টতা-তিক্ততাসহ সবই আল্লাহর পক্ষ

থেকে নির্ধারিত ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। আমরা ওপরযুক্ত সব বিষয়ের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করি। আমরা আল্লাহর রাসূল (আ.)দের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করি না। আর তাঁরা আল্লাহর কাছ থেকে যে শরিয়ত নিয়ে এসেছেন সেই ব্যাপারে আমরা তাঁদের সবাইকে বিশ্বাস (সত্য স্বীকার) করি।

وَالْإِيْمَانُ هُوَالْإِيْمَانُ بِاللهِ الخ : অর্থাৎ, সাতটি বিষয়ের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য। এগুলোর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ব্যতীত কোনো মানুষ মুমিন হতে পারে না। যেহেতু এই সাতটি বিষয় আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে ঈমানিয়াতের মধ্যে গণ্য করেছেন, সেহেতু এগুলোর প্রতি ঈমান আনা একান্ত কর্তব্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

أٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ أٰمَنَ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ، لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَ انَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সমস্ত বিষয়ের প্রতি যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনগণও। সবাই বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কেতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর নবী রাসূল (আ.) গণের প্রতি। (তারা বলেন) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। আর তারা বলেন, আমরা শোনেছি এবং আনুগত করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক আমরা তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।"

ওপরযুক্ত আয়াতে চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ রয়েছে। (১) আল্লাহ (২) আল্লাহর ফেরেশতাসমূহ (৩) আল্লাহর কেতাবসমূহ (৪) আল্লাহর নবী-রাসূল (আ.)গণের প্রতি। অন্য আয়াতে মুমিনদের বিশেষ গুণ পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ : "আর তারা আখেরাতের দিনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন।" অন্য আয়াতে মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়ার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَاَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ : "আর নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর পর আবার এদেরকে জীবিত করবেন যারা কবরসমূহে আছে"। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাকদির সম্পর্কে বলেছেন :

قُلْ لَنْ يُّصِيْبَنَا اِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا : "তুমি বলে দাও, আমাদের ওপর এসব (সুখ বা দুঃখ) আসবে, যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য লেখে রেখেছেন। এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলেছেন :

وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ.

"আর যদি তাদের ওপর কল্যাণ পৌঁছে, তখন তারা বলে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আর যদি তাদের ওপর অকল্যাণ কিছু আসে, তখন তারা বলে এগুলো তোমার পক্ষ থেকে এসেছে। আপনি বলে দিন, (ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ) সব কিছু আল্লাহর ওপর থেকে আসে।"

তাকদিরের ভালো-মন্দ, মিষ্টতা-তিক্ততা এবং সুখ-শান্তি সবই বান্দার দিক দিয়ে অর্থাৎ, বান্দার সামনে যেসব বিষয় ভালো-মন্দ, সুখ-শান্তি হিসেবে প্রকাশ হচ্ছে সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে। এগুলো আল্লাহ তায়ালা আদিকাল থেকে ফয়সালা করে বান্দার তাকদিরে রেখেছেন।

ওপরযুক্ত সাতটি বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য, এগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের ত্রুটি থাকলে ঈমান ঠিক হবে না।

وَلاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ : অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে যত নবী-রাসূল এসেছিলেন, সকলের প্রতি আমরা সমানভাবে ঈমান রাখি। তাঁদের মধ্যে আমরা কোনো তারতম্য বা পার্থক্য করি না এবং তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীন ও শরিয়ত এবং কেতাব নিয়ে এসেছিলেন, এ সব কিছুকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। এতে কোনো ধরনের সন্দেহ পোষণ করি না। এটাই নবী-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস।

কবিরাহ গুনাহ্গার মুমিন জাহান্নামে চিরকাল থাকবে না

وَاَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّارِ لَا يُخَلَّدُوْنَ اِذَا مَاتُوْا مُوَحِّدُوْنَ وَاِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا تَائِبِيْنَ بَعْدَ اَنْ لَقُوا اللهَ عَزَّوَجَلَّ عَارِفِيْنَ وَهُمْ فِىْ مَشِيَّتِهِ وَحُكْمِهِ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ كَمَا ذَكَرَ عَزَّوَجَلَّ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ، وَاِنْ عَذَّبَهُمْ فِى النَّارِ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِمْ بِعَدْ لِهِ.

অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে যারা কবিরাহ গুনাহ করবে তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে না, যখন তারা একত্ববাদী অবস্থায় মত্যুবরণ করবে। যদিও তারা তওবা না করে সজ্ঞানে ঈমানদার হয়ে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও নির্দেশের ওপর নির্ভর করবে। তিনি চাইলে নিজ অনুগ্রহে তাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। তাইতো তিনি পবিত্র কোরআনে বলেছেন : وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ "এবং তিনি শিরক ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (সূরা নিসা) আর তিনি চাইলে আপন ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে তাদের জাহান্নামে শাস্তি দিতে পারেন তাদের অপরাধ পরিমাণে।

وَاَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ

অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কবিরাহ গুনাহ্গার বান্দা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। যখন সে তাওহিদের ওপর মারা যায়। প্রশ্ন হতে পারে, প্রত্যেক উম্মতের তাওহিদপন্থী বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। প্রশ্ন হতে পারে, এখানে উম্মতে মুহাম্মদীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো কেন?

উত্তর : এখানে উম্মতে মুহাম্মদীর কথা উল্লেখ করে অন্যান্য নবী (আ.) গণের উম্মতকে বাদ দেয়া উদ্দেশ্য নয়। এতে সব উম্মতই শামিল আছেন, তবে উম্মতে মুহাম্মদী সর্বশেষ উম্মত হওয়ার কারণে তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো। তাহলে আর কোনো প্রশ্ন হতে পারে না।

এখানে দু'টি কথা বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন। প্রথমতঃ কবিরাহ গুনাহ্র (তারীফ) সংজ্ঞা, দ্বিতীয়তঃ কবিরাহ গুনাহ কি কি?

প্রথমতঃ ১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হাসান বসরী (রহ.) বলেন, কবিরা ওইসব গুনাহকে বলা হয়, যেসব গুনাহর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আগুন, গযব ও অভিশাপ দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করেছেন।

২. কেউ বলেছেন, যে সব গুনাহ নেক আমল, যেমন– নামাজ, রোজা, হজ এবং জাকাত-এর বরকতে মাফ হয় না সেসব গুনাহ কবিরাহ, আর যেসব গুনাহ নেক আমলের দ্বারা মাফ হয়ে যায় এসব গুনাহ ছগিরাহ।

৩. কাজি বায়যাবী বলেন, কবিরাহ ওই সব গুনাহকে বলা হয়, যেগুলোর ব্যাপারে শরিয়তে কোনো নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রয়েছে। যেমন– হদ্দ (দণ্ড), কেছাছ (হত্যার প্রতিশোধ), দিয়ত (রক্তমূল্য) ইত্যাদি।

৪. ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বলেন, কবিরাহ এসব গুনাহকে বলা হয়, যেসব গুনাহ বান্দা নির্ভীকভাবে নির্দ্বিধায় করে থাকে।

৫. কেউ বলেছেন, কবিরাহ ওইসব গুনাহকে বলা হয়, যার ব্যাপারে ফাহ্শা (কুকর্ম) শব্দ ব্যবহার করা হয়।

৬. ইবনে সালেহ বলেন, কবিরা ওইসব গুনাহকে বলে, যার ব্যাপারে কবিরাহ অথবা আজীম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৭. কেউ বলেছেন, কবিরাহ ওইসব গুনাহকে বলে, যার মাধ্যমে বান্দা দীনের ইজ্জত হরণ করে ফেলে।

দ্বিতীয়তঃ কবিরাহ গুনাহর পরিমাণ বা সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর মতে কবিরাহ গুনাহ নয়টি।

(১) আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করা। (২) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। (৩) নির্দোষ মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া। (৪) ব্যভিচার করা। (৫) জেহাদ থেকে পলায়ন করা। (৬) যাদু করা। (৭) এতিমের মাল আত্মসাৎ করা। (৮) পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা। (৯) হারাম শরিফে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা।

হযরত আবু হুরায়রা এতে আরো তিনটি গুনাহ বৃদ্ধি করেছেন। (১) সুদ খাওয়া। (২) চুরি করা। (৩) মদপান করা। কবিরাহ গুনাহ আরো অনেক রয়েছে, আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে এখানে সবগুলোর বর্ণনা সম্ভবপর হলো না।

فِى النَّارِ لَا يَخْلُدُوْنَ اِذَا مَاتُوْهُمْ مُوَحِّدُوْنَ : অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী কবিরাহ গুনাহগার মুমিন চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। যদিও সে তওবা ছাড়া মারা যায়। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা শিরক ক্ষমা করবেন না, শিরক ব্যতীত যাকে ইচ্ছা সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।" (সূরা নিসা-৪৮) এটি হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতামত বা আকিদা।

পক্ষান্তরে খাওয়ারিজ এবং মু'তাযেলারা বলে কবিরাহ্ গুনাহগার চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, কোনোদিন ক্ষমা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না। তাদের এ কথাটি একেবারে ভ্রান্ত এবং পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী।

عَارِفِيْنَ : অর্থাৎ, গুনাহগার মুমিন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এখানে 'আরিফীন' শব্দ দ্বারা মুমিন উদ্দেশ্য। কারণ ঈমান ছাড়া শুধু মারেফাত নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়। কেনোনা, ইবলিস 'আরিফ বিল্লাহ' ছিলো, মুমিন বিল্লাহ ছিলো না। তাই সে নাজাত পাবে না। অতএব এখানে আরিফ শব্দ দ্বারা মুমিনই উদ্দেশ্য।

وَهُمْ فِيْ مَشِيَّتِهٖ وَحُكْمِهٖ الخ : অর্থাৎ, গুনাহগার মুমিনগণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও নির্দেশের ওপর নির্ভরশীল। তিনি চাইলে ক্ষমা করে দেবেন, তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন। তার ওপর কোনো কিছু ওয়াজিব নয়। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা-বিশ্বাস। পক্ষান্তরে খাওয়ারিজ ও মুতাযেলারা বলেন, নেক বান্দাদের জান্নাত দান করা আল্লাহ তায়ালার ওপর ওয়াজিব। অথচ আল্লাহর ওপর কোনো কিছু ওয়াজিব নয়। ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) ওপরযুক্ত এবারত দ্বারা খাওয়ারিজ ও মুতাযেলাদের এ কথা খণ্ডন করেছেন।

ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتِهٖ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِيْنَ مِنْ اَهْلِ طَاعَتِهٖ ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ اِلٰى جَنَّتِهٖ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ جَلَّ جَلَالُهٗ مَوْلٰى لِاَهْلِ مَعْرِفَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِى الدَّارَيْنِ كَاَهْلِ نَكِرَتِهِ الَّذِيْنَ خَابُوْا مِنْ هِدَايَتِهٖ وَلَمْ يَنَالُوْا مِنْ وَلَايَتِهٖ اَللّٰهُمَّ يَاوَلِيَّ الْاِسْلَامِ وَاَهْلِهٖ، مَسِّكْنَا بِالْاِسْلَامِ حَتّٰى نَلْقَاكَ بِهٖ.

অনুবাদ : অতঃপর আল্লাহতায়ালা নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর আনুগত্যশীল বান্দাদের শাফাআতের ফলে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে পরে জান্নাতে পাঠাবেন। এর কারণ হলো আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঈমানদার বান্দাগণের অভিভাবকত্ব নিজেও গ্রহণ করেছেন। তাদের ইহকাল ও পরকালে এই সব কাফিরদের সমতুল্য করেননি, যারা তাঁর হেদায়ত থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে এবং তাঁর বন্ধুত্ব ও অভিভাবকত্ব লাভ করতে পারেনি।

হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলমানদের অভিভাবক! তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত আমাদের এই ইসলামের ওপর অটল রেখো।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰى لِاَهْلِ مَعْرِفَتِهٖ الخ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে এবং তাঁর আনুগত্যশীল বান্দাদের শাফা'আতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে পাঠানোর কারণ হলো, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের মাওলা, অভিভাবক, বন্ধু এবং সাহায্যকারী। তিনি কাফিরদের এর কিছুই নন। যেমন পবিত্র কোরআনে তিনি বলেছেন :

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ.

"এটা এ কারণে, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের মাওলা– সাহায্যকারী, আর নিশ্চয় কাফিরদের কোনো মাওলা ও সাহায্যকারী নেই।" ওহুদের যুদ্ধে এ সময় আবু সুফিয়ান বলেছিলো– لَنَا الْعُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ আমাদের উজ্জা আছে, তোমাদের কোনো উজ্জা নেই। হযরত উমর (রা.) প্রতি উত্তরে বলেছিলেন, اَللّٰهُ مَوْلٰنَا وَلَامَوْلٰى لَكُمْ আল্লাহ আমাদের মাওলা ও সাহায্যকারী, তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ সর্বদা এই দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে সর্বদা দীন ইসলামের ওপর অটল। অনড় রাখেন, এমতাবস্থায় আমরা যেনো তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারি। কারণ কোনো মানুষ নিজ চেষ্টা বা ক্ষমতায় হেদায়াতের ওপর অটল থাকতে পারে না আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত, তাই সবসময় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত।

সব মুমিনের পেছনে নামাজ পড়া বৈধ

وَنَرَى الصَّلٰوةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَّفَاجِرٍ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلٰى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ.

অনুবাদ : আমরা কেবলাপন্থী প্রত্যেক নেক ও দুষ্কর্মী মুসলমানদের পেছনে নামাজ কায়েম করা এবং তাদের মৃত ব্যক্তির ওপর জানাজার নামাজ পড়া বৈধ মনে করি।

وَنَرَى الصَّلٰوةَ خَلْفَ كُلِّ الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানদের এ-ও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, কেবলাপন্থী প্রত্যেক

নেক ও দুষ্কর্মী মুসলমানের পেছনে নামাজ পড়া, যদি সে ইমামতীর যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, চাই সে নেক-পুণ্যবান অথবা পাপী হউক। যদিও ফেকাহর কেতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, ফাসেকের পেছনে নামাজ পড়া মাকরূহ, এটি ভিন্ন মাসআলা। এখানে শুধু আকিদার দৃষ্টিতে আলোচনা হচ্ছে, ফাসেক ফাজেরের পেছনে নামাজ পড়া বৈধ মনে করা যাবে কি-না? তখন ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) এখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা পেশ করেছেন। যেহেতু দারা কুতনীতে বর্ণিত রয়েছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

صَلُّوْا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَّ فَاجِرٍ : "তোমরা প্রত্যেক পুণ্যবান ও ফাজের ইমামের পেছনে নামাজ পড়তে পারো।" তাই সাহাবায়ে কেরাম (রা.)গণ ফাসেক, ফাজের ইমামের পেছনে নামাজ পড়েছেন। যেমন বোখারী শরিফে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ফাসেক, ফাজের ও জালেম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পেছনে নামাজ পড়েছেন এবং আনাস বিন মালিক (রা.)ও তার পেছনে নামাজ পড়েছেন সেহেতু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানগণ পুণ্যবান ও ফাজের ইমামের পেছনে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা বৈধ মনে করেন।

وَعَلٰى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ : অর্থাৎ, এভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানগণ মৃত প্রত্যেক পুণ্যবান ও ফাজের মুসলমানদের জানাযার নামাজ পড়াকে বৈধ মনে করেন। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوْدُهٗ اِذَا مَرِضَ وَلِيَشْهَدْهُ اِذَا مَاتَ الخ

(رواه النسائى وفى رواية الترمذى يتبع جنازته مشكوة)

"এক মুমিনের ওপর অন্য মুমিনের ছয়টি হক্ব রয়েছে। (১) এক মুমিন যখন অসুস্থ হলে তখন অন্য মুমিন তার সেবা শুশ্রূষা করা। (২) কোনো মুমিন মারা গেলে তার জানাযায় উপস্থিত হওয়া। গং (নাসায়ী)

ওপরযুক্ত হাদিসে পুন্যবান মুমিন বা ফাজের মুমিনের কোনো প্রভেদ নেই। এসব ব্যতিরেকে সাধারণভাবে মুসলমানের জানাযায় উপস্থিত হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং পুণ্যবান অথবা ফাজের প্রত্যেক মুসলমানের জানাযায় উপস্থিত হওয়া যাবে। কিন্তু ফুকাহায়ে কেরাম (রহ.) কিছু সংখ্যক জঘন্যতম পাপী ফাজেরদের জানাযার নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন, এটি সতর্কতা ও ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, এটি ভিন্ন মাসআলা। এটি আকিদার বিষয় নয়। সুতরাং ফুকাহাদের কথা নিয়ে এখানে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

অকাট্যভাবে কাউকে জান্নাতি ও জাহান্নামি বলা যাবে না

وَلَا نُنَزِّلُ اَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَّلَا نَارًا وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ مَالَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَئٌ مِنْ ذٰلِكَ وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللهِ تَعَالٰى.

অনুবাদ : আর আমরা কিবলাপন্থী কোনো মুসলমানকে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলে আখ্যায়িত করি না এবং তাদের কারো ওপর কুফরি, শিরকি বা নেফাকের সাক্ষ্য প্রদান করি না, যতক্ষণ না এ ধরনের কোনো কিছু তাদের থেকে প্রকাশ হবে। আর আমরা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আল্লাহ তায়ালার ওপর ছেড়ে দেবো।

وَلَا نُنَزِّلُ اَحَدًا مِنْهُمْ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমান কোনো মুসলমান সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলে কোনো সিদ্ধান্ত দেয় না। কারণ মানুষের বাহ্যিক আমলের ভিত্তিতে কাউকে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলে সিদ্ধান্ত দেয়া ঠিক নয়। কেনোনা, মানুষের সারা জীবনের আমলের ফলাফল, তার শেষ আমলের ওপর নির্ভর করে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ : আর আমলের ফলাফল শেষ পরিণতির ওপর নির্ভর করে। আর মানুষের শেষ পরিণতির খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।

সুতরাং কোনো মুসলমান সম্পর্কে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলে দৃঢ় সিদ্ধান্ত দেয়া কারো জন্য ঠিক হবে না। তবে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি (রা.)দের ব্যাপার এ থেকে ভিন্ন। কারণ আল্লাহ তায়ালা সাহাবা (রা.) সম্পর্কে বলেছেন, وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى "আল্লাহ তায়ালা তাদের সবার সম্পর্কে জান্নাতের অঙ্গিকার করেছেন।"

وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানগণ কোনো মুসলমানকে কাফির অথবা মুশ্‌রিক বা মুনাফিক আখ্যা দেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান থেকে কুফর বা শিরক অথবা নেফাকের কোনো কথা বা কাজ প্রকাশ না হবে। যেহেতু এ সাক্ষ্য বা আখ্যা দেয়াটা পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে : وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

"যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়ো না।" এবং হাদিস শরিফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اِنَّمَا رَجُلٌ قَالَ لِاَ خِيْهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا– متفق عليه.

"যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাইকে কাফির বলবে, অতঃপর উভয়ের মধ্যে কোনো একজন এই কুফরীর কথা নিয়ে ফেরবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অতএব এসব মুসলমানদের চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে, যারা অন্য মুসলমানকে কাফির আখ্যা দিয়ে থাকেন। অথবা এমন কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত করে গালমন্দ করেন, সব দলকে কাফির বলে ফতওয়া দেয়া হয়েছে। যেমন কাদিয়ানী, বাহায়ী, শিয়া ইত্যাদি। কেনোনা, তারা যদিও প্রত্যক্ষভাবে মুসলমানকে কাফির বলেননি। কিন্তু মুসলমানকে এই কাফির দলের নাম ধরে গালমন্দ করার কারণে পরোক্ষভাবে তারা মুসলমানকে কাফির আখ্যা দিয়েছেন। অথচ তাদের থেকে কুফরী কোনো কথা বা কাজ প্রকাশ হয়নি। অথবা এসব দলের মতাদর্শ ভাব থেকে প্রকাশ পায়নি। তাই সত্যিকারের মুসলমানগণের কর্তব্য হলো, সন্দেহমূলকভাবে কোনো মুসলমানকে এ ধরনের গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকা। কারণ এতে নিজের ঈমানই আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللهِ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ মুসলমানদের আন্তরিক বা অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত দেন না। বরং এ সব বিষয়াদির আল্লাহর ওপরে ন্যস্ত করেন। কারণ শরিয়তের বিধি-বিধান মানুষের বাহ্যিক অবস্থা ও কথার ওপর চালু হয়ে থাকে, আন্তরিক বা অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির ওপর নয়। যেহেতু মানুষের আভ্যন্তরীণ ও আন্তরিক বিষয়াদি সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে কোনো সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য না করে। এগুলো আল্লাহর প্রতি ন্যস্ত করা।

কোনো মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়

وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ.

অনুবাদ : আর উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো লোকের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করা আমরা বৈধ মনে করি না। কিন্তু শরিয়তের বিধান অনুসারে যাদের বিরুদ্ধে তরবারী করা ওয়াজিব হয়ে গেছে।

وَلَانَرَى السَّيْفَ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানগণ কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে অস্ত্র ধারণা করা বা কোনো মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ মনে করেন না। কারণ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَا ئُهٗ جَهَنَّمُ، خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَ ابًا عَظِيْمًا.

“যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে স্ব-ইচ্ছায় (না-হক্ব) হত্যা করবে, তার প্রতিদান জাহান্নাম, তাতে সে চিরকাল থাকবে, আর আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন, আর তাকে অভিশপ্ত করবেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।” আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন

اِنَّ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِ كُمْ هٰذَا.

“নিশ্চয় তোমাদের একের জন্যে অন্যের জান, মাল এভাবে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করা হলো, যেমন হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে আজকের দিনকে। এই মাসে, এই শহরে।” (বুখারী, মুসলিম)

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, এক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে হত্যা করা হারাম-অবৈধ। অতএব সত্যিকারের মুসলমানের জন্য এই আকিদা রাখা একান্ত কর্তব্য, শরিয়তের বিধি-বিধান ব্যতীত কোনো মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়।

(তিন কারণে মুসলমানকে হত্যা করা জায়িয)

اِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানগণ ওই মুসলমানকে হত্যা করা বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ

করা বৈধ ও জায়িয মনে করেন, যাকে শরিয়তে মুহাম্মদী তথা দীন ইসলাম হত্যা করা বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের নির্দেশ দিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, কোন্ কারণে মুসলমানকে হত্যা করা বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা বৈধ বা জায়িয?

উত্তর : তিনটি কারণের মধ্যে যে কোনো একটিতে মুসলমান লিপ্ত হবে, তাহলে ওই মুসলমানকে হত্যা করা বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা জায়িয। যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لَايَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلٰثٍ اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، اَلثَّيِّبُ الزَّانِىْ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (متفق عليه) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَايَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلٰثٍ زِنًا بَعْدَ اِحْصَانٍ، اَوْكُفْرٍ بَعْدَ اِسْلَامٍ اَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهٖ، رواه الترمذى والنسائ وابن ماجه.

অর্থাৎ, ঐই মুসলমানকে হত্যা করা হালাল-বৈধ নয় যে এই কথা সাক্ষ্য প্রদান করে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, আর এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে, আমি আল্লাহর রাসূল। কিন্তু তিনটি কাজের মধ্যে কোনো একটিতে লিপ্ত হলে তাকে হত্যা করা বৈধ ও হালাল হবে। (১) বিয়ের পর ব্যভিচারে লিপ্ত হলে। (২) না-হকভাবে কোনো মুসলমানকে হত্যা করলে। দীন ইসলাম থেকে বের হয়ে মুসলমানদের দল ত্যাগ করলে (অর্থাৎ, মুরতাদ হয়ে গেলে)। অন্য বর্ণনায় আছে : কোনো মুসলমানের খুন হালাল তথা বৈধ হবে না, কিন্তু তিন কাজের মধ্যে কোনো এক কাজে লিপ্ত হলে : (১) বিশুদ্ধ বিবাহের পরও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, (২) ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরি করলে– মুরতাদ হলে, (৩) না-হক্বভাবে কাউকে হত্যা করলে। তাকে হত্যা করা হালাল– বৈধ হবে। (নাসায়ী ও তিরমিযী)

উল্লেখিত কারণ ব্যতীত, কোনো কারণে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হালাল বা বৈধ হবে না। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের তথা সত্যিকারের মুসলমানগণের আকিদা বিশ্বাস।

আমিরের প্রতি বিদ্রোহ করা বৈধ নয়

وَلَا نَرَى الْخُرُوْجَ عَلٰى اَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ اُمُوْرِنَا وَاِنْ جَارُوْا، وَلَانَدْعُوْا عَلَيْهِمْ، وَلَا نَنْــزَعُ يَدًامِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرٰى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَرِيْضَةً مَالَمْ يَاْمُرُوْا بِمَعْصِيَتِهِ نَــدْ عُوْالَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاتِ.

অনুবাদ : আর আমরা আমাদের ইমাম-ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ মনে করি না, যদিও তারা অত্যাচার করেন এবং আমরা তাদের ওপর অভিশাপ দেবো না এবং তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটাব না। আর আমরা তাদের প্রতি আনুগত্যকে আল্লাহরই আনুগত্যের অংশ হিসেবে ফরজ মনে করি, যতক্ষণ না তারা কোনো পাপ কর্মের নির্দেশ দেবে। আর আমরা তাদের উৎকর্ষ ও সুস্থতার জন্য দোয়া করি।

وَلَانَرَى الْخُرُوْجَ عَلٰى اَئِمَّتِنَا الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনাকারী, নেতৃবৃন্দ শাসক ও দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ মনে করেন না। যদিও শাসকগণ অত্যাচার করেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর তোমাদের মধ্যে (কোরআন-সুন্নাহর অনুসারী) শাসক ও নেতৃবৃন্দ ও দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করো।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ اِلَّا اَنْ يُّؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاِنْ اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. (بخارى ومسلم)

মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব হলো শরিয়তসম্মত আমিরের কথা শোনা এবং আনুগত্য করা, তার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়ে যতক্ষণ না সে কোনো ধরনের পাপ কার্যের নির্দেশ দেবে। অতঃপর যদি কোনো পাপের নির্দেশ দেয়, তখন ওই আমিরের কথা শোনা ও আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদিসে বলেছেন لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ। আল্লাহর নাফরমানীর মধ্যে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য হতে পারে না।

কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করতে গিয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো কাজ করা যাবে না।

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিসদ্বয় দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও দায়িত্বশীলগণ যতক্ষণ না কোনো ধরনের পাপের নির্দেশ দেবে, ততক্ষণ তাদের আনুগত্য করা, তাদের কথা শোনা এবং গ্রহণ করা ও মেনে চলা ওয়াজিব। যদিও তারা অত্যাচার করেন। কারণ তাদের বিরুদ্ধাচরণ ও বিদ্রোহ করলে তাদের জুলুম নির্যাতনের চেয়ে ফেতনা ও অশৃঙ্খলা অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে, অতঃপর দেশ ও সমাজে অশান্তি বিরাজ করবে। সুতরাং শাসকদের জুলুম নির্যাতনের ওপর ধৈর্য ধারণ করাটা তাদের বিরুদ্ধাচরণ ও বিদ্রোহ করার চেয়ে উত্তম। কেনোনা, এতে বান্দাদের গুনাহ মাফ হবে। যেহেতু মানুষের গুনাহ ও অসৎ কার্যকলাপের কারণেই তাদের ওপর জালিম-অত্যাচারী শাসক চাপিয়ে দেয়া হয়। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

"এমনিভাবে আমি পাপীদের একে অপরের শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেবো তাদের কৃতকর্মের কারণে।"

অতএব জালিম শাসকদের ওপর অভিশাপ না দিয়ে স্বীয় আমলকে ইসলাহ্ ও সংশোধন করা প্রয়োজন। অতঃপর আমিরের সংশোধনী ও শান্তি স্বস্তি প্রদানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা। যেমন একটি হাদিসে কুদসিতে আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مَالِكُ الْمُلُوْكِ، مَلِكُ قُلُوْبِ- قُلُوْبُ الْمُلُوْكِ فِيْ يَدِيْ وَاَنَّ الْعِبَادَ اِذَا اَطَاعُوْنِيْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَ مُلُوْكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّاْفَةِ وَاَنَّ الْعِبَادَ اِذَا عَصَوْنِيْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَهُمْ بِالسَّخَطِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوْهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ، فَلَا تَشْغَلُوْا اَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوْكِ وَلٰكِنِ اشْغَلُوْا اَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَيْ اَكْفِيَكُمْ

(مشكوة)

আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। আমি বাদশাহদের মালিক, অন্তরসমূহের মালিক। বাদশাহদের অন্তরসমূহ আমার হাতে। বান্দারা যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি তাদের বাদশাহদের অন্তর সমূহ তাদের প্রতি নম্রতা ও শান্তির জন্য ফিরিয়ে দেই। আর যখন বান্দারা আমার নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, তখন আমি তাদের বাদশাহদের দিলকে তাদের প্রতি

অসন্তুষ্টি ও ক্ষুব্ধতার সঙ্গে পাল্টিয়ে দেই। অতঃপর বাদশাহরা তাদের নিকৃষ্ট ও ভয়ানক শাস্তি দিতে থাকে। সুতরাং তোমরা তাদের অভিশাপ দিতে নিজেকে মত্ত করো না এবং তোমরা নিজেকে আল্লাহর জিকির ও তাঁর কাছে আহাজারী করার মধ্য মত্ত কর। তাহলে আমি তোমাদের (সমস্যার) সমাধান দেবো। (মিশকাত)

অতএব ওপরযুক্ত হাদিস প্রমাণ দিচ্ছে, সত্যিকারের মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো ধর্মীয় শাসক নেতৃবৃন্দের বিদ্রোহ না করে, তাদের ওপর অভিশাপ না দিয়ে, নিজেদের ও শাসকদের সংশোধনীর চেষ্টা করা এবং দোয়া করা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য

وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، نَجْتَنِبُ الشُّذُوْذَ وَالْخِلَافَ وَالْفِرْقَةَ

অনুবাদ : আমরা সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিম জামাআতের অনুসরণ করি, আর বিচ্ছিন্নতা, বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে দূরে থাকি।

وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানগণ সব ব্যাপারে সুন্নাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসওয়ায়ে হাসানা অনুসরণ করেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ আনুগত্যশীল জামাআতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.), দীনের ফকীহ তাবেয়িন ও তাবে তাবেয়িন-এর অনুসরণ করেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ তথা উত্তম চরিত্র এবং সাহাবা (রা.) ও তাবেয়িন ও তাবে তাবেয়িন (রহ.)-এর অনুসরণের মধ্যে দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তি নিহিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدَ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَائَتْ مَصِيْرًا–

“যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তার কাছে হেদায়াত (সরল পথ) প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মু'মিনগণের অনুসৃত পথ ছেড়ে অন্য পথের অনুসরণ করবে। আমি তাকে ওইদিকেই ফিরিয়ে দেবো যে দিকে সে ফিরেছে এবং আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরিফে বলেছেন,

لَيَأْتِيَنَّ عَلٰى أُمَّتِيْ كَمَا أَتٰى عَلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتٰى أُمَّهٗ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ يَصْنَعُ ذٰلِكَ وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوْا مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ.

বনি ইস্রাইলের যা কিছু (অপকর্মের দলাদলি) হয়েছিলো। নিশ্চয় আমার উম্মতে এইসব কিছু (সমানভাবে) আসবে। যেভাবে এক জুতা অন্য জুতার সমান হয়। এমনকি যদি তাদের মধ্যে এমন লোক থাকে, যে তার মায়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে অপকর্ম করেছিলো। তাহলে নিশ্চয় আমার উম্মতেও এমন (দুষ্ট) লোক জন্ম নেবে, যে এবং ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হবে। আর নিশ্চয় বনি ইস্রাইল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিলো, আর অতিসত্বর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এক দল ব্যতীত সবাই জাহান্নামে যাবে। সাহাবি (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেটি কোন্ দল? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে দলটি আমি এবং আমার সাহাবি (রা.)গণের রীতি-নীতির (সুন্নতের) ওপর অধিষ্ঠিত থাকবে। (তিরমিযী)

ওপরযুক্ত হাদিসে مَا أَنَا عَلَيْهِ দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত উসওয়ায়ে হাসানার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং أَصْحَابِيْ দ্বারা জামাআতে সাহাবা (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ এই উভয় শব্দের প্রতি লক্ষ্য করেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রা.)-এর রীতি ও নীতির ওপর অধিষ্টিত দলের উপাধি বা নাম "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে" সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অতএব যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রা.)-এর রীতি ও নীতি ত্যাগ করেছেন অথবা এর প্রতি কোনো তোয়াক্কা করেননি। তারা সবাই পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। কারণ ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তির একমাত্র পথ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রা.)-এর অনুসরণ করা। তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন :

مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، أُولٰئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا أَفْضَلَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَأَعْمَقَهَا

عِلْمًا وَاَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اِخْتَارَ هُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَاِقَامَةِ دِيْنِهٖ فاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، وَاتَّبِعُوْهُمْ عَلٰى اٰثَارِهِمْ، وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ وَدِيْنِهِمْ، فَاِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ. (رواه مشكواة)

যে ব্যক্তি কারো তরীকা অনুসরণ করতে চায়, সে যেনো এসব লোকের তরিকা অনুসরণ করে, যারা মারা গেছেন। কেনোনা, জীবিত ব্যক্তি ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়। এই মৃত ব্যক্তিগণ হলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি (রা.)গণ, তাঁরা হলেন এ উম্মতের শ্রেষ্ঠতম মানব। তারা অত্যন্ত পবিত্র অন্তরবিশিষ্ট ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এবং অধিক্রম বাহ্যিকতা গ্রহণ কারী ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের স্বীয় সাহচর্য এবং আপন দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্যে মনোনিত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের মর্যাদা উপলব্ধি কর, তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে চলো, আর যথাসাধ্য তাঁদের চরিত্র আঁকড়িয়ে ধরো। কেনোনা, তাঁরা সরল-সঠিক পথে ছিলেন। (মিশকাত)

অতএব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রা.)-এর অনুসরণ করে চলেন এবং একে সত্য ও হক্ব পন্থীদের নিদর্শন হিসেবে গণ্য করেন।

وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوْذَ الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রা.)-এর অনুসারী জামাআত (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত) থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া এবং তাদের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি না করা। কারণ আল্লাহ তায়ালা সত্যিকারের মুসলমানদেরকে নিষেধ করে বলেছেন :

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

“তোমরা এদের মতো হয়ো না, যাদের সামনে প্রকৃত প্রমাণাদি আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, পরস্পর মতো-বিরোধ করেছে। এ সব লোকদের জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি।”

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا.

“তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে এক সঙ্গে ধারণ কর। আর তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না” (সূরা আলে-ইমরান)

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাআতের অনুসারী মুসলমানদের জামাআতের মধ্যে বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা সত্যিকারের মুসলমানদের জন্য জায়িয নয়; বরং তাদের জন্য কর্তব্য হলো সম্মিলিতভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রা.) রীতি ও নীতির ওপর শক্তভাবে (জমে) অটল থাকা।

ন্যায় পরায়ণ আমিরের প্রতি ভালোবাসা, আর জালিমের প্রতি বিদ্বেষ রাখা কর্তব্য

وَنُحِبُّ اَهْلَ الْعَدْلِ وَالْاَمَانَةِ، وَنَبْغَضُ اَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ وَنَقُوْلُ اللهُ اَعْلَمُ فِيْمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ.

অনুবাদ : আর আমরা ন্যায় পরায়ণ, বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসি এবং জালিম ও খেয়ানত লোকদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। আর যে বিষয়ের জ্ঞান আমাদের কাছে অস্পষ্ট সে সম্বন্ধে আমরা বলি আল্লাহতায়ালাই সর্বাধিক জানেন।

وَنُحِبُّ اَهْلَ الْعَدْلِ وَالْاَمَانَةِ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানগণ সর্ব বিষয়ে ন্যায় পরায়ণ ও সুবিচারক এবং সমতা রক্ষাকারী ব্যক্তিকে এবং আল্লাহর হক্ব ও বান্দার হক সমূহে আমানত রক্ষাকারী, বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা এই উভয় গুণের অধিকারী ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসেন এবং জান্নাতে সম্মান প্রদর্শন করবেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَاِنْ حَكَمْتَ فَا حْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"আর যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সুবিচারকদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা মায়েদা) অন্য আয়াতে বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَا عُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدَا تِهِمْ قَائِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُوْنَ، اُولٰئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ.

"আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল নিষ্ঠাবান এবং যারা তাদর নামাজে যত্নবান, তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে 'আহলে কিছত' ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতে আমানত রক্ষাকারীদের জান্নাতে সম্মানিত করার কথা উল্লেখ করেছেন। আর একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করবেন তাদের ভালোবাসার কারণেই সম্মান প্রদর্শন করবেন। সুতরাং একথা প্রমাণিত হয়ে গেলো, আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারক এবং বিশ্বস্ত উভয়ে ব্যক্তিদের ভালোবাসেন। অতএব আল্লাহ তায়ালা যাদের ভালোবাসেন তাদের ভালোবাসা সত্যিকারের মুসলমানদের ঈমানী কর্তব্য। যেহেতু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তাদের ভালোবাসেন।

وَنَبْغَضُ اَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারে মুমিনগণ অত্যাচারী এবং অসাধু– বিশ্বাস ভঙ্গকারী লোকদের ভালোবাসেন না এবং এদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা এদের ভালোবাসেন না। যেমন তিনি পবিত্র কোরআনে বলেছেন, وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ "আর আল্লাহ তায়ালা অত্যাচারীদের ভালোবাসেন না।" অন্য আয়াতে বলেছেন, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ধেয়ানকারীদের ভালোবাসেন না।" ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা জালিম এবং খিয়ানতকারীদের ভালোবাসেন না। সেহেতু প্রকৃত মুমিনের পরিচয় হবে জালিম এবং খেয়ানতকারীদের ভালো না বাসা এবং এদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَابْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ (ابوداود)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ভালো বাসবে, আর আল্লাহর জন্যে বিদ্বেষ পোষণ করবে এবং আল্লাহর রাজির খুশির জন্য দেবে আর আল্লাহর জন্যে বিরত থাকবে। তখন সে ঈমান পূর্ণ করে নিলো।" (আবূ দাউদ)

ওপরযুক্ত হাদিস পরিষ্কার প্রমাণ দিচ্ছে, সত্যিকারের মুমিনের বিশেষগুণ হলো আল্লাহর প্রিয়পাত্রকে প্রিয় মনে করা, আল্লাহর বিদ্বেষের পাত্রের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যখন জালিম এবং খায়িনদের ভালোবাসেন না, পছন্দ করেন না। তখন সত্যিকারের মুমিনগণ এদের ভালোবাসতে পারেন না; বরং এদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাই তাদের কর্তব্য।

وَنَقُوْلُ اَللّٰهُ اَعْلَمُ الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনদের কাছে যেসব বিষয়ের জ্ঞান সন্দেহযুক্ত অথবা অস্পষ্ট হয়ে থাকে সে সব সময়ে তারা বলে, আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক জানেন। এ সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তুমি সে বিষয়ের কিছু নিবে না।" আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এক হাদিসে বলেছেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهٖ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ تَقُوْلَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اَللّٰهُ اَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهٖ قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ.

"হে মানব জাতি! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো বিষয় সম্পর্কে জান, তা (অন্যের কাছে) বর্ণনা কর, আর যে বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই, সে সম্পর্কে সে বলুক, আল্লাহই সর্বাধিক জানেন। কেনোনা, জ্ঞানের পরিচয় হলো যে বিষয় সম্পর্কে জান না সে সম্পর্কে বল, আল্লাহই সর্বাধিক জানেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, তুমি বলো, আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না এবং আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ী, লৌকিকতাকারী নই।" ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, সত্যিকারের মুমিনগণের জন্য কর্তব্য হলো, যেসব বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই, সে সম্পর্কে তারা বলবে। আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

মোজার ওপর মাসেহ করা সম্পর্কে আকিদা

وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا فِى الْاَثَرِ

অনুবাদ : আর আমরা সফরে (ভ্রমণে) নিজে লোকালয়ে থাকাকালীন সময়ে (চামড়ার) মোজার ওপর মাসেহ করা জায়িয মনে করি। সেভাবে হাদিস শরিফে এসেছে :

وَنَرَى الْمَسْحَ الخ : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানগণ সফরে এবং বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে হাদিসের নিয়মানুসারে চামড়া মোজার ওপর মাসেহ করা জায়িয মনে করেন। যেহেতু এ হুকুমটি

হাদিসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। প্রায় সত্তরজন সাহাবি এ সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন, আমি মোজার ওপর মাসেহ বর্ণনা করা জায়িয মনে করতাম না, পরিশেষে যখন এ সম্পর্কে প্রমাণাদি দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে আসল, তখন আমি একে জায়িয মনে করতে বাধ্য হলাম এবং একে জায়িয বললাম। যেহেতু এসব প্রমাণাদি অস্বীকার করার মতো কোনো যুক্তি প্রমাণ নেই।

ইমাম কারখী (রহ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মোজার ওপর মাসেহ করা অস্বীকার করে অথবা না জায়িয মনে করে, আমি তার সম্পর্কে আশংকা করি। কারণ এ সম্পর্কে হাদিসসমূহে তাওয়াতুরের স্তরে পৌঁছে গেছে। তাই ফকীহগণ মোজার ওপর মাসেহ করাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশেষ পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে, মোজার ওপর মাসেহ করার মাসয়ালাটি শরিয়তের একটি সাধারণ অংশ, একে ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) দীনের বুনিয়াদী আকায়িদের অন্তর্ভুক্ত করে উল্লেখ করলেন কেন?

উত্তর : যেহেতু মোজার ওপর মাসেহ করার মাসয়ালাটি হাদিসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং অজুর মধ্যে উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা পবিত্র কোরআন ফরজ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু শিয়া, রাওয়াফিজরা এ সম্পর্কীয় হাদিসে মুতাওয়াতিরকে অস্বীকার করে মোজার ওপর মাসেহ করাকে না জায়িয ও অবৈধ ঘোষণা করেছে, আর অজুর ওপর মাসেহ করাকে নাজায়িয ও অবৈধ ঘোষণা করেছে, আর অজুর মধ্যে উভয় পা টাখনুসহ মাসেহ করাকে ফরজ বলেছে, এই মাসয়ালাটিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী আলোচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন। বিধায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কাছে উক্ত মাসয়ালাটি দীনি আকাইদের রূপ ধারণ করেছে। তাই তারা একে দীনী আকাইদের মতো স্বীকার করা মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য মনে করেন। তাই ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) উক্ত মাসয়ালাটি দীনের বুনিয়াদী আকাইদের মধ্যে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করেছেন।

হজ এবং জেহাদ সম্পর্কে আকিদা

وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ فَرْضَانِ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِى الْاَمْرِ مِنْ اَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَايُبْطِلُهُمَا شَئٌ وَلَا يَنْقُضُهُمَا.

অনুবাদ : আর হজ এবং জেহাদ মুসলিম শাসকের অধীনে সে নেক হোক আর দুষ্কর্মী হোক, কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কোনো কিছুই এ দুটো কাজ বাতিল বা ব্যাহত করতে পারবে না।

اَلْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ الخ : অর্থাৎ, হজ এবং জেহাদ কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে, এ দুটোকে কোনো কিছু বাতিল বা ভঙ্গ করতে পারবে না। হজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا.

"আর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘরের হজ করা এই সব লোকের ওপর ফরজ, যারা এ ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখেন।" এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ، فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا (دارمى – مشكوه)

"যে ব্যক্তিকে হজ করা থেকে বাহ্যিক প্রয়োজন অথবা জালিম বাদশাহ্ বা রুদ্ধকারী কোনো রোগ বিরত রাখেনি, আর সে মারা গেলো অথচ সে হজ করলো না। তার যদি ইচ্ছে হয় ইহুদী হয়ে মরতে কিংবা নাছারা হয়ে মরতে, তবে সে মরে যাক। (মিশকাত)

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, প্রত্যেক সামর্থ্য সম্পন্ন মুসলমানের ওপর হজ ফরজ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ এবং কোরআন কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে এবং এর প্রত্যেকটি বিধান ও কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। অতএব হজ ও কেয়ামত চলতে থাকবে।

আর আল্লাহ্ তায়ালা জেহাদ সম্পর্কে বলেছেন,

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

"হে নবী, আপনি কাফির এবং মুনাফিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন এবং এদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন, এদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম এবং তা হলো

নিকৃষ্ট ঠিকানা।" এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

ثَلٰثٌ مِنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ، اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ لَا تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُذْ بَعَثَنِيَ اللهُ اِلٰى اَنْ يُقَاتِلَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهٗ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ.

তিনটি বস্তু হলো ঈমানের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। (১) যে ব্যক্তি (সত্য দিলে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে, তার ওপর কোনো ধরনের আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকা, কোনো গুনাহর কারণে তাকে কাফির বলা যাবে না। (২) জেহাদ চলতে থাকবে, যেদিন থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাকে (জেহাদের নির্দেশ দিয়ে) প্রেরণ করবেন। একে কোনো জালিমের জুলুম, আর মুনসিফের ইনসাফ বাতিল করতে পারবে না। (৩) তাক্বদিরের প্রতি বিশ্বাস রাখা। (আবু দাউদ)

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, জেহাদ কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে, কোনো ধরনের অপশক্তি একে রহিত বা বাতিল অথবা ভঙ্গ করতে পারবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, ইমাম ত্বাহাবী হজ এবং জেহাদকে এখানে একত্রে উল্লেখ করেছেন এবং এতদুভয় এবাদতকে অন্যান্য এবাদত থেকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার কারণ কি?

উত্তর : হজ এবং জেহাদ উভয়টি সমষ্টিগতভাবে এমন এবাদত, এমন বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের অধিকারী, যা অন্যান্য এবাদতের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই উভয় এবাদতের জন্য সফর করতে হয় এবং চলা-ফেরা, দৌড়ের দিক দিয়ে উভয়টির মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষতঃ আল্লাহর পথে জেহাদের মাধ্যমে এবং হজের মৌসুমে বিশ্বের সব মুসলমান একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে ইসলামের শান-মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। তাই ইমাম ত্বাহাবী উভয় এবাদতকে একত্রে অন্যান্য এবাদত থেকে পৃথক করে বর্ণনা করেছেন। এতে কোনো ধরনের সংশয়ের কারণ নেই।

مَعَ اُولِى الْاَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ : অর্থাৎ, হজ এবং জেহাদ মুসলমানদের নেতৃবৃন্দের অধীনে পরিচালিত হতে হবে। কেউ একা এগুলো পরিচালনা করতে পারবে না। কারণ হজ এবং জেহাদ পরিচালনার এমন নিয়ম রয়েছে, যেগুলো আমির ছাড়া কেউ পরিচালনা করতে পারবে না। তাই হজ এবং জেহাদের জন্যে এমন একজন আমিরের প্রয়োজন, যিনি এগুলো যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক হজ এবং

জেহাদের আমির নিযুক্ত করে স্বীয় সাহাবি (রা.)গণকে হজে এবং জেহাদে প্রেরণ করতেন। কোনো আমির নিযুক্ত না করে সাহাবি (রা.)গণকে কোথাও জেহাদের জন্য প্রেরণ করেননি। অতএব মুসলমানদের কোনো একজন আমিরের অধীনে হজ এবং জেহাদ পালন করা কর্তব্য।

بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ : অর্থাৎ, হজ এবং জেহাদের আমিরের জন্য মা'সুম, নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয়। বরং ছালেহ পুণ্যবান এবং ফাসেক দুষ্কর্মীর নেতৃত্বে হজ এবং জেহাদ সম্পাদন করা যাবে এতে কোনো আপত্তি নেই। এগুলো হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা। পক্ষান্তরে শিয়া, রাওয়াফিজদের আকিদা হলো হজ এবং জেহাদের আমের হতে পারে না। যেহেতু তারা বলেন, মুহাম্মদী বংশের রাজী নামক একজন (নিষ্পাপ) বের না হওয়া পর্যন্ত জেহাদ জায়েয হবে না। কিন্তু তাদের এ কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের পরিপন্থী ও বিভ্রান্তিকর। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

يَكُوْنُوْا عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوْا اَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَاصَلَّوْا لَا مَا صَلَّوْا اَيْ مَنْ كَرِهَ وَاَنْكَرَ بِقَلْبِهِ (رواه مسلم)

অর্থাৎ, তোমাদের ওপর এমন আমিরগণ নিযুক্ত হবেন, তোমাদের (কেউ তাদের) ভালোবাসবে এবং (তোমাদের কেউ তাদের) অস্বীকার না পছন্দ করবে। তখন যে অস্বীকার করবে, সে মুক্তি পাবে, আর যে ঘৃণা বা না পছন্দ করবে সে নিরাপত্তা পাবে বা বেঁচে যাবে। কিন্তু যারা (এই আমিরদের দুষ্কর্মের প্রতি) সন্তুষ্ট হলো এবং আনুগত্য করলো (তারা ধ্বংস হয়ে গেলো) সাহাবা (রা.) আরজ করলেন, আমরা এদের সঙ্গে লড়াই করবো নাকি? প্রতি উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, লড়াই করবে না) যতক্ষণ তারা নামাজ পড়বে। না (লড়াই করবে না) যতক্ষণ পযন্ত তারা নামাজ পড়বে।

ওপরযুক্ত হাদিস এবং আরো অনেক হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, মুসলমানদের আমির-শাসক ছালেহ-পুণ্যবান এবং ফাসেক-দুষ্কর্মী যে কোনো জন হতে পারে। আমির হওয়ার জন্য মাসুম বা নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং শিয়া, রাওয়াফিজদের আকিদার বিভ্রান্তি পরিষ্কার হয়ে গেলো।

পরকাল সম্পর্কে আলোচনা :

কেরামান কাতেবিনের প্রতি আকিদা

وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ، وَاَنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِيْنَ.

অনুবাদ : আর আমরা কেরামান কাতেবিন (সম্মানিত লিপিকার) ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের আমাদের কথা ও কাজের সংরক্ষণকারী হিসেবে নিয়োগ করেছেন।

وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ কেরামান কাতেবিন নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। যেহেতু এদের কথা পবিত্র কোরআন-সুন্নায় বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ.

"আর নিশ্চয় তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছেন, কেরামান কাতেবিন নামক। তারা এসব জানেন যা তোমরা করো।" (সূরা ইনফিতার)

অন্য আয়াতে বলেছেন :

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ، مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

"যখন দুই ফেরেশতা ডানে এবং বামে বসে তার আমল গ্রহণ করেন, সে যে কথাই উচ্চারণ করে তা-ই গ্রহণ করার জন্য কাছে সদা প্রহরী প্রস্তুত রয়েছে। (সূরা ক্বাফ)

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় এবং আরো অনেক আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, প্রত্যেক মানুষের উভয় কাঁধে দুজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। ডান কাঁধের ফেরেশতা মানুষের নেক আমল লিপিবদ্ধ করেন। আর বাম কাঁধের ফেরেশতা মানুষের দুষ্কর্ম লিপিবদ্ধ করেন। কেয়ামতের দিন এই আমলনামা মানুষের সামনে প্রকাশ করা হবে। অতএব ওপরযুক্ত আয়াত এবং এ সম্পর্কীয় অন্যান্য আয়াত ও হাদিসের প্রতি -বিশ্বাস রাখা মুমিনের ঈমানী কর্তব্য। সুতরাং কেরামান কাতেবিননের প্রতি ঈমান রাখা পবিত্র ঈমানের দাবি।

মৃত্যুর ফেরেশতার প্রতি আকিদা

وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِيْنَ.

অনুবাদ : আর আমরা মালাকুল মাউত (মৃত্যুর ফেরেশতা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি, যার ওপর আল্লাহ্ তায়ালা নিখিল বিশ্ববাসীর রূহ (প্রাণ) কবয (গ্রহণ) করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ মৃত্যুর প্রতি বিশ্বাস রাখেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত প্রাণীর প্রাণ কবয (গ্রহণ) করার জন্য নিযুক্ত করে রেখেছেন। যেহেতু একথাটি পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত সেহেতু এর ওপর ঈমান রাখা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা 'মালাকুল মাউত' সম্পর্কে বলেছেন,

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ.

"আপনি বলে দিন তোমাদের মৃত্যু দান করবেন এই ফেরেশতা যার কাছে তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে ফিরে যাবে।"

মালাকুল মওত সম্পর্কে কিছু কথা

প্রখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ বলেন, মালকুল মাওতের সামনে গোটা বিশ্ব কোনো ব্যক্তির সামনে রক্ষিত বিভিন্ন খাবার সামগ্রী পূর্ণ একটি থালার মতো, তিনি যাকে চান তুলে নেন। বিষয়টি এক মারফু হাদিসেও আছে। অপর এক হাদিসে রয়েছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা জনৈক সাহাবির শিয়রে 'মালাকুল মওত' কে দেখে বললেন, আমার সাহাবির সঙ্গে সহজ ও কোমল ব্যবহার কর। 'মালাকুল মউত' উত্তরে বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি প্রত্যেক মুমিনের সঙ্গে নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বললেন, যতো মানুষ গ্রাম-গঞ্জে, বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে বা সমুদ্র-সৈকতে বসবাস করছে, আমি তাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাঁচবার দেখে থাকি। এজন্য এদের ছোট বড় প্রত্যেকের সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরিজ্ঞাত। অতঃপর বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো যা কিছু হয় সবই আল্লাহর হুকুমে। অন্যথায় আল্লাহর হুকুম ব্যতীত আমি কোনো মশার প্রাণও বিয়োগ ঘটাতে সক্ষম নই। (মায়ারিফুল কোরআন)

ওপরযুক্ত আয়াত ও তাফসির থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো, "মালাকুল মওত" ই মানুষের প্রাণ বিয়োগ ঘটান। সুতরাং এর প্রতি ঈমান রাখা মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য। নতুবা তার ঈমান সঠিক হবে না।

কবরের আজাব সম্পর্কে আকিদা

وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيْمِهٖ لِمَنْ كَانَ لِذٰلِكَ اَهْلًا، وَبِسُؤَالِ الْمُنْكَرِ وَنَكِيْرٍ لِلْمَيِّتِ فِيْ قَبْرِهٖ عَنْ رَبِّهٖ وَدِيْنِهٖ وَنَبِيِّهٖ عَلٰى مَاجَائَتْ بِهِ الْاَخْبَارُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ وَعَنِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ.

অনুবাদ : আমরা কবরের শাস্তি এবং নেয়ামতের প্রতি ঈমান রাখি, ওইসব লোকের জন্য যারা এগুলোর যোগ্য হবে। আর আমরা এ কথার প্রতি ঈমান রাখি, কবরে নাকির মুনকার (নামে) দুধরনের ফেরেশতা মৃত ব্যক্তিকে তার রব, দীন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। (এর প্রমাণ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবি (রা.)গণের কাছে থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَ نَعِيْمِهٖ الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনরা পাপীদের কবরে কঠিন শাস্তি হওয়া এবং পুণ্যবান মুমিনগণ কবরেই শান্তি, স্নেহ এবং অনেক উপহার সামগ্রী পাওয়ার ওপর ঈমান রাখেন। কারণ পবিত্র কোরআনে কবরের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ.

"তাদের সকাল এবং সন্ধ্যা আগুনের সামনে পেশ করা এবং যেদিন কেয়ামত সংগঠিত হবে সেদিন (আদেশ করা হবে) ফেরাউনের গোত্রকে কঠিনতম আজাবে দাখিল করো।" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, ফেরাউন গোত্রের আত্মাসমূহ কালো পাখির আকৃতিতে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা দু'বার জাহান্নামের সামনে হাজির করা হবে এবং জাহান্নাম দেখিয়ে বলা হবে, এটা তোমাদের আবাসস্থল। (মাযহারী) বুখারী ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ، لِيُقَالَ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (متفق عليه)

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মারা যায় কবর জগতে তাকে সকাল-সন্ধ্যা সে স্থান দেখানো হয়, যদি সে জান্নাতি হয় তবে জান্নাতের স্থান, আর সে জাহান্নামি হলে তাকে জাহান্নামের স্থান দেখিয়ে বলা হয়, এটি তোমার আবাস স্থান, যেখানে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর পৌছবে।

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস এবং আরো অনেক আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, দুষ্কর্মী-পাপীদের কবরে ভয়ংকর শাস্তি হবে এবং পুণ্যবান-সৎকর্মীদের কবরে অনেক শান্তি হবে। অতএব সত্যিকারের মুমিনগণের জন্য কর্তব্য হলো এর প্রতি ঈমান রাখা।

পক্ষান্তরে কিছু সংখ্যক মু'তাযেলা এবং রাওয়াফিজ কবরের আজাব অস্বীকার করে। তারা বলে, মানুষ মারা যাওয়ার পর পাথরের মতো অচেতন হয়ে পড়ে থাকে, তার মধ্যে কোনো ধরনের অনুভব শক্তি থাকে না, সেহেতু তারা দুঃখ-কষ্ট, শাস্তি এবং সুখ-শান্তি অনুভব করতে পারে না। সুতরাং তাদের শাস্তি দেয়া অনর্থক।

তাদের একথাটি পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী ও অতি বিভ্রান্তিকর। কারণ সামান্যতম বিবেকবান মানুষ একথা বুঝতে পারেন, আল্লাহ স্বীয় কুদরত দ্বারা মাটি থেকে আদম সৃষ্টি করে তার মধ্যে রূহ দিয়ে সব ধরনের অনুভব শক্তি দান করেছেন। সেই আল্লাহ মৃতকে প্রাণ দিয়ে জীবিত করে সুখ-শান্তি, দুঃখ-শাস্তি অনুভব করার ক্ষমতা দিতে পারেন। অতএব কবরের শাস্তি এবং শান্তির ব্যাপার অস্বীকার করা মুমিনের কাজ নয়। কবরে মুনকার, নাকির ফেরেশতাদ্বয় প্রশ্ন করবে।

وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ لِلْمَيِّتِ الخ অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ এ কথার প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান রাখেন, কবরে নাকির মুনকার দু' ফেরেশতা মৃত ব্যক্তিকে তার রব (প্রতিপালক) দীন এবং নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এ কথাটি অসংখ্যা হাদিস দ্বারা প্রম্যণিত। এখানে শুধু উদাহরণ হিসেবে সংক্ষিপ্ত হাদিসের অনুধাবন পেশ করছি। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّيَ اللهُ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دِيْنِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُوْلَانِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"মৃত ব্যক্তির কাছে দু'জন ফেরেশতা আসবেন, তখন তাকে বসাবেন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন– তোমার প্রভু কে? সে প্রতি উত্তরে বলবে, আমার প্রভু আল্লাহ, অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন। তোমার দীন কি? সে প্রতি উত্তরে বলবে আমার দীন ইসলাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন? এই ব্যক্তি কে? যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিলো? সে প্রতি উত্তরে বলবে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন ফেরেশতাদ্বয় তাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি তাঁকে কিভাবে জানলে? সে প্রতি উত্তরে বলবে, আমি আল্লাহর কেতাব পড়েছি এবং এর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) স্থাপন করেছি।

(হুজুর সা. বলেন) এটাই হলো আল্লাহর কালাম, যারা এর প্রতি ঈমান এনেছো।

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ.

আল্লাহ তায়ালা তাদের কাওলে ছাবিত (কালিমায়ে শাহাদাত)-এর ওপর অটল রাখবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তাঁকে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খোলে দাও, তখন দরজা খোলে দেয়া হবে। তখন তার দিকে জান্নাতের স্নিগ্ধকর হাওয়া বের হতে থাকবে এবং একে তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হবে। এটি হলো পুণ্যবানের কবরের অবস্থা। আর যখন পাপী দুষ্কর্মীদের কবরে রাখা হবে–

فَيَاتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَادِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ، فَيَقُوْلَانِ مَاهٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ.

"তখন দু'জন ফেরেশতা তার কাছে আসবেন, অতঃপর তারা তাকে বসাবেন। অতঃপর তারা জিজ্ঞাসা করবেন তোমার প্রভু কে? তখন সে প্রতিউত্তরে বলবে, হাঃ হাঃ আমি জানি না। অতঃপর তারা জিজ্ঞাসা করবেন তোমার দীন কি? সে উত্তরে বলবে, হাঃ হাঃ আমি জানি না। অতঃপর তারা

জিজ্ঞাসা করবেন, এই ব্যক্তি কে? যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিলো? সে উত্তরে বলবে, আমি জানি না। অতঃপর আসমান থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নাম থেকে বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্যে জাহান্নাম থেকে একটি দরজা খোলে দাও। তখন দরজা খোলে দেয়া হবে। তখন তার প্রতি জাহান্নামের উত্তাপ ও লু বাতাস আসতে থাকবে। এছাড়া তা জন্য কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেয়া হবে যে, তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের ভেতর ঢুকে যাবে। (আবু দাউদ শরিফ)

ওপরযুক্ত হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, কবরের দু'জন (নাকির-মুনকার নামক) ফেরেশতা এসে বান্দার রব, দীন এবং নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং নেককার মুমিনের কবরে শান্তির ব্যবস্থা হিসেবে জান্নাতের সঙ্গে তার কবরের সম্পর্ক করে দেয়া হবে।

আর পাপীদের শাস্তির ব্যবস্থা হিসেবে জাহান্নামের সঙ্গে তার কবরের সম্পর্কে করে দেয়া হবে। অতএব প্রত্যেক মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো, কবরে নাকির মুনকার ফেরেশতার প্রশ্নাদি এবং কবরের সুখ-শান্তি এবং দুঃখ-শাস্তির প্রতি বিশ্বাস রাখা।

কবর স্বর্গ বাগিচা অথবা নরক গর্ত হবে

وَالْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْحُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ

অনুবাদ : আর কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান (হবে) অথবা জাহান্নামের (অগ্নির) গর্তসমূহের মধ্য থেকে একটি গর্ত (হবে)।

وَالْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ الخ : অর্থাৎ, যেসব পুণ্যবান মুমিন মুনকার নাকির-ফেরেশতাদ্বয়ের তিনটি প্রশ্নের জবাব যথাযথভাবে দিতে পারবেন, তাদের জন্যে কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগানে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে যেসব দুষ্কর্মী-পাপী কবরে 'মুনকার-নাকির' ফেরেশতাদ্বয়ের তিন প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না, তাদের জন্যে স্বীয় কবর জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্য থেকে একটি গর্তে পরিণত হবে। এদিকেই ইঙ্গিত করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْحُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ (رواه الترمذى)

"নিশ্চয় কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্য থেকে একটি গর্ত।" (তিরমিযী)

মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া, আমলের প্রতিদান, হিসাব-নিকাশ ও আমলনামা পাঠ সম্পর্কে আকিদা

وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، وَجَزَاءُ الْاَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالْعَرْضُ وَالْحِسَابُ وَقِرَاءَةُ الْكِتَابِ.

অনুবাদ : আর আমরা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া ও কেয়ামতের দিন কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান, আমলনামা পেশ, আর হিসাব-নিকাশ এবং আমলনামা পাঠ করার ওপর ঈমান (বিশ্বাস) রাখি।

وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা মুমিনগণ মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখেন, কারণ এ আকিদা ব্যতীত কোনো মানুষ মুমিন হতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াতে এ সম্পর্কে বিশেষ প্রমাণাদির মাধ্যমে আলোচনা করেছেন এবং মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে অস্বীকারকারীদের ভয়ংকর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন।

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ.

"কাফিররা দাবি করে, তারা কখনো মৃত্যুর পর জীবিত হবে না। তুমি বলে দাও, অবশ্যই (জীবিত) হবে আমার প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয় তোমরা আবার জীবিত হবে। অতঃপর তোমাদের অভিহিত করা হবে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।" (সূরা তাগাবুন)

ওপরযুক্ত আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া অনিবার্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব এর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য।

وَجَزَاءُ الْاَ عْمَالِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা মুমিনরা এ কথার প্রতি বিশ্বাস রাখেন, প্রত্যেক মানুষকে তার সকল কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। এতে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ সম্পর্কে ঘোষণা

দিয়েছেন। যেমন সূরা ফাতেহায় বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রতিদান দিবসের মালিক।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

প্রতিদান দিবস ওই দিনকে বলা হয়, যে দিন আল্লাহ তায়ালা ভালো-মন্দ, ছোট-বড়, প্রকাশ্য-গোপন, সকল কর্মের প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এই দিনের হাকিকত সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

"ওই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেককেই তার কৃত কর্মের ফল পুরোপুরিভাবে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ অবিচার করা হবে না।" এ সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে, এখানে একটি হাদিস পেশ করছি, নবী করিম (সা.) বলেছেন,

اَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوْقَ اِلٰى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

"কেয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারের কাছে তার হক পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। এমনকি শিংবিশিষ্ট ছাগলের কাছ থেকে শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ নেয়া হবে।" (মুসলিম)

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদিস স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে, এতে কোনো ধরনের ত্রুটি বা সংকীর্ণতা করা হবে না। অতএব এর ওপর প্রত্যেক মুমিনের দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে, নতুবা মুমিন বলে গণ্য হবে না।

وَالْعَرْضُ وَالْحِسَابُ : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা প্রত্যেক মুমিন একথার ওপর ঈমান রাখেন, কেয়ামতের দিন তাদের সামনে প্রত্যেকের সমস্ত কৃতকর্ম পেশ করা হবে এবং সব কিছুর তন্ন তন্ন করে হিসাব নেয়া হবে। কেনোনা, এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াতে কোরআনী ও হাদিসে নববি রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا (سورة كهف)

"আর তারা যা আমল করেছে তা উপস্থিত পাবে।" (সূরা কাহাফ)

অন্য আয়াতে বলেছেন,

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.

"যেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ হবে, যাতে তাদের তাদের কৃতকর্ম (আমলসমূহ) দেখানো হবে, সুতরাং কেউ (শস্যের) অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে, আর অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা য়িলযাল) হাদিস শরিফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اِلَّا هَلَكَ قُلْتُ اَوَلَيْسَ يَقُوْلُ اللهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا فَقَالَ اِنَّمَا ذَالِكَ الْعَرْضُ، وَلٰكِنْ مَنْ نُوْقِشَ فِى الْحِسَابِ يُهْلَكُ.

"কেয়ামতের দিন যার পুরোপুরি হিসাব নেয়া হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন?

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا : অতিসত্বর হিসাব নেয়া হবে সহজ হিসাব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি উত্তরে বললেন, এটাতো (عرض) আমল পেশ করা, যার তন্ন তন্ন করে হিসাব নেয়া হবে, সে ধ্বংস হবে।

(বুখারী, মুসলিম)

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, প্রত্যেক প্রত্যেক মানুষের সমস্ত কৃতকর্ম তার সামনে পেশ করা হবে এবং এর হিসাব নেয়া হবে, এতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো এর ওপর বিশ্বাস রাখা, নতুবা ঈমান যথার্থ হবে না।

আমলনামা পাঠ করা সম্পর্কে কি আকিদা রাখতে হবে

وَقِرَاءَةُ الْكِتَابِ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা প্রত্যেক মুমিন একথার ওপর বিশ্বাস রাখেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষের কাছে তার আমলনামা দেয়া হবে এবং প্রত্যেককে তা পড়ার নির্দেশ দেয়া হবে, আর সে তার আমলনামা পড়তে পারবে। এতে তার কোনো অসুবিধা হবে না। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ আলোচনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيمَةِ كِتَابًا يَّلْقَاهُ مَنْشُوْرًا اِقْرَاْ كِتَابَكَ وَكَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.

"আমি প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি কেয়ামতের দিন বের করে (দেখাবো তাকে) আর সামনে একটি কেতাব, য়া সে খোলা

অবস্থায় পাবে। তুমি পাঠ কর তোমার কেতাব, আজ তো হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।"

আমলনামা গলায় হার হওয়ার মর্মার্থ : মানুষ যে জায়গায় যে কোনো অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সঙ্গে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেখে দেয়া হয়। কেয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দেয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে, সে পুরস্কারের যোগ্য, না আজাবের যোগ্য।

হযরত কাতাদাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখা-পড়া না জানা ব্যক্তিও আমলনামা পড়ে ফেলবে। (মাআরিফুল কোরআন)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰئِكَ يَقْرَأُوْنَ كِتَا بَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا.

"যাদের ডান হাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে, তখন তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্যতমও জুলুম করা হবে না।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, প্রত্যেক মানুষের হাতে তার আমলনামা দেয়া হবে এবং সে এটি পড়তে পারবে। অতএব প্রত্যেক মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য হলো এর ওপর ঈমান (বিশ্বাস) রাখা।

কিন্তু মুতাযেলিরা কোনো প্রমাণাদি ছাড়াই একে অস্বীকার করে। তাদের বিভ্রান্তি প্রমাণের জন্য ওপরোল্লিখিত প্রমাণাদি যথেষ্ট। পৃথক কোনো দলিল প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

সাওয়াব ও শাস্তি প্রদান সম্পর্কে আকিদা

وَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ وَالصِّرَاطُ وَالْمِيْزَانُ.

অনুবাদ : আর আমরা কর্মের সাওয়াব প্রতিদান, শাস্তি এবং পুলসিরাত ও মিযানের ওপর ঈমান (বিশ্বাস) রাখি।

وَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ প্রত্যেক মুমিনের সৎকর্মের প্রতিদান বা পুরস্কার পাওয়া এবং অসৎকর্মের শাস্তি ভোগ করার প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখেন। যেহেতু এসব বিষয়াদি কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, এসব অস্বীকার করার কোনো পথ নেই।

মানুষের কর্মের প্রতিফল বা প্রতিদান কেয়ামতের দিন দু'ভাবে প্রদান করা হবে। (১) তাদের সৎকাজের সাওয়াব এবং প্রতিদান করা। (২) অসৎ কাজের কারণে শাস্তি দেয়া।

প্রথমটিকে কোরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় আজর (اجر) পারিশ্রমিক ও প্রতিদান বলা হয়। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"নিশ্চয় কেয়ামতের দিন তোমাদের (কর্মের) প্রতিদান তোমাদের পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে।" (সূরা আলে ইমরান)

দ্বিতীয়টিকে কোরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় 'বেযরুন' (وزر) ভারী বোঝা, বড় গাট, পাপের বোঝা বলা হয়। যেমন- পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, সে কেয়ামতের দিন পাপের বোঝা (পিঠে) ওঠাবে।" (সূরা তাহা)

পবিত্র কোরআনে মানুষের কর্মের প্রতিফল প্রদানের কথা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমতঃ মানুষের আমলসমূহ প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ.

"যে অণু পরিমাণ ভালো আমল করবে সে তা দেখবে পাবে।"

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ.

"আর যে অণু পরিমাণ খারাপ আমল করবে সে তা দেখতে পাবে।"

দ্বিতীয়তঃ কেয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে পুণ্যবানদেরকে সম্মান প্রদর্শন করে এবং পাপীদেরকে অপমান করে প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

"সেদিন কোনো মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোনো মুখ হবে কালো, বস্তুতঃ যাদের মুখ কালো হবে, (তাদের বলা হবে) তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আজাবের আস্বাদ গ্রহণ করো। আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহমতের মাঝে, তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হওয়া সম্মানিত হওয়ার নিদর্শন, আর মুখ কালো হওয়া অপমানিত হওয়ার নিদর্শন।"

তৃতীয়তঃ পুণ্যবান এবং পাপী উভয়কে স্বীয় কর্মের পরিপূর্ণ প্রতিফল প্রদানের মাধ্যমে প্রতিদান প্রদান করা হবে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى "অতঃপর তাকে প্রতিদান দেয়া হবে, পুরোপুরি প্রতিদান।" (সূরা নাজম)

চতুর্থতঃ পুণ্যবানের সৎ কর্মের ফল অত্যধিকভাবে বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিদান দেয়া হবে, আর দুষ্কর্মীর দুষ্কর্মের প্রতিফল সমানভাবে দেয়া হবে, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

"যে ব্যক্তি একটি সৎ কাজ করবে, তার জন্যে এর দশ গুণ থাকবে। আর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করবে, তার জন্য এর সমান শাস্তিই থাকবে, বস্তুতঃ তাদের জুলুম করা হবে না।" (সূরা আনআম)

পঞ্চমতঃ সৎকর্মীকে সফলতা প্রদান করে এবং দুষ্কর্মীকে বঞ্চিত করে প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মী সম্পর্কে বলেছেন,

وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

"আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে বাঁচাবেন, নিশ্চয়ই আপনি তাকে অনুগ্রহ করবেন। আর এটাই মহা সফলতা।"

অসৎকর্মী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.

"অতঃপর যখন আল্লাহর আদেশ আসবে তখন ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে সে ক্ষেত্রে বাতিল পন্থীদের ধ্বংস হবে।" (সূরা মু'মিন)

ষষ্ঠতঃ মুমিনগণকে চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে এবং কাফিরদেরকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের ঢুকিয়ে কর্মের শেষ প্রতিদান প্রদান করা হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِيْ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا.

"আর যারা সৌভাগ্যবান, তারা জাহান্নামে যাবে; তারা সেখানেই চিরদিন থাকবে।" (সূরা হুদ)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ خَالِدِيْنَ فِيْهَا.

"যারা হতভাগ্য, তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহে মানুষের জীবনের কর্মের প্রতিফল ও প্রতিদান প্রদানের কথা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এ সবের ওপর ঈমান রাখা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য। নতুবা ঈমান পূর্ণ হবে না।

পুলসিরাত সম্পর্কে আকিদা

وَالصِّرَاط : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ 'পুলসিরাতের' ওপর ঈমান রাখে, জাহান্নামের ওপর বিস্তৃত একান্ত তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম এক পুল নির্মাণ করা হবে। মুমিন, কাফির সবাইকে এ পুলের ওপর দিয়ে যেতে হবে, যেহেতু এটি পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহর তায়ালা এ সম্পর্কে বলেছেন,

وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا.

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌছবে না। এটা আপনার প্রভু অনিবার্য ফয়সালা।" (সূরা মারইয়াম)

উক্ত আয়াতে وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا এর অর্থ হলো এমন কোনো মুমিন ও কাফির থাকবে না, যারা জাহান্নামে পৌছবে না। এখানে وُرُوْد শব্দের অর্থ প্রবেশ করা নয়। বরং এর অর্থ مُرُوْر ও عُبُوْر শব্দের অর্থ অতিক্রম করা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর এক রেওয়ায়াতে مُرُوْر শব্দটি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, পুরসিরাত অতিক্রম করা। অতএব এই আয়াত এক অর্থে পুলসিরাত অতিক্রম করার ওপর প্রমাণ হয়। এই হিসেবে, পুলসিরাত জাহান্নামের ওপর বিস্তৃত, এর ওপরে জান্নাত, আর নিচে জাহান্নাম। সুতরাং যখন মুমিনগণ ও

কাফির পুলসিরাত দিয়ে যাত্রা করবেন, তখন তারা জাহান্নামেই অতিক্রম করলেন বা এতে ঢুকে পড়লেন। তাই কোনো কোনো তাফসিরে وُرُوْد এর অর্থ دُخُوْل নেয়া হয়েছে। যাই হোক এই আয়াত পুলসিরাতের ওপর প্রমাণ হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرِ جَهَنَّمَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يَّجُوْزُ مِنَ الرُّسُلِ بِاُمَّتِهٖ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اِلَّا الرُّسُلُ، وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فِيْ جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا اِلَّا اللّٰهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُّوْبَقُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُّخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو الخ.

"জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত নির্মাণ করা হবে। অতঃপর রাসূলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম স্বীয় উম্মত নিয়ে আমি ই তা অতিক্রম করবো। এই দিনে রাসূল ব্যতীত কেউ কোনো কথা বলবে না। এই দিন রাসূল গণের কালাম হবে اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ، سَلِّمْ জাহান্নামের মধ্যে ছা'দানের কাঁটার মতো ধারালো ঘন অংশটা থাকবে। এগুলো মানুষের আমলের সাহায্য ছোবল দিতে থাকবে। এদের মধ্যে কেউ ধ্বংস হয়ে যাবে, কেউ সরিষার মতো ছোট হয়ে যাবে। অথঃপর মুক্তি পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

পুলসিরাত সম্পর্কে অন্য হাদিসে আছে,

فَاِنَّهٗ اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَاَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ.

"পুলসিরাত চুল থেকে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম এবং তরবারী থেকে অধিক ধারালো।"

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস পুলসিরাতের অস্তিত্বের ওপর স্পষ্ট প্রমাণ হয়। সুতরাং একে বিশ্বাস করা সত্যিকারের মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য।

কিন্তু অধিকাংশ মু'তাযেলা 'পুলছিরাত'কে অস্বীকার করে। তারা বলে এ সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বস্তুর ওপর দিয়ে চলা, যা অতিক্রম করা অসম্ভব। যদি কোনোক্রমে সম্ভবই হয় তবে এতে মুমিনগণকে অনর্থক কষ্ট দেয়া ছাড়া কিছু হবে না।

এদের কথার জবাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, যে আল্লাহ তায়ালা এসব সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ রাস্তা অতিক্রম করানোর ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি মুমিনের জন্য একে একেবারে সহজ করে দেবেন। অতঃপর তারা বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতগতিতে পার হয়ে যাবেন। তাই তাদের কোনো ধরনের কষ্ট বোধই হবে না।

মিজান সম্পর্কে আলোচনা

وَالْمِيْزَانَ অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ এই কথার ওপর ঈমান (বিশ্বাস) রাখেন, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন মানুষের কথা ও আমল পরিমাপ করার জন্য 'নিক্তি' স্থাপন করবেন। যাদের নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে তাদের জন্যে জান্নাতের ফয়সালা দেবেন। আর যাদের বদ আমলের পাল্লা ভারী হবে, তাদের জন্য জাহান্নামের ফয়সালা দেবেন। যেহেতু এ বিষয়টি পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। সেহেতু এর ওপর ঈমান রাখা কর্তব্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ.

"আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। অতঃপর যাদের (নেকির) পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের (নেকির) পাল্লা হাল্কা হবে, তারা এসব লোক যারা নিজেদেরকে ধ্বংস করেছে। কেনোনা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে।" (সূরা আরাফ)

ওপরযুক্ত আয়াতের اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ বাক্য দ্বারাই ওপরোল্লিখিত আকিদাটি প্রমাণিত হয়, সেদিন ভালো-মন্দ কথা এবং কাজ ওজন করা হবে। তা সত্য এবং সঠিকভাবেই হবে। এতে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেছেন,

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ.

"আমি কেয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের (মানদণ্ড) নিক্তি স্থাপন করবো। সুতরাং কারো প্রতি একটু জুলুম করা হবে না। যদি সরিষার দানা পরিমাণও কোনো আমল হয় আমি তা উপস্থিত করবো, আর হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া)

ইমাম তিরমিযী (রহ.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়াতে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার দু'টি কৃতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কর্মে কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদের গালিগালাজ করি এবং হাতে মার পিটও করি। আমার এবং এই

গোলামদ্বয়ের মধ্যে ইনছাফ কিভাবে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের নাফরমানী, কারচুপি এবং ঔদ্ধতা ওজন করা হবে, এরপর তোমার গালিগালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তুমি তাদের যে শাস্তি দাও তা যদি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে অবশিষ্টটুকু তোমার অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে। আর যদি তাদের অপরাধের তুলনায় শাস্তি বেশি হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। লোকটি একথা শোনে অন্যত্র সরে গেলো এবং কান্না জুড়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি কোরআনের এই আয়াত পাঠ করনি?

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ الخ. : লোকটি আরজ করলো, এখন তো তাদের মুক্ত করে এই হিসেবে কবর থেকে নিস্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। সুতরাং আমি তাদের মুক্ত করে দিলাম। (তিরমিযী)

এখন প্রশ্ন হতে পারে, ভারী বস্তু বা জড় পদার্থ জাতীয় বস্তু ওজন বা পরিমাণ হতে পারে। কিন্তু মানুষের কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা এগুলো জড় পদার্থ জাতীয় নয়। অতএব এগুলো কিভাবে ওজন ও পরিমাপ করা হবে?

উত্তর প্রথমতঃ রাব্বুল আলামীন, সর্বশক্তিমান, তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতা রাখেন, যা ইচ্ছা তিনি তা করতে পারেন। সুতরাং যা কিছু করার ক্ষমতা কোনো মাখলুকের নেই, তিনি তা করার ক্ষমতা রাখেন ও করতে পারেন। অতএব আমরা যেসব বস্তু ওজন করতে পারি না, অথবা ওজন করার কথা আমাদের বুঝে আসে না, আল্লাহ তায়ালা তা ওজন করতে পারেন, এটা তাঁর ক্ষমতায় রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ আজকাল জগতে ওজন করার নতুন যন্ত্রাদি আবিষ্কার হয়েছে, যাতে দাড়ি পাল্লা বা স্কেল কাটা ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। এসব নবাবিষ্কার যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল এমন সব বস্তু ওজন করা যায়, যা ইতিপূর্বে ওজন করার কল্পনাও করা যেতো না। আজকাল রাতের চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও ওজন করা যায়। এমনকি শীত, গ্রীষ্ম পর্যন্ত ওজন করা হয়। এগুলোর মিটারই এদের দাঁড়ি পাল্লা। অতএব যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম কুদরত ও শক্তি দ্বারা মানুষের কাজ-কর্ম ওজন করে নেন, তবে এতে বিস্ময়ের কিছু থাকতে পারে না এবং বিস্ময়ের কিছু নেই।

পক্ষান্তরে মু'তাযেলা সম্প্রদায় বান্দার আমাল ওজন হওয়াকে অস্বীকার করে এবং ওপরযুক্ত প্রশ্ন করে এবং আরো অনেক অহেতুক কথা-বার্তা বলে। তাদের এসব প্রশ্ন ও অহেতুক কথা-বার্তার জবাবে ওপরোল্লেখিত উত্তরগুলোই যথেষ্ট। নতুবা কোনো জবাব দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

হাশরের মাঠে স্বশরীরে পুনরুত্থান সম্পর্কে আকিদা

وَالْبَعْثُ هُوَ حَشْرُ الْاَجْسَادِ وَاِحْيَاءُهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

অনুবাদ : আর আমরা বা'আছ, শরীরসমূহ পুনরুত্থান হওয়ার এবং কেয়ামতের দিন জীবিত হওয়ার প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখি।

وَالْبَعْثُ هُوَ حَشْرُ الْاَجْسَادِ الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সব মুসলমান এ কথার ঈমান রাখেন, মৃত্যুর পরে হাশরের ময়দানে স্বশরীরে মানুষের পুনরুত্থান ঘটবে, আর কেয়ামতের দিন সবাইকে আল্লাহ তায়ালা জীবিত করবেন। এ আকিদা ব্যতীত কোনো মানুষ মুমিন হতে পারবে না। যেহেতু এ আকিদা অসংখ্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ.

"আর নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এ সবগুলোকে আবার জীবিত করবেন যারা কবরে আছে। স্বশরীরে জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়াকে কাফেররা অসম্ভব মনে অস্বীকার করেছিলো। এদের উত্তরেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّ بُكْمًا وَّصُمًّا مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا ذٰلِكَ جَزَاۤؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْۤا اَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا اَءِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا.

"আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করবো তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে, তখন আমি তাদের জন্যে অগ্নি আরো বৃদ্ধি করে দেবো, এটাই তাদের শাস্তি। কারণ তারা আমার নির্দেশসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, আমরা যখন অনস্তিত্বে পরিণত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে জীবিত হয়ে আবার উঠবো।" (সূরা বনী ইসরাঈল)

কোনো কাঁফিরই মৃত্যুর পরে রূহ জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করতো না, তারা মৃত্যুর পরে স্বশরীরে জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করতো এবং এবং অসম্ভব মনে করতো। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের উত্তরে বলেছেন,

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ.

"সে (মানুষ) আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে গেছে। সে বলে কে জীবিত করবে অস্তিসমূহকে? যখন সেগুলো পচে গলে যাবে। আপনি বলুন! যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই জীবিত করবেন। তিনিই সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।" (সূরা ইয়াসীন)

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মাখলুককে মৃত্যুর পর স্বশরীরে জীবিত করবেন। এতে সন্দেহ নেই। এর ওপর ঈমান রাখা একান্ত কর্তব্য। এ সম্পর্কে অগণিত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তবে এখানে একটি হাদিস পেশ করছি। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

يُحْشَرُ النَّاسُ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَلْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ. (متفق عليه)

"কেয়ামতের দিন লোকদের নগ্নপদ ও নগ্ন শরীর এবং খতনা বিহীন অবস্থায় পুনরুত্থান করা হবে। আমি (আয়েশা) বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! পুরুষ এবং মহিলারা একত্রে থাকবে, একে অন্যের দিকে তাকাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়েশা (সেই দিন) একে অন্যের দিকে তাকানোর চেয়ে অত্যধিক ভয়াবহ অবস্থা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

ওপরযুক্ত হাদিস স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মানুষ কেয়ামতের দিন স্বশরীরে কি অবস্থায় জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে আসবে? এতে কোনো মুসলমানের সন্দেহ থাকতে পারে না। সুবিবেকের দৃষ্টিতে স্বশরীরে জীবিত হওয়া গ্রহণযোগ্য কথা।

দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পরে মানুষকে তাঁর আমলের প্রতিদান প্রদানের জন্যে জীবিত করা হবে। আর মানুষের আমল তার অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে প্রতঙ্গের মাধ্যমে সংঘটিত ও সম্পাদিত হয়। তার রুহের মাধ্যমে নয়। যদিও রুহের মাধ্যমে শরীর কর্মের ওপর ক্ষমতাবান হয়। কিন্তু গভীর গবেষণার মাধ্যমে একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, আমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষত্ব, রুহের বিশেষত্ব নয়। যেহেতু আমল বলা হয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক নড়াচড়া ও ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো কাজ সংগঠিত হওয়াকে। আর রুহের দ্বারা কাজ সম্পাদন করার

ইচ্ছা ও জ্ঞান এবং আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতএব একথা প্রমাণিত হয়ে গেলো, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ হলো, কাজ সম্পাদন ও সংঘটিত করা। আর রুহের কাজ হলো কাজের ইচ্ছা সৃষ্টি করা। সুতরাং আমলের প্রতিদান প্রমাণের জন্য শরীরকে মূল বা আসল আর রুহকে তার অধীনস্থ মেনে নেয়া উচিত। তাই সুষ্ঠু বিবেকের চাহিদা হলো কেয়ামতের দিন মানুষকে তার আমলের প্রতিদান প্রদানের জন্য স্বশরীরে জীবিত করা এবং তার প্রতিদান দেয়া।

একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ : কোনো কোনো বস্তুবাদি দার্শনিক বলে থাকে, মৃত্যুর পর স্বশরীরে জীবিত হওয়ার কথা শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কোনো নবী বলেননি। যদি একথাটি বাস্তবিকই হত, তবে অন্যান্য নবী (আ.)গণও এ সংবাদ দিতেন। সুতরাং মৃত্যুর পর স্বশরীরে জীবিত হওয়ার কথাটি একটি ধারণা ও কল্পনা ব্যতীত কিছু নয়।

ওপরযুক্ত অভিযোগের জবাবে সত্যিকারের মুমিনগণ বলেন, এই সব বস্তুবাদি দার্শনিকদের ওপরযুক্ত দাবিটা একেবারে বিভ্রান্তিকর এবং নবী (আ.)গণের ওপর একটি মিথ্যা অপবাদ ছাড়া কিছু নয়। কেনোনা, আল্লাহর প্রত্যেক নবীই মৃত্যুর পরে আবার স্বশরীরে জীবিত হওয়ার কথা স্বীয় উম্মতের কাছে বলে গেছেন এবং পরকালে নাজাতের সামান তৈরি করার প্রতি অনেক তাগিদ করে গেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)কে নির্দেশ দিয়েছিলেন,

اِهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ قَالَ فِيْهَا
تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ.

"তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান রয়েছে এবং এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল ভোগ রয়েছে, তিনি বলেন : তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যু বরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের বের করা হবে।"

অন্য আয়াতে আছে, হযরত নূহ (আ.) নিজ কওমকে বলেছেন,

وَاللهُ اَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا.

"আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যমীন থেকে উদগত করেছেন, অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুত্থান করবেন।" (সূরা নূহ)

হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর কাছে আবেদন করেছেন,

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ "আর তুমি আমাকে পুনরুত্থানের দিবসে লাঞ্ছিত করো না।" (সূরা শোয়াবা)

আর হযরত মূসা (আ.) তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন,

يَاقَوْمِ إِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ.

"হে আমার কওম, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ।" (সূরা মুমিন)

মোটকথা আল্লাহর প্রত্যেক নবীই (আ.) নিজ উম্মতগণকে মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া এবং পরকালের ভয়াবহ অবস্থার সংবাদ দিয়েছিলেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

"তাদের জাহান্নামের দায়িত্বশীলগণ (প্রশ্ন করে) বলবেন, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে এমন রাসূলগণ আসেন নি? যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতেন এবং তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে ভয়-ভীতি প্রদশন করে সতর্ক করতেন। তারা বলবে, হ্যাঁ; কিন্তু কাফিরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই নির্ধারিত রয়েছে।" (সূরা জুমার)

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবী (আ.)গণই মৃত্যু পরে জীবিত হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে অসংখ্য আয়াতে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগণিত হাদিসে মৃত্যুর পরে কেয়ামতের দিনে হাশরের মাঠে স্বশরীরে জীবিত হওয়ার কথা এবং কেয়ামতের দিনের ভয়ানক অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো নবী রাসূল আসবেন না এবং পবিত্র কোরআনের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে আর কোনো কেতাব অবতীর্ণ হবে না, সেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাদিসে এবং আল্লাহ তাঁর কোরআনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া সমীচীন মনে করেছেন। আর আগের নবী (আ.)গণ এবং তাঁদের কেতাবেও এর আংশিক বর্ণনা ছিলো। সুতরাং মৃত্যুর পর স্বশরীরে জীবিত হওয়া এবং কেয়ামতের দিনের ভয়ানক অবস্থার বর্ণনা শুধু কোরআনে

এবং শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে পাওয়া যায়, অন্য কোনো কেতাবে বা অন্য কোনো নবী বলেননি– এমন কথা বলা মারাত্মক বিভ্রান্তিকর অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টাই সৃষ্ট এবং বর্তমান বিদ্যমান আছে

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوْقَتَانِ لَا يَفْنِيَانِ اَبَدًا وَلَا يَبِيْدَانِ.

অনুবাদ : আর একথা ওপর ঈমান রাখি, জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়টি সৃষ্টি ও বিদ্যমান রয়েছে। এ দুটো কখনো নশ্বর হবে না এবং ধ্বংস হবে না।

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوْقَتَانِ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ এ কথার ওপর ঈমান রাখেন, জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়টিকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করে রেখেছেন। যেহেতু এটা পবিত্র কোরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

وَقُلْنَا يَاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا.

"আর আমি আদম (আ.)কে হুকুম করলাম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং ওইখানে যা চাও, সেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তি সহ খেতে থাক।" (সূরা বাকারাহ)

ওপরযুক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ তায়ালা জান্নাত সৃষ্টি করে রেখেছেন। অন্য আয়াতে জাহান্নাম সম্পর্কে বলেছেন,

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا.

"নিশ্চয় আমি কাফির (অবিশ্বাসীদের) জন্যে প্রস্তুত রেখেছি শেকল, বেড়ি ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে, জান্নাত এবং জাহান্নাম অনেক আগেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এগুলো বর্তমানেও বিদ্যমান আছে। এ সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন বুখারী এবং মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মারা যায় (তখন করবে) প্রতি সকাল এবং সন্ধ্যায় তার (ভবিষ্যৎ) তার কাছে উপস্থিত করা হয়। সে যদি জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে জান্নাতিদের স্থান আর সে যদি জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে জাহান্নামের স্থান দেখিয়ে বলা হয়, এটাই তোমার আসল বাসস্থান। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কেয়ামতের দিন তথায় পাঠাবেন" (আরো অনেক হাদিসে প্রমাণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ রজনীতে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছিলেন এবং আরো অনেক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, মুমিনের কবরের সম্পর্ক জান্নাতের সঙ্গে, আর নাফরমানের কবরের সম্পর্ক জাহান্নামের সঙ্গে স্থাপন করে দেয়া হয়। সুতরাং ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং বর্তমানে এগুলো বিদ্যমান আছে। অতএব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ এর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখেন।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ মুতাযেলারা বলে, জান্নাত এবং জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান নয়। আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন এগুলো সৃষ্টি করবেন। তাদের একথাটি পবিত্র কোরআন হাদিসের পরিপন্থী ও একেবারে ভ্রান্ত, তাই তাদের এ উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

لَا يَفْنِيَانِ وَلَا يَبِيْدَانِ : অর্থাৎ, জান্নাত এবং জাহান্নাম চিরকাল থাকবে। কোনো দিন ক্ষয় হবে না এবং ধ্বংসও হবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

اَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِيْ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا، وَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا.

"যারা সৌভাগ্যবান, তারা জান্নাতে থাকবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর যারা হতভাগ্য, তারা জাহান্নামে যাবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।" আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের নেয়ামত সম্পর্কে বলেছেন,

اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ.

"এটা আমার দেয়া রিযেক, এর কোনো শেষ নেই।" (সূরা ছোয়াদ)

জান্নাত এবং জাহান্নাম চিরকাল থাকার সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। এক হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيئَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِيْ مُنَادٍ يَاأَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَاأَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَىٰ فَرْحِهِمْ وَأَهْلَ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ.

"যখন জান্নাতিগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে চলে যাবে তখন মউতকে জান্নাত এবং জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড় করানো হবে, অতঃপর জবাই করা হবে। তখন জান্নাতিগণকে এক আহ্বানকারী ডেকে বলবে, হে জান্নাতিগণ মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসীরা মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতিগণের আনন্দের ওপর আনন্দ বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং জাহান্নামিদের চিন্তার ওপর চিন্তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, জান্নাত এবং জাহান্নাম চিরকাল থাকবে। এগুলো কোনো দিন ধ্বংস বা শেষ হবে না এবং এর অধিবাসীরাও চিরকাল থাকবেন তারা কোনো দিন ধ্বংস বা শেষ হবে না।

পক্ষান্তরে জাহমিয়ারা বলে, জান্নাত এবং জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার অধিবাসীরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের এ কথাটি কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। যেহেতু তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বহির্ভূত।

জান্নাত এবং জাহান্নামের অধিবাসীরা আগ থেকে নির্ধারিত

وَأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا، فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلنَّارِ عَدْلًا مِنْهُ وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا فُرِغَ مِنْهُ وَصَائِرٌ إِلَىٰ مَا خُلِقَ لَهُ.

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা জান্নাত এবং জাহান্নাম অন্যান্য সৃষ্টির আগেই সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং এতদুভয়ের অধিবাসীগণকেও সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহে জান্নাতে পাঠাবেন এবং যাকে ইচ্ছা আপন ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে জাহান্নামে পাঠাবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি সে কাজই সম্পাদন করে, যা তার জন্য আগেই নির্ধারিত করা হয়েছে এবং যার জন্যে তার সৃষ্টি, সে দিকেই সে ফিরছে।

إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ وَخَلَقَ لَهُمَا اَهْلًا : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা জান্নাত এবং জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন মাখলুক সৃষ্টির অনেক আগে এবং তার জন্যে বাসিন্দা বা অধিবাসীও সৃষ্টি করে রেখেছেন। যেমন মুসলিম শরিফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, একটি হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِىْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ اَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِىْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ (رواه مسلم)

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের জন্যে বাসিন্দা সৃষ্টি করেছেন। তাদের এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন তারা তাদের পিতাগণের মেরুদণ্ডে রয়েছে। আর জাহান্নামের জন্যে বাসিন্দা সৃষ্টি করেছেন, এমতাবস্থায় তাদের সৃষ্টি করেছেন, তারা তাদের পিতৃবর্গের মেরুদণ্ডে রয়েছে।" (মুসলিম)

ওপরযুক্ত হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মানুষ সৃষ্টির আগেই আল্লাহ তায়ালা জান্নাত এবং জাহান্নামের বাসিন্দা নির্ধারিত করে রেখেছেন।

فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلْجَنَّةِ فَضْلًا مِّنْهُ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে যাকে ইচ্ছা জান্নাতে দেবেন। এতে কারো কোনো অভিযোগ থাকবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالٰى.

"কোনো ব্যক্তি আল্লাহর রহমত (দয়া) ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

আর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় ন্যায় বিচারে যাকে ইচ্ছা জাহান্নামের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। কারণ আল্লাহতায়ালা কাউকে তার পাপের অধিক শাস্তি দেবেন না। যেমন তিনি পবিত্র কোরআনে বলেছেন, وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا "তাদের (পাপীদের) কে সামান্যতম জুলুম করা হবে না।

নোট : আল্লাহর ফজল এবং আদল সম্পর্কে আগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا فُرِغَ مِنْهُ অর্থাৎ, বর্তমানে বান্দা যেসব কাজ-কর্ম করছে, এতে ওই সব ফলাফল অর্জন হবে যা তার জন্যে নির্ধারিত করে ফারিগ হওয়া গেছে। আর সে ওই দিকে অগ্রসন হচ্ছে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে তার

চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে এতে কোনো ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারবে না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আগে হয়েছে।

ভালো-মন্দ সবকিছুই বান্দার জন্য নির্ধারিত

وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ

অনুবাদ : ভালো ও মন্দ উভয়ই বান্দার ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে আছে।

وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ : অর্থাৎ, ভালো-মন্দ উভয়ই বান্দার তাকদিরে নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে। তার অর্জনের ভিত্তিতে পরকালে কর্মের ফলাফল প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা জান্নাতিদেরকে সম্বোধন করে কেয়ামতের দিন বলবেন। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে :

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

"অতএব এই জান্নাত যার উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, তোমাদের এসব কর্মের কারণে যা তোমরা করছিলে।" (সূরা জুখরুফ)

আর তিনি ওই দিন জাহান্নামিদের বলবেন,

فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ.

"অতএব তোমরা শাস্তি ভোগ করতে থাকো ওইসব কর্মের কারণে যা তোমরা অর্জন করেছিলে। (সূরা আরাফ)

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন মানুষের আমলের ভিত্তিতে জান্নাত বা জাহান্নাম প্রদান করবেন। মানুষের তাকদিরের ভিত্তিতে জান্নাত বা জাহান্নামের ফয়সালা দেবেন না কারণ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনাদি জ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের সারা জীবনের আমল (কর্ম) সম্পর্কে অবগত আছেন, কে কোন্ সময় কি আমল করবে এবং কোন্ অবস্থায় কোথায় মারা যাবে। এই জ্ঞান অনুসারে তিনি মানুষের তাকদির নির্ধারিত করে রেখেছেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা বান্দার তাকদির লেখে বান্দাকে কোনো কাজের ওপর বাধ্য করেননি এবং বান্দার ইচ্ছা বা স্বাধীনতা বান্দা থেকে হরণ করেননি; বরং বান্দা তার কর্মের ওপর পূর্ণ ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করার শক্তি রাখে। অতএব তাকদির বা ভাগ্যের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা ঠিক নয়।

আল্লাহ তায়ালাই বান্দাকে ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রদান করেন

وَالْإِسْتِطَاعَةُ ضَرْبَانِ اَحَدُهُمَا اَلْإِسْتِطَاعَةُ الَّتِىْ يُوْجَدُ بِهَا الْفِعْلُ نَحْوُ التَّوْفِيْقُ الَّذِىْ لَا يَجُوْزُ اَنْ يُّوْصَفَ الْمَخْلُوْقُ بِهٖ فَهِىَ مَعَ الْفِعْلِ وَ اَمَّا الْاِسْتِطَاعَةُ الَّتِىْ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْوُسْعِ وَالتَّمَكُّنِ وَسَلَامَةُ الْاٰلَاتِ فَهِىَ قَبْلَ الْفِعْلِ وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ وَهُوَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

অনুবাদ : ইস্তেতায়াত– সামর্থ্য, ক্ষমতা দু' প্রকার। এর মধ্যে এক ওই সামর্থ্য বা ক্ষমতা, যার দ্বারা কার্য অনিবার্য রূপে সংঘটিত হয়। যা তাওফিকে এলাহীর অন্তর্ভুক্ত এবং যার দ্বারা কোনো মাখলুককে বিশেষিত করা যায় না, তা কার্যের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় যে ইস্তেতায়াত– সামর্থ্য সুস্থ, সাধ্য, সক্ষমতা এবং উপায়-উপকরণের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত, তা কার্য সংঘঠিত হওয়ার আগেই বিদ্যমান থাকে। এই শেষোক্ত প্রকার ইস্তেতায়াত– সামর্থ্যের সঙ্গেই আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ সংশ্লিষ্ট। এরই প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. (سورة بقره)

"আল্লাহ তায়ালা কাউকে তার সাধ্যের ঊর্ধ্বে দায়িত্ব দেন না।"

(সূরা বাকারাহ)

وَالْإِسْتِطَاعَةُ : শব্দের অর্থ, সামর্থ্য ক্ষমতা, শক্তি, হুকুম পালন। বান্দার ওপর কোনো আদেশ পালনের দায়িত্ব প্রদানের জন্য শর্ত হলো, বান্দার মধ্যে ওই আদেশ পালনের ইস্তেতায়াত– সামর্থ্য ও ক্ষমতা থাকা। কারণ বান্দার সামর্থ্য ও ক্ষমতার বাইরে কোনো কিছুর আদেশ দিয়ে তাকে কষ্ট দেয়া নিষিদ্ধ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ "আল্লাহ তায়ালা কাউকে তার সামর্থ্য ও সাধ্যের ঊর্ধ্বে কোনো কিছুর দায়িত্ব অর্পণ করেননি।"

اَلْاِسْتِطَاعَةُ ضَرْبَانِ اَحَدُهُمَا : সামর্থ্য দু' প্রকার। এর মধ্যে এক প্রকার বান্দার মধ্যে এই সামর্থ্য ক্ষমতা থাকা, যার সাহায্যে বান্দা কোনো কাজ করার সামর্থ্য রাখে এবং এর মাধ্যমে কাজ সংঘঠিত হয়। এই সামর্থ্য বিহীন কোনো কাজ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

وَمَا كَانُوْا لَايَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ.

"এসব লোক শোনার সামর্থ্য রাখে না এবং তারা দেখার ও সামর্থ্য রাখেনি। (সূরা হুদ)

ওপরযুক্ত আয়াতে শোনা বা দেখার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা অস্বীকার করা হয়নি; বরং দেখা বা শোনার প্রকৃত বা হাকিকী সামর্থ্য বা ক্ষমতার কথা অস্বীকার করা হয়েছে।

اِسْتِطَاعَة : সামর্থ্যের অর্থ হলো, কাজের আগে বান্দার মধ্যে সুস্থতা, সামর্থ্য, সাধ্য, ক্ষমতা এবং উপায়-উপকরণের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতা থাকা। যেহেতু এই সব কিছুর উপস্থিতির মাধ্যমে সামর্থ্য ও ক্ষমতার ভিত্তিতে আল্লাহর আদেশ নিষেধ বান্দার ওপর অর্পিত হয়। যেমন– আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً.

"আর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ করা ওই সব লোকের ওপর কর্তব্য, যারা এ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখেন।" এ সামর্থ্য হলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে, আসল অর্থ এর সঙ্গে আল্লাহর তাওফিক বা ইচ্ছা হওয়া। কারণ, আল্লাহর তাওফিক ব্যতীত কোনো কিছু সংগঠিত হয় না। অতএব বান্দার মধ্যে কাজ সম্পাদনের সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত হওয়ার পর যদি আল্লাহর তাওফিক এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তবেই কাজ সংঘঠিত হবে। নতুবা কোনো কাজ বান্দা থেকে সংঘঠিত হবে না।

আরেকটি اِسْتِطَاعَة-সামর্থ্য শুধু চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর সাহায্য ও তাওফিক। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

وَلٰكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ اُولٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً.

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। এটা আল্লাহর কৃপা ও নেয়ামত। (সূরা মুহাম্মদ)

এটাই লেখকের উল্লেখিত প্রথম ইস্তেতায়াত-সামর্থের দ্বারা উদ্দেশ্য। যার সাহায্যে কাজ সম্পাদন করা হয়।

পক্ষান্তরে মু'তাযেলা সম্প্রদায় এ ইস্তেতায়াতকে সাধারণভাবে সমগ্র সৃষ্টির জন্য সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ, এ ইস্তেতায়াত (তাওফিক) সব সৃষ্টিই রয়েছে। এটি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। লেখক (রহ.)

তাদের এ ভ্রান্ত আকিদাকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে বলেছেন,

اَلتَّوْفِيْقُ الَّذِىْ لَا يَجُوْزُ اَنْ يُّوْصَفَ الْمَخْلُوْقُ بِهٖ.

এ তাওফিক যার সঙ্গে কোনো মাখলুককে ভূষিত করা জায়িয নয়, এটা আল্লাহর ফজল বা এহছান। আর কাফিররা আল্লাহর ফজল ও এহছানের পাত্র নয়; সুতরাং কাফিররা আল্লাহর তাওফিক ও ফজল এহসান পাবে না। একারণে লেখক ইস্তেতায়াতকে মাশহুর দুভাবেই বিভক্ত করেছেন। আর তৃতীয় ইস্তে তায়াত সামর্থ্য লেখকের কথা اَلَّتِىْ يُوْجَدُ بِهَا الْفِعْلُ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে এবং এর দ্বারা মু'তাযিলা এবং কাদরিয়াদের কথা খণ্ডন করা হচ্ছে, যারা বলে বান্দার কাজের আগে ইস্তেতায়াত হয় না, কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কথা সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য। যেহেতু তারা বলেন, (১) কাজের আগে ইস্তেতায়াত হওয়ার অর্থ হলো, কাজের আগে সমস্ত সরঞ্জাম তৈরি হওয়া। যেমন সুস্থতা ও সাধ্য, ক্ষমতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু মজুদ থাকা। (২) ইস্তেতায়াত কাজের সঙ্গে হয়, এটা ক্ষমতার হাকিকত। (৩) ইস্তেতায়াত-তাওফিক, যা মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ, আর মুমিন বান্দাগণই তা পেয়ে থাকেন। কারণ অন্যরা এর পাত্র নয়।

বান্দার কাজ-কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্ট এবং বান্দার উপার্জন

وَاَفْعَالُ الْعِبَادِ هِىَ خَلْقُ اللّٰهِ وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللّٰهُ اِلَّامَا يُطِيْقُوْنَ وَلَا يُطِيْقُوْنَ اِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ وَهُوَتَفْسِيْرُ لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

অনুবাদ : বান্দাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি এবং তা বান্দার উপার্জন। আল্লাহ তায়ালা বান্দার সাধ্যের অধিক দায়িত্ব অর্পণ করেননি। আর তাদেরকে যে পরিমাণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তারা এটুকু ক্ষমতা রাখে। এটাই لَاحَوْلَ وَ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ-এর প্রকৃত ব্যাখ্যা।

وَاَفْعَالُ الْعِبَادُ هِىَ خَلْقُ اللّٰهِ : অর্থাৎ, বান্দা যেসব (ভালো-মন্দ) কাজ করে থাকে সবই আল্লাহর সৃষ্ট। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, وَاللّٰهُ

خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এবং যা কাজ-কর্ম তোমরা করো সবাইে সৃষ্টি করেছেন।

অন্য আয়াতে বলেছেন, اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْئٍ "আল্লাহ তায়ালাই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।"

আল্লাহ তায়ালা ভালো-মন্দ সব কিছু সৃষ্টি করে কোনো ধরনের ভুল-ক্রটি করেননি এবং এতে তাঁর কোনো দোষ হয়নি। কারণ ভালো-মন্দ সব কিছুই বান্দার পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যারা ভালো কাজের ওপর স্বীয় জীবন পরিচালনা করে নেকি উপার্জন করবে। তারা পরকালে পুরষ্কৃত হবে। পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজের ওপর জীবন পরিচালনা করে পাপ উপার্জন করবে তারা তিরষ্কৃত ও জাহান্নামি হবে।

وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ : অর্থাৎ, বান্দাদের থেকে যেসব ভালো-মন্দ কাজ-কর্ম হচ্ছে সবই তাদের বাস্তব উপার্জন। এ উপার্জনের ভিত্তিতেই তাদের জন্য সুখ-শান্তি তথা জান্নাত অথবা দুঃখ-কষ্ট তথা জাহান্নামের ফয়সালা হবে। যেমন আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ.

মানুষ নেকি (সেই ভালো কাজের জন্য) পাবে যা সে সেচ্ছায় উপার্জন করেছে এবং শাস্তি (সেই মন্দ কাজের কারণেই) পাবে যা সে সেচ্ছায় করেছে। (সূরা বাক্বারাহ)

অন্য আয়াতে বলেছেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا لِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا.

"যে সৎকর্ম করে সে নিজের জন্যই করে, আর যে অসৎ কর্ম করে তা তার ওপরই বর্তায়।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মানুষ সেচ্ছায় যেসব সৎকাজ করবে তার প্রতিদান পাবে, আর সে সেচ্ছায় যেসব অসৎ কাজ করবে তার শাস্তি ভোগ করবে। এটি হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণের আকিদা।

পক্ষান্তরে জাবরিয়ারা বলে, মাখলুক এবং মাখলুকের সমস্ত কাজ-কর্ম সবই আল্লাহর। এতে বান্দার কোনো হস্তক্ষেপ বা ইচ্ছা নেই। বান্দা উদ্ভিদ এবং পাথরের মতো অকেজো ও বাধ্য। সে সেচ্ছায় কোনো কিছু করতে পারে না।

এদের বিপরীত মু'তাজেলী ও কাদরিয়ারা বলে, বান্দার ইচ্ছাধীন কাজ-কর্মসমূহ বান্দার সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্ট হয়। আল্লাহর সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনদের মতামত হলো এই, আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু এমনকি বান্দার সমস্ত কাজ-কর্মসমূহের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। আর বান্দা হলো এর উপার্জনকারী। আর বান্দার উপার্জনের ভিত্তিতেই পরকালে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে। বান্দা সৎকর্মের মাধ্যমে নেকি উপার্জন করলে তার জন্য জান্নাতের ফয়সালা হবে। আর বান্দা অসৎ কর্মের মাধ্যমে গুনাহ উপার্জন করলে তার জন্যে জাহান্নামের ফয়সালা হবে।

وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللهُ اِلَّا مَا يُطِيْقُوْنَ : আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে এসব কাজ-কর্মের দায়িত্বভার দেন, তারা যতটুকু সামর্থ্য বা ক্ষমতা রাখে এবং তারা এসব কাজের সামর্থ্য রাখেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের যতটুকু দায়িত্বভার দেন। এটাই لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. এর তাফসির বা ব্যাখ্যা। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, لَايُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا আল্লাহ তায়ালা কাউকে তার সাধ্যের বহির্ভূত কোনো নির্দেশ দেননি। (সূরা বাকারাহ)

তাই মানুষের অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্তরে অনেক ভালো-মন্দ কল্পনা সৃষ্টি হয়, এসব কল্পনা-জল্পনার হিসাব নিকাশ নেয়া হবে না। যেহেতু এগুলো থেকে বেঁচে থাকা মানুষের সাধ্যের বাইরে। তবে সে যেসব কল্পনা কার্যে পরিণত করবে, সেগুলোর হিসাব নেয়া হবে। যেহেতু কার্যে পরিণত করা থেকে বেঁচে থাকা তাদের সাধ্যের বাইরে নয়। বরং তা তাদের সাধ্য ও ক্ষমতার ভেতরে।

আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কেউ গোনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না

نَقُوْلُ لَا حِيْلَةَ لِاَحَدٍ وَلَاحَوْلَ وَلَاحَرْكَةَ لِاَحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ اِلَّا بِمَعُوْنَةِ اللهِ وَلَا قُوَّةَ لِاَحَدٍ عَلَىٰ اِقَامَةِ طَاعَةِ اللهِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهَا اِلَّا بِتَوْفِيْقِ اللهِ.

অনুবাদ : আমরা বলি, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা কারো কোনো ফন্দি ও বাহানা এবং নড়া-চড়া করার কোনো শক্তি নেই। আর আল্লাহর তাওফিক ব্যতীত আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং এর ওপর অটল থাকার জন্যে কারো কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই।

نَقُوْلُ لَا حِيْلَةَ لِاَحَدٍ الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ এই আকিদা বা বিশ্বাস রাখেন, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো মানুষ তাঁর ফন্দি ও কৌশল এবং শক্তি বা ক্ষমতা নেই।

وَلَاقُوَّةَ لِاَحَدٍ عَلٰى اِقَامَةِ الخ : আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ এই আকিদা বা বিশ্বাস রাখেন, আল্লাহর তাওফিক ও অনুগ্রহ ব্যতীত কোনো মানুষ তাঁর আনুগত্য ও এবাদত করা এবং এর ওপর অটল থাকার কোনো শক্তি বা ক্ষমতা রাখে না। মুছান্নিফ (রহ.) ওপরযুক্ত আলোচনা দ্বারা কাদরিয়াদের কথা খণ্ডন করেছেন। কারণ তারা বান্দাকে তার কাজ-কর্মের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাশীল বলে আকিদা রাখে, অথচ এ আকিদা কোরআনের পরিপন্থী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

كُلًّا نُمِدُّ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا.

"আমি এদের এবং ওদের সবাইকে আপনার পালনকর্তার দান পৌঁছে দেই। আর আপনার পালনকর্তার দান বিরত রাখা যাবে না।"

সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছানুসারে সংঘটিত হয়

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِىْ بِمَشِيَّةِ اللهِ وَعِلْمِهٖ وَقَضَائِهٖ وَقَدْرِهٖ، فَغَلَبَتْ مَشِيَّتُهُ الْمَشِيْئَاتِ كُلَّهَا وَغَلَبَ قَضَائُهُ الْحِيَلَ كُلَّهَا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ اَحَدًا.

অনুবাদ : সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও জ্ঞান এবং তাঁর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারণ অনুসারেই চলছে। তাঁর ইচ্ছা সকল ইচ্ছার ওপরে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সমস্ত কলা-কৌশলের ঊর্ধ্বে প্রভাবশালী। আল্লাহ যা চান তাই করেন। আর তিনি কাউকে কোনো ধরনের অত্যাচার করেন না।

كُلُّ شَيْءٍ يَجْرِىْ بِمَشِيَّةِ اللهِ الخ : অর্থাৎ, সব কিছু আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত ও নির্ধারণ অনুসারে সংঘটিত ও পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো কিছু নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আগে করা হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহর সিদ্ধান্ত দু'প্রকার :

اَلْقَضَاءُ نَوْعَانِ–اَلْقَضَاءُ الْكَوْنِيُّ–وَالْقَضَاءُ الشَّرْعِيُّ.

(১) প্রকৃতিগত সিদ্ধান্ত (২) ধর্মীয় রীতিনীতিগত সিদ্ধান্ত।

اَمْرُ اللهِ تَعَالَىٰ نَوْعَانِ – اَلْاَمْرُ الْكَوْنِيُّ وَالْاَمْرُ الشَّرْعِيُّ.

আল্লাহর আদেশ দু'প্রকার : (১) প্রকৃতিগত আদেশ, যেমন আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন,

اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

তার কাজ হলো তিনি যখন কোনো বিষয়ে ইচ্ছা করেন, শুধু বলেন হও! হয়ে যায়।

(২) ধর্মীয় বিধি-বিধানগত আদেশ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

اِنَّ اللهَ يَاْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ.

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ন্যায় ও ইহসানের আদেশ দেন।"

اِذْنُ اللهِ نَوْعَانِ اَلْاِذْنُ الْكَوْنِيُّ وَالْاِذْنُ الشَّرْعِيُّ.

আল্লাহর অনুমতি প্রদান দু'প্রকার :

(১) প্রকৃতিগত অনুমতি, যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ.

(২) ধর্মীয় বিধি-বিধানগত অনুমতি, যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللهِ.

"তোমরা যেসব খেজুর গাছ কেটে দিয়েছোট এবং কতক না কেটে দিয়েছো, তা তো আল্লাহরই আদেশে।"

كِتَابُ اللهِ نَوْعَانِ اَلْكِتَابُ الْكَوْنِيُّ وَالْكِتَابُ الشَّرْعِيُّ.

আল্লাহর কেতাব (লেখনী) দু'প্রকার। (১) প্রকৃতিগত কেতাব-লেখনী, পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

وَمَايُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ اِلَّافِيْ كِتَابٍ.

(২) ধর্মীয় বিধি-বিধানগত কেতাব বা লেখনী। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

"আমি তাদের ওপর আবশ্যক করেছি, জানের বিনিময়ে জান।"

حُكْمِ اللهِ نَوْعَانِ – اَلْحُكْمُ الْكَوْنِيّ وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيّ.

আল্লাহর হুকুম দু' প্রকার (১) প্রকৃতিগত হুকুম, যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْ اَبِيْ اَوْيَحْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ.

(২) ধর্মীয় বিধি-বিধানগত হুকুম, যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَايُرِيْدُ تَحْرِيْمُ اللهِ نَوْعَانِ اَلتَّحْرِيْمُ الْكَوْنِيّ وَالتَّحْرِيْمُ الشَّرْعِيّ.

আল্লাহ তায়ালার তাহরিম বা হারাম করা দু'প্রকার।

(১) প্রকৃতিগত হারাম, যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ.

(২) ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে হারাম, যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ.

ওপরযুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা বলা যায়, বান্দার কাজ-কর্ম ও ইচ্ছাসমূহ আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা এবং তাঁর সিদ্ধান্ত ও হুকুম, অনুমতি সবই প্রকৃতিগত ও ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে হয়ে থাকে।

فَغَلَبَتْ مَشْيَتُهُ الْمَشِيْئَاتِ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা, সমস্ত মাখলুকের সব চিন্তা ও চাহিদার ওপর প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান। কারণ বান্দার ইচ্ছা বা চাহিদা এবং কোনো কিছু উপার্জনের এখতিয়ার রয়েছে, কিন্তু এগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ও এখতিয়ার ব্যতীত কার্যকরী হয় না এবং হবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَمَا تَشَاۤئُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاۤءَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

"তোমরা চাইতে পারবে না, জগৎ প্রভু আল্লাহ চাওয়া ব্যতীত।" (সূরা দাহর)

ওপরযুক্ত আয়াত এ কথা সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, বান্দা কোনো কিছু উপার্জন করার ইচ্ছা রাখে, তারা পাথর ও বৃক্ষের মতো একেবারে বাধ্য বা অনড় নয়। যেমনটি জাবরিয়ারা বলে। কিন্তু বান্দার ইচ্ছা ও চাওয়াটা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে থাকে।

وَغَلَبَ، قَضَائُهُ الْحِيَلَ كُلَّهَا অর্থাৎ, আল্লাহর সিদ্ধান্ত কোনো ধরনের কলা-কৌশল, ফন্দি ও বাহানা দ্বারা ফেরানো যায় না; বরং তাঁর ফয়সালা, সিদ্ধান্ত সবধরনের কলা-কৌশল ও ফন্দির ওপর বিজয়ী ও প্রভাবশালী হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ. আর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হুকুম ও সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাবশালী। সুতরাং কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারে না।

يَفْعَلُ اللّٰهُ مَايَشَاءُ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যা চান, তা-ই করেন। এতে কোনো ধরনের বাধা বিঘ্ন ঘটে না। কারণ তাঁর কাছে কেউ বাধা দেয়া তো দূরের কথা, কোনো অভিযোগ করার মতোও কেউ নেই। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, فَعَّالٌ لِّمَايُرِيْدُ "তিনি যা চান সবই করেন।" (সূরা বুরুজ)

وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ اَحَدًا : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোনো মাখলুককে সামান্যতম জুলুম বা অত্যাচার করেন না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ "আর আমি বান্দার ওপর অত্যাচারী নই।"

প্রশ্ন হতে পারে, এক বান্দা অন্য বান্দার ওপর এবং এক মাখলুক অন্য মাখলুকের ওপর জুলুম-অত্যাচার করে থাকে। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো সমস্ত মাখলুক এবং তাদের সব কাজ-কর্ম আল্লাহর সৃষ্ট। সুতরাং মাখলুকের পরস্পরের ওপর জুলুম-অত্যাচার করাটাও আল্লাহর মাখলুক। অতএব আল্লাহ তায়ালা জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত ও পবিত্র হন না। বরং এতে যুক্ত হয়ে যান। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদাকে কিভাবে ঠিক মানা যাবে?

প্রথমতঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মানুষের পরীক্ষার জন্য ভালো-মন্দ, দয়া-অনুগ্রহ, জুলুম-অত্যাচার সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু এসব সৃষ্টি করাটা তাঁর জন্য অন্যায় বা দূষণীয় নয়। যেমন একজন পরীক্ষকের জন্যে প্রশ্নপত্রের ভুল-শুদ্ধ নির্ণয়ের কলামে ভুল এবং শুদ্ধ উভয় কথা

একত্রিত করা অন্যায় বা দূষণীয় নয়। বরং যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মন্দ এবং অত্যাচারে লিপ্ত হবে তারাই অন্যায়কারী বা দোষী সাব্যস্ত হবে। যেহেতু তারা মন্দ ও জুলুম উপার্জন করেছে। যেমন পরীক্ষকের প্রশ্নপত্রের ভুল জবাব প্রদানকারীরা অন্যায় ও দোষী সাব্যস্ত হয়, পরীক্ষক দোষী হন না। কিন্তু জাব্‌রিয়ারা এ ব্যাপারে আল্লাহকে দোষী সাব্যস্ত করে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। আর কাদরিয়ারা বান্দাকে এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্ত করে আরেক বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। কারণ, তাদের এ আকিদার পক্ষে কোরআন-সুন্নায় কোনো সঠিক প্রমাণ নেই।

দ্বিতীয়তঃ আসল জবাব হচ্ছে, আসমান, যমীন, গ্রহ, নক্ষত্র তথা সমগ্র জাহানের মালিক এক আল্লাহ, এতে কোনো মাখলুক শরিক নেই। আর জুলুম বলা হয় অন্যের মালিকানায় না-হক হস্তক্ষেপ করাকে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা যা কিছু করেন সবই তাঁর মালিকানায় করেন। এতে কারো কোনো ধরনের মালিকানা বা অধিকার নেই। সেহেতু আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর কোনো কাজের কারণে দোষী বা অন্যায়কারী প্রমাণ করা বা অন্যায় ও জুলুমকারী বলে আকিদা রাখা কোনোক্রমেই ঠিক হবে না।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র এবং নির্দোষ

تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سُوْءٍ وَحِيْنٍ، وَتَنَــزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ لَايُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ.

অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালা সকল প্রকার অমঙ্গল ও বিপদাপদ থেকে পবিত্র এবং সকল কলুষ-কালিমা থেকে মুক্ত। তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না, অন্য সবাইকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা আম্বিয়া)

تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سُوْءٍ الخ : অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তার ওপর কোনো ধরনের অমঙ্গল ও বিপদাপদ আসে না, তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না, অন্য সবাইকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা আম্বিয়া)

تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سُوْءٍ الخ : অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তার ওপর কোনো ধরনের অমঙ্গল ও বিপদাপদ আসে না, তিনি এসবের ঊর্ধ্বে। যেহেতু এসব তাঁর পক্ষে

থেকে মাখলুকের ওপর আসে এবং এগুলো মাখলুকের বিশেষত্ব আর আল্লাহর সত্তা মাখলুকের বিশেষত্ব থেকে পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে অমঙ্গল ও বিপদাপদ স্পর্শ করতে পারে না।

تَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ : অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা সব ধরনের দোষ, কলুষ-কালিমা মুক্ত। কারণ মানুষ তখন দোষী ও কালিমাযুক্ত হয়, যখন তার থেকে সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী কোনো কথা বা কাজ প্রকাশ পায়। আর আল্লাহর কোনো কাজ বা কথা সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী নয়। তাই তিনি সব ধরনের দোষ-কলুষমুক্ত ও পবিত্র।

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ : অর্থাৎ, আল্লাহর কোনো কথা বা কাজের ওপর কেউ কোনো ধরনের প্রশ্ন বা অভিযোগ করতে পারে না। যেহেতু আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেকটি কথা এবং কাজ ন্যায়বিচার, সত্য ও সঠিক হয়ে থাকে, সেহেতু তাঁর কোনো কথা বা কাজের ওপর কোনো প্রকার প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদের কোনো অবকাশ নেই।

পক্ষান্তরে সমগ্র মানবজাতি তাদের কথা ও কাজসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে এবং আল্লাহর কাজে জবাবদিহি করতে হবে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

لَايُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ

"তিনি যা করেন তা সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।"

দোয়া সম্পর্কে আকিদা

وَفِيْ دُعَاءِ الْاَحْيَاءِ وَصَدَقَتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْاَمْوَاتِ. وَاللّٰهُ تَعَالٰى يَسْتَجِيْبُ الدَّعَوَاتِ وَيَقْضِى الْحَاجَاتِ.

অনুবাদ : আর জীবিত লোকদের দোয়া এবং তাদের ছদকার মধ্যে মৃত লোকদের উপকার রয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা (বান্দাদের) দোয়া কবুল করেন এবং (তাদের) হাজাত বা প্রয়োজনসমূহ পূরণ করেন।

وَفِيْ دُعَاءِ الْاَحْيَاءِ وَصَدَقَتِهِمْ الخ : **অর্থাৎ**, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ এই আকিদা বা বিশ্বাস রাখেন, জীবিত লোকদের

দোয়া এবং ছদকায় মৃত লোকদের জন্য উপকার রয়েছে। যদি এগুলো শরিয়ত সম্মত বিধি-বিধান মুতাবেক হয়। যেমন– আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে জীবিত লোকেরা মৃত মুমিনদের জন্য দোয়া করার ব্যাপারে বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলেন, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদের ক্ষমা করো এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো ধরনের বিদ্বেষ রেখো না।"

মৃত মুসলমানদের জন্য দোয়া করার ব্যাপারে কোরআন-হাদিসে অনেক নির্দেশ রয়েছে। যেমন মৃত ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়া, আর দাফনের সময়ে দোয়া করা এবং কবর যেয়ারতের দোয়া করা। এতে মৃত ব্যক্তি খুবই উপকৃত হন। যেমন মুসলিম শরিফে একটি হাদিস বর্ণিত রয়েছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَامِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ اِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ. (رواه مسلم)

"এমন কোনো মৃত ব্যক্তি নেই যার জানাযার নামাজ এমন এক দল মুসলমান পড়েন, যার সংখ্যা একশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারা সবাই তার জন্য (আল্লাহর কাছে) সুপারিশ করতে থাকেন। আর তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে। এভাবে যদি জীবিত লোকেরা মৃত লোকদের ইসালে ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে ছদকা-খয়রাত করেন, তাহলে মৃত ব্যক্তির অনেক উপকার হয়। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরিফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে,

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ اِنَّ اُمِّيْ اُفْتُلِتَتْ وَاَظُنُّهَالَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا اَجْرٌاِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

"হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, জনৈক পুরুষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন, আমার ধারণা হচ্ছে, যদি তিনি কথা বলতে পারতেন, তাহলে (আল্লাহর পথে) তিনি সদকা করতেন। অতএব আমি যদি তার পক্ষ থেকে ছদকা করি, তবে কি তিনি নেকি পাবেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তিনি নেকি পাবেন। ওপরযুক্ত হাদিস এবং আরো অনেক হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, জীবিত লোকেরা মৃত

ব্যক্তির জন্য দোয়া করলে এবং মাল ছদকা-খয়রাত করলে, মৃত ব্যক্তির অনেক উপকার হয় এবং নেকি পেতে থাকে।

পক্ষান্তরে মু'তাযেলারা একে অস্বীকার করে বলে, জীবিত ব্যক্তিরা মৃতদের জন্য দোয়া এবং ছদকা-খয়রাত করলে মৃত ব্যক্তির কোনো উপকার হয় না।

وَاللّٰهُ يَسْتَجِيْبُ الدَّعْوَاتِ الخ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সব বান্দার দোয়া কবুল করেন এবং তাদের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করেন। তাই তিনি নিজ বান্দদের সম্বোধন করে বলেছেন,

قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ. (سورة مؤمن)

"তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো। (দোয়া কর) আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। অন্য আয়াতে বলেছেন,

فَاِذَا سَئَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ.

"আমার বান্দা যখন তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, নিশ্চয় আমি কাছে। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি যখনই সে প্রার্থনা করে।" (সূরা বাকারা)

অন্য আয়াতে বলেছেন,

فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَاهُمْ يُشْرِكُوْنَ. (سوره روم)

"তারা যখন জাহাজে আরোহণ করে, তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদের স্থলে এনে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরিক করতে থাকে।" (সূরা রুম)

ওপরোল্লেখিত প্রথম দু'আয়াত প্রমাণ দিচ্ছে, মুমিনগণের দোয়া কবুল হয় এবং শেষ আয়াতটি প্রমাণ দিচ্ছে, যখন কাফিররা নিজেকে অসহায় মনে করে তখন আল্লাহকেই ডাকে এবং বিশ্বাস করে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ এ বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করতে পারবে না, তখন আল্লাহ কাফিরদের দোয়া কবুল করে নেন। (মাআরিফুল কোরআন)

আল্লাহ্ তায়ালা সব কিছুর মালিক, তাঁর মালিক কোনো কিছু নয়

وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ وَلَا غِنَىً عَنِ اللهِ تَعَالٰى طَرْفَةَ عَيْنٍ مَنِ اسْتَغْنٰى عَنِ اللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ وَكَانَ مِنْ اَهْلِ الْحَيْنِ.

অনুবাদ : আল্লাহ্ তায়ালা সব কিছুর মালিক। তাঁর মালিক কেউ (কোনো কিছু) হতে পারে না। এক পলকের জন্যও কারো পক্ষে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি অমুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব নয়। আর যে কেউ এক পলকের (মুহূর্তের) জন্য আল্লাহ্ তায়ালার অমুখাপেক্ষী হবে সে কাফির হয়ে যাবে এবং ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَّلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ الخ. অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালা সবকিছুর মালিক, পক্ষান্তরে তাঁর মালিক কোনো কিছু নয়, যেমন আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"সমস্ত আসমান ও জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর আধিপত্য আল্লাহ্রই। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"

অন্য আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন,

قُلْ لِمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِّلّٰهِ.

"তুমি জিজ্ঞেস করো, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তার মালিক কে? তুমি বলে দাও, (মালিক) আল্লাহ্।

ওপরযুক্ত আয়াতে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এতদুভয়ে যা আছে তার মালিক কে? অতঃপর আল্লাহ্ নিজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাচনিক উত্তর দিয়েছেন সব কিছুর মালিক আল্লাহ্। কাফিরদের উত্তরের অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেই উত্তর দেয়ার কারণ হচ্ছে, এ উত্তর কাফিরদের কাছেও স্বীকৃত। তারা যদিও শিরক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হয়, তথাপি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে এবং সব কিছুর মালিক আল্লাহ্ তায়ালাকেই মানতো। (মাআরিফ)

وَلَا غِنَىً عَنِ اللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ الخ : অর্থাৎ, কোনো সৃষ্টির জন্য এক মুহূর্ত বা এক পলক আল্লাহর রহমত থেকে অমুখাপেক্ষী বা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার

কোনো উপায় নেই এবং জায়িয নয়। যেহেতু সমস্ত সৃষ্টির অস্থিত্ব ও স্থায়িত্ব, জীবন ও মৃত্যু, রিযিক, উপার্জন, চলা-ফেরা, উঠা-বসা তথা তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। মোটকথা সমগ্র মাখলূক 'মুহতাজে মুতলাক' সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। অতএব সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী মাখলূকের জন্য এক পলক বা মুহূর্ত ও আত্মনির্ভরশীল বা অমুখাপেক্ষী হওয়ার কোনো উপায় নেই এবং তা জায়িয বা বৈধ নয়। সুতরাং যে আল্লাহ তায়ালা থেকে এক মুহূর্ত অমুখাপেক্ষী বা আত্মনির্ভরশীল হবে, তারা কাফির হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ.

"হে মানব জাতি, তোমরা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আল্লাহ তিনিই অমুখাপেক্ষী– অভাবমুক্ত অধিক প্রশংসিত।" তাই যে ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীল, অমুখাপেক্ষিতা কথা বা কাজে প্রকাশ করবে, আর অস্তিত্ব দানকারী এবং ধ্বংসকারী আল্লাহ নন এবং সে এসব ব্যাপারে আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয়। আর এ ধরনের আকিদা পোষণকারী লোক নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তায়ালার ক্রোধ এবং সন্তুষ্টি সম্পর্কে আকিদা

وَاللهُ يَغْضَبُ وَيَرْضٰى لَا كَاَحَدٍ مِّنَ الْوَرٰى.

অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালা ক্রুদ্ধ হন এবং সন্তুষ্টিও হন, তবে তা বিশ্ব-জগতের কারো মতো নয়।

وَاللهُ يَغْضَبُ : আল্লাহ তায়ালা তাঁর নাফরমান বান্দাদের ওপর ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হন। তবে তাঁর এই ক্রুদ্ধ হওয়াটা বিশ্ব-জগতের কোনো মাখলূকের মতো নয়। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ.

"আমি কি তোমাদের বলে দেবো? তাদের মধ্যে কারা আল্লাহর কাছে প্রতিফল প্রাপ্ত অনুসারে মন্দ, যাদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি (রাগ করেছেন) ক্রুদ্ধ হয়েছেন, যাদের কতেককে বানর, শূকর বানিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে।" (সূরা মায়েদা)

ওপরযুক্ত আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হন।

ويرضى : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর পুণ্যবান বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও খুশি হন। যেমন আল্লাহ তায়ালা সাহাবা (রা.)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মুমিনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করলো।" (সূরা ফাতহ)

অন্য আয়াতে বলেছেন :

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

"আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।"

ওপরযুক্ত আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। অতএব ওপরোল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এই আকিদা পোষণ করেন, আল্লাহ তায়ালা ক্রুদ্ধ ও সন্তুষ্ট হন এবং পবিত্র কোরআন ও হাদিসে আল্লাহ তায়ালার যেসব গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এই সবই হাকীকি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। রূপক অর্থে নয়। সুতরাং এসব গুণাবলীতে এমন তাবিল (ব্যাখ্যা) জায়েয বা বৈধ হবে না, যা এ সবের হাকীকি অর্থ থেকে সরে যায়, অথবা আল্লাহ তায়ালার শানের পরিপন্থী হয়। যদিও অনেক গুণাবলী শাব্দিক দিক দিয়ে আল্লাহ এবং বান্দাদের সঙ্গে সমানভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেমন اَلرِّضٰى সন্তুষ্ট হওয়া, اَلْغَضَبُ অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হওয়া, اَلْحُبُّ ভালোবাসা, اَلْبُغْضُ বিদ্বেষ রাখা, اَلْعَدَاوَةُ শত্রুতা রাখা ইত্যাদি। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে এসব শব্দের ব্যবহারে অনেক ব্যবধান রয়েছে। তাই ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) বলেছেন, لَا كَاَحَدٍ مِنَ الْوَرٰى আল্লাহর ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হওয়া এবং খুশি ও সন্তুষ্টি কোনো মাখলূকের মতো নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা দেখেন ও শোনেন এবং মাখলূকেরাও দেখে ও শোনে। কিন্তু আল্লাহর দেখা ও শোনাটা মাখলূকের দেখা ও শোনার মতো নয়। তেমন আল্লাহর সন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন এবং মাখলূকেরাও সন্তুষ্ট ও ক্রদ্ধ হয়। তবে আল্লাহর সন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন এবং মাখলুকের সন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হওয়ার মতো নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

"কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ বা মতো নয়। তিনি সব কিছু শোনেন ও দেখেন।"

অতএব আল্লাহর গুণাবলীর সঙ্গে কোনো মাখলুকের কোনো ধরনের তুলনা চলে না।

সাহাবা (রা.) সম্পর্কে আলোচনা

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা রাখা সম্পর্কে আকিদা

وَنُحِبُّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُفْرِطُ فِىْ حُبِّ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّاُ مِنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ، وَنُبْغِضُ مَنْ يُّبْغِضُهُمْ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ.

অনুবাদ : আর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণকে ভালোবাসি। তবে তাঁদের কারো সঙ্গে ভালোবাসার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করি না এবং তাঁদের কারো সঙ্গে আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করি না। যে লোক তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাঁদের কটাক্ষ বা সমালোচনা করে, আমরা তাকে ঘৃণা করি।

وَنُحِبُّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়ার জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সাহাবিগণ (রা.)কে ভালোবাসেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে ভালোবাসেন এবং তাঁরাও আল্লাহকে ভালোবাসেন। যেমন পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে বলেছেন,

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

"তিনি (আল্লাহ) তাঁদেরকে ভালোবাসেন তাঁরাও তাঁকে ভালোবাসেন। তাঁরা মুমিনের প্রতি বিনয়ী নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে।" (সূরা মায়েদা)

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবি (রা.) গণের ভালোবাসা সম্পর্কে বলেছেন, مَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ "যে তাদের ভালোবাসবে (মহব্বত করবে) সে আমাকে ভালোবাসার কারণেই তাদের ভালোবাসবে।

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রা.)কে ভালোবাসেন। সেহেতু তাঁদের প্রতি ভালোবাসা রাখা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য। নতুবা কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারে না।

وَلَا نُفْرِطُ فِيْ حُبِّ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ.

অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ সাহাবা (রা.)-এর মধ্যে কারো মহব্বত বা ভালোবাসার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেন না। এবং তাঁদের কারো থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। যেহেতু সাহাবা (রা.) গণকে ভালোবাসা দীনের বিশেষ অংশ আর দীনের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ "তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা সীমা লঙ্ঘন করো না।"(সূরা মায়েদা)

অতএব, যারা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ভালোবাসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা সীমা লঙ্ঘন করবে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ হয়ে যাবে। যেমন রাওয়াফিজ, শিয়ারা আহলে বায়াত বিশেষতঃ হযরত আলী (রা.) ও ফাতিমা ও হাসান এবং হোসাইন (রা.)-এর মহব্বত বা ভালোবাসার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করে তাঁদেরকে নবী (আ.)গণের মতো মাসুম-নিষ্পাপ বলে আকিদা রাখে এবং অন্যান্য সব সাহাবি (রা.) গণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে হেয়প্রতিপন্ন করেছে সেহেতু তারা খাঁটি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

পক্ষান্তরে খাওয়ারিজরা আহলে বায়াত বিশেষতঃ হযরত আলী (রা.) ও ফাতিমা (রা.) এবং হাসান ও হোসাইন (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ ও ক্রোধের কারণে তাঁদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাঁরা তাঁদের ওপর নানা অহেতুক অপবাদ দিয়ে সীমা লঙ্ঘন করে খাঁটি মুসলমানদের থেকে খারিজ হয়ে গেছে। তাই হযরত আলী (রা.) উভয় দল সম্পর্কে বলেছেন,

لَيَهْلَكَ فِيَّ رَجُلَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يُفَرِّطُنِيْ بِمَا لَيْسَ فِيَّ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهٗ شَنَآنِيْ عَلٰى اَنْ يَبْهَتَنِيْ.

"নিশ্চয় আমার সম্পর্কে মন্তব্য করে দু'জন লোক ধ্বংস হয়ে যাবে। (১) আমার ভালোবাসার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘনকারী, যে আমার এমন প্রশংসা করে যা আমার মধ্যে নেই। (২) আমার প্রতি এমন বিদ্বেষ পোষণকারী, যে হিংসা-বিদ্বেষের কারণে আমার ওপর অহেতুক অপবাদ আরোপ করার প্রতি তাদের উত্তেজিত করে তুলে, বিধায় সে এতে কোনো দ্বিধা বোধ করে না।

ওপরযুক্ত উভয় দলই পথভ্রষ্ট, খাঁটি মুসলমান থেকে খারিজ। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ সব সাহাবি (রা.)গণকে সমানভাবে ভালোবাসেন এবং তাঁদের সঙ্গে সমভাবে সম্পর্ক রাখেন। বিশেষ কোনো সাহাবি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন না। যেহেতু সাহাবি (রা.) গণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি হওয়ার ব্যাপারে সবাই সমান। যদিও মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে।

وَنُبْغِضُ مَنْ يُّبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ এসব লোকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন ও ঘৃণা রাখেন, যারা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রতি বিশেষ পোষণ করে বা ঘৃণা রাখে এবং তাঁদেরকে কটাক্ষ বা সমালোচনা করে। কারণ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে সাহাবায়ে কেরামের (রা.) মর্যাদা ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে তাঁদের প্রতি স্বীয় ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি ঘোষণা করে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন, পবিত্র কোরআনে বলেছেন, يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ "তিনি তাদের ভালোবাসেন, তারাও তাকে ভালোবাসেন। অন্য আয়াতে বলেছেন,

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا. (سورة توبة)

"আল্লাহ তায়ালা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। আর তিনি তাদের জন্য এমন কাননকুঞ্জ প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। (সূরা তাওবা)

আর হাদিস শরিফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবি (রা.)গণের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন,

اَللّٰهَ اللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْا هُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِيْ وَمَنْ اٰذَانِيْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ يُوْشِكُ اَنْ يُّعَاقِبَهُمْ (رواه الترمذى)

"আমার সাহাবিগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, আমার সাহাবাগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, আমার (ইন্তেকালের) পর তাঁদেরকে সমালোচনা ও দোষ চর্চার লক্ষ্যবস্তু বানাবে না। সুতরাং যে তাঁদের ভালোবাসবে সে আমাকে ভালোবাসার কারণেই তাঁদের ভালোবাসবে। আর যে তাঁদের প্রতি ক্রোধ বা

বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে তা করলো, যে তাদের কষ্ট দিলো সে যেনো আমাকে কষ্ট দিলো। আর যে আমাকে কষ্ট দিলো সে যেনো আল্লাহকে কষ্ট দিলো। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দেবে, আল্লাহ তায়ালা অতিসত্বর তাকে তায়ালাড়াও করবেন। (তিরমিযী শরিফ)

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণকে ভালোবাসেন এবং তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁদের ভালোবাসেন এবং তিনি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। অতএব প্রমাণিত হয়ে গেলো, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি (রা.)গণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও সন্তো-ষভাজন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। সুতরাং যারা আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় পাত্র ও সন্তেষভাজন ব্যক্তিবর্গ সাহাবিগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ, কটাক্ষ বা সমালোচা করবে, তারা পরোক্ষ ভাবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো। আর তাদের কটাক্ষ ও সমালোচনা করলো। আর যারা পরোক্ষভাবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং প্রত্যক্ষভাবে সাহাবি (রা.) গণের প্রতি বিদ্বেষ, কটাক্ষ বা সমালোচনা করবে। তাদের প্রতি সত্যিকারের মুমিনগণের বিদ্বেষ পোষণ করা ঈমানী কর্তব্য। কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসে আর আল্লাহর জন্যে কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আর আল্লাহর জন্যে দান করে এবং আল্লাহর জন্যে বিরত রাখে, নিশ্চয় সে ঈমান পরিপূর্ণ করে নিয়েছে। (আবু দাউদ)

ওপরযুক্ত হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আল্লাহর প্রিয়পাত্র ও সন্তোষভাজন ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা সত্যিকারের মুমিনের ঈমানী কর্তব্য। আর যখন রাওয়াফিজ, শিয়ারা আহলে বাইত বিশেষতঃ হযরত আলী (রা.) ও ফাতেমা (রা.), হাসান ও হুসাইন (রা.) ব্যতীত সমস্ত সাহাবি (রা.) গণের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে অভিশাপ দিয়ে থাকে এবং বলে, কোনো মানুষ আহলে বাইতের মহব্বতকারী হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আবু বকর ও উমর (রা.)-এর প্রতি বিষণ্ন বা ক্রোধান্বিত না হবে কিংবা অভিশাপ না দেবে।

এদের বিপরীত খাওয়ারিজরা বলে, কোনো মানুষ আবু বকর ও উমর (রা.)কে মুহব্বতকারী হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আলী ও উসমান (রা.) তথা সমস্ত আহলে বাইতের প্রতি বিষণ্ন বা ক্রোধান্বিত না হবে, অভিশাপ না দেবে। তাদের মতে এদেরকে কাত্‌ল করা ওয়াজিব। অথচ উভয় দলই পথভ্রষ্ট। সত্যিকারের মুসলমান থেকে পৃথক।

তখন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানদের জন্য ঈমান কর্তব্য হলো, উভয় দলের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা রাখা। কারো সঙ্গে কোনো ধরনের ভালোবাসা না রাখা।

সাহাবিগণের সঙ্গে ভালোবাসা রাখা কর্তব্য

وَلَانَذْكُرُ هُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِيْنٌ وَاِيْمَانٌ وَاِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ.

অনুবাদ : আমরা তাদের শুধু মঙ্গলের সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁদের প্রতি ভালোবাসা, দীন ঈমান ও ইহসান (এর লক্ষণ) এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফুরী, মুনাফেকী এবং সীমা লঙ্ঘন (এর পরিচয় বহন করে)।

وَلَانَذْكُرُ هُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনরা সব সাহাবি (রা.) গণের গুণ ও প্রশংসা ব্যতীত কোনো কিছু আলোচনা করেননি। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সাহাবি (রা.) গণের অন্তরকে তাকওয়ার জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিয়েছেন, যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى.

“এরা এসব লোক যাদের অন্তরসমূহকে তাকওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই করে নিয়েছেন।

অতঃপর অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا.

তাঁদের জন্য আল্লাহ ভীতি ও পরহেযগারীর বাক্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন আর তাঁরাই এর অধিক উপযোগী ও যোগ্য ছিলেন।

আর আল্লাহ তায়ালা যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের জন্য তাকওয়ার বাক্য অপরিহার্য করে এ ঘোষণা দিয়েছেন, তারাই এর অধিক উপযোগী ও যোগ্য। তাঁদের গুণ ও প্রশংসা ব্যতীত অন্য কোনো কিছু আলোচনা করা ঠিক হবে না। কারণ তাঁদের মন্দ আলোচনা, দোষ চর্চা করা একথা বোঝায়, তাদের আল্লাহ তায়ালার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং তাকওয়ার বাক্য অপরিহার্য করা এবং এর অধিক উপযোগী বলা ঠিক হয়নি। আর আল্লাহর কোনো কথা বা কাজকে অধিক বলার অধিকার কোনো মানুষের নেই। সুতরাং সাহাবি (রা.) গণের গুণ ব্যতীত কোনো কিছু আলোচনা করা বৈধ নয়। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَكْرِمُوْا اَصْحَابِىْ فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ

"তোমরা আমার সাহাবি (রা.)দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, কারণ তারা তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক। (নাছায়ী শরিফ)

আর একথা সর্বজন স্বীকৃত, মানুষের গুণ ও প্রশংসা প্রকাশের মাধ্যমেই তাঁর সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অতএব সত্যিকারের মুমিনগণের জন্য কতব্য হলো, সাহাবায়ে কেরামের (রা.) গুণ ও প্রশংসা প্রকাশ করা।

وَحُبُّهُمْ دِيْنٌ وَاِيْمَانٌ وَاِحْسَانٌ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনরা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা রাখাকে দীন ও ঈমান এবং ইহছানের অংশ ও লক্ষণ বলে আকিদা রাখেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াতে এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগণিত হাদিসে সাহাবায়ে কেরামের অনেক ফজিলত মর্যাদা বা বর্ণনা করেছেন। এগুলোর প্রতি ঈমান রাখা এবং এগুলোকে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে ভালোবাসেন, তাঁরাও আল্লাহকে ভালোবাসে। অন্য আয়াতে বলেছেন,

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

"আল্লাহ তায়ালা সাহাবি (রা.) গণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা রাখা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা রাখার পরিচয় বা লক্ষণ। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ : "অতএব যে ব্যক্তি সাহাবি (রা.)গণকে ভালোবাসে আমাকে ভালোবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালোবাসে।(তিরমিযী শরিফ)

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে একথা প্রমাণিত হয়ে গেলো, আল্লাহ তায়ালা এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবি (রা.)দের ভালোবাসেন। আল্লাহ তায়ালা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে ভালোবাসেন, তাঁদের প্রতি মুমিনের ভালোবাসা থাকা তাঁদের ঈমানী কর্তব্য। অতএব একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা রাখা সত্যিকারের মুমিনের দীন, ঈমান ও ইহছানের পরিচয় বা লক্ষণ বহন করে।

وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ এ আকিদা পোষণ করেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ পোষণ করা কুফুরী, নেফাকী এবং সীমা লঙ্ঘনের পরিচয় বহন করে। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সব আয়াত ও হাদিসসমূহকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা এবং সাহাবি (রা.)দের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার বিশ্বাসী হওয়া এবং তাঁদের অন্তর দিয়ে ভালোবাসা আর তাঁদের গুণাবলী প্রচার করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য। তবে যারা এসব আয়াতে কোরআনী ও হাদিসে নববিতে বিশ্বাসী না হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা না রাখে; বরং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ ক্রোধ পোষণ করে এবং তাঁদের সম্পর্কে নানা অপপ্রচার করে বেড়ায়, নিশ্চয় তাদের একাজ কুফুরী, নেফাকি এবং সীমা লঙ্ঘনের পরিচয় ও লক্ষণ বহন করে। সুতরাং তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানদের জামাআত থেকে খারিজ বহির্ভূত। তাদের সত্যিকারের মুসলমানদের মধ্য গণ্য করা যায় না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সত্যের পয়গাম এবং সত্যের সন্ধান বইদ্বয় পড়ার অনুরোধ রইলো।

খেলাফত সম্পর্কে আকিদা

সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)

وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلًا لِاَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَفْضِيْلًا لَهُ وَتَقْدِيْمًا عَلٰى جَمِيْعِ الْاُمَّةِ.

অনুবাদ : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফত প্রতিষ্ঠা স্বীকার করি, তিনি সমগ্র উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও শীর্ষ স্থানীয় হওয়ার কারণে।

وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ص الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বপ্রথম ও প্রধান খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কেই স্বীকার করেন। যেহেতু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সমস্ত উম্মতের ওপর কোরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا.

যখন তাঁকে (নবীকে) কাফিররা বহিষ্কার করেছিলো, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষণ্ন হয়ো না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" (সূরা তাওবা)

এ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফর সঙ্গী একমাত্র আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ই ছিলেন। যেহেতু সমস্ত মুফাসসেরিনের রায় হলো এই, এ আয়াতে একমাত্র নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীকই উদ্দেশ্য, যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কে সম্বোধন করে বলেছেন :

اَنْتَ صَاحِبِيْ فِي الْغَارِ وَصَاحِبِيْ عَلَى الْحَوْضِ. (ترمذى)

"গর্তে তুমি আমার সঙ্গী ছিলে, আর হাওজে কাউছারে আমার সঙ্গী থাকবে।" (তিরমিযী শরিফ)

অন্য হাদিসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এক সময় আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

اَمَا اَنَكَ يَا اَبَابَكْرٍ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ (ابو داود)

"হে আবু বকর জেনে রেখো আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আবু দাউদ শরিফ)

অন্য হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّىْ لاَ تَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ خَلِيْلاً.

"আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম।"

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ই ছিলেন। সুতরাং তাঁকে সর্বপ্রথম খলিফা নিযুক্ত করা উচিত। তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ই ছিলেন। সুতরাং তাঁকে সর্ব প্রথম খলিফা নিযুক্ত করা উচিত। তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কেই সর্বপ্রথম খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। অতএব সত্যিকারের প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য হলো, নির্দ্বিধায়, সম্মান ও মহব্বতের সঙ্গে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কে সর্বপ্রথম ও প্রধান খলিফা হিসেবে গ্রহণ করা এবং আন্ত রিকভাবে মেনে নেয়া।

الخلافة। : খেলাফত দু'প্রকার। (১) বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর খেলাফত, এই খেলাফত আল্লাহর নবী (আ.)গণের জন্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর সর্বপ্রথম খলিফা হলেন তাঁর নবী-রাসূলগণ। আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)-এর খেলাফত সম্পর্কে বলেছেন,

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً. (سورة بقرة)

"নিশ্চয় আমি যমীনে আমার খলিফা সৃষ্টি করবো।"

এবং দাউদ (আ.)-এর খেলাফত সম্পর্কে বলেছেন,

يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ. (سورة ص)

"হে দাউদ (আ.) আমি তোমাকে যমীনে খলিফা বানিয়েছি।"

আর হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর খেলাফত সম্পর্কে বলেছেন,

إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. (سورة بقرة)

"নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম-খলিফা বানাবো।" (সূরা বাকারাহ)

আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ খলিফা, কেয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্র সৃষ্টির আনুগত্যের পাত্র ও অনুসরণীয় সত্তা, যার আনুগত্য করা আল্লাহর আনুগত্য এবং যার কাছে আত্মসমর্পণ করাকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন- পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ.

"যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করলো, সে যেনো আল্লাহর আনুগত্য করলো।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ.

"নিশ্চয় যারা আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করবে তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলো।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত, সব নবী (আ.) গণই আল্লাহর খলিফা ছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ খলিফা ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ খেলাফত হলো নবী (আ.) গণের পুণ্যবান উত্তরাধিকারীগণের জন্য নবী (আ.) গণের উম্মতের মধ্যে। এই খেলাফত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

"আল্লাহ তায়ালা ওই সব লোকের সঙ্গে ওয়াদা দিচ্ছেন, যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, নিশ্চয় তাদের যমীনে খেলাফত প্রদান করবেন। যেমন তাদের পূর্ববতীদেরকে প্রদান করেছিলেন।" (সূরা নূর)

ওপরযুক্ত আয়াতের كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ. (যেমন তাদের পূর্ববতীদের খেলাফত প্রদান করেছিলেন) যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের পূর্ববর্তী নবী (আ.) উত্তরাধিকারীদর মধ্যে নবীগণের খেলাফত প্রতীয়মান হয়, পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত এর ওপর সাক্ষ্য দিচ্ছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা নূহ (আ.)-এর উত্তরাধিকারীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন, وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ আর আমি তোমাদের খলিফা বানিয়েছি।

আর হুদ (আ.)-এর উত্তরাধিকারীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন,

إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ

"যখন তোমাদের নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের পর খলিফা বানালেন।

আর ছালেহ (আ.)-এর উত্তরাধিকারীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন,

إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ عَادٍ

"যখন তোমাদেরকে তাদের পর খলিফা বানালেন।"

এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁর খেলাফত স্থানান্তরিত হয়ে খোলাফায়ে রাশেদিনের কাছে আসে। পরিশেষে এ খেলাফত স্থানান্তরিত হয়ে এই উম্মতের সর্বশেষ ব্যক্তি ইমাম মাহদীর কাছে আসবে।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)

ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ عَنْهُ وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ وَالْأَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّوْنَ.

অনুবাদ : অতঃপর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর খেলাফত, অতঃপর হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফত, অতঃপর হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফত স্বীকার করি।

ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে রাসূল (রা.)-এর দ্বিতীয় খলিফা স্বীকার করে এবং মান্য করে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর সম্পর্কে বলেছেন,

لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ.

"আমার পরে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নবী আসার হতো, তবে নিশ্চয় উমরই নবী হতেন।" (তিরমিযী শরিফ)

হযরত উমর (রা.)-এর আরো অনেক ফাজায়িল, মর্যাদা এবং বৈশিষ্ট্যের কারণে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের ইজমা ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বিতীয় খলিফা নিযুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে,

كَانَ اِسْلَامُهٗ فَتْحًا وَكَانَتْ هِجْرَتُهٗ نُصْرَةً وَكَانَتْ خِلَافَتُهٗ رَحْمَةً.

"হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ করা (ইসলামের) বিজয় ছিলো, আর তাঁর হিজরত করাটা ইসলামের সাহায্য ছিলো এবং তাঁর খেলাফত মাখলুকের জন্য রহমত ছিলো। ওপরযুক্ত হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পর উমর (রা.)-কে খলিফা নিযুক্ত করা সঠিক হয়েছে। সুতরাং তাঁকে মান্য ও শ্রদ্ধা করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)

ثُمَّ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর পর হযরত উসমান (রা.)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় খলিফা স্বীকার করেন এবং মান্য করেন। কেনোনা, হযরত উসমান জিন্নূরাইন (রা.) আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খুবই মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যেমন বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কালবী বলেন, তাবুক যুদ্ধ উপলক্ষ্যে যখন হযরত উসমান (রা.) সর্বাধিক মাল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, প্রভু আমি উসমানের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। অতঃপর সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"যারা নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অতঃপর কৃপা প্রকাশ করে এবং ক্লেশ দিয়ে এর পিছু লয় না, তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রতিদান রয়েছে। তাঁদের ওপর কোনো ভয়-ভীতি নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে বলেছেন,

لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيْقِيْ فِيْهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ.

"জান্নাতে প্রত্যেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বন্ধু বা সঙ্গী থাকবেন, আর সেখানে আমার বন্ধু বা সঙ্গী থাকবেন উসমান ইবনে আফফান (রা.)।" (তিরমিযী শরিফ)

(**নোট :** হযরত উসমান ও মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে তাদের সম্পর্কে আমার লিখিত "সত্যের সন্ধান" নামক বইখানা পাঠ করুন।

আর হযরত উসমান (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করেই দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.)-এর পর সমস্ত সাহাবা (রা.)-এর পরামর্শ ও ঐক্যমতের মাধ্যমে হযরত উসমান (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় খলিফা নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং তাকে তৃতীয় খলিফা মেনে নেয়া ও স্বীকার প্রত্যেক মুমিনের জন্য কর্তব্য।

চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)

ثُمَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর পর হযরত আলী (রা.)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চতুর্থ খলিফা মানেন এবং স্বীকার করেন। যেহেতু তিনি সত্য খলিফা ছিলেন। হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে সা'দ ইবনে আবী ওক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.)কে বলেছিলেন :

اَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هٰرُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلَّا اَنَّهٗ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ. (متفق عليه)

"তুমি আমার কাছে ওই মর্যাদার অধিকারী, মূসা (আ.)-এর কাছে হারুন (আ.) যে মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তবে জেনে রেখো, আমার পরে আর কোনো নবী নেই।" (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.) তুর পাহাড়ে যাওয়ার সময় হযরত হারুন (আ.)কে তাঁর খলিফা হিসেবে গিয়েছিলেন। আমিও জেহাদে যাওয়ার সময় তোমাকে মদীনায় আমার খলিফা হিসেবে রেখে যাচ্ছি।

নোট : ওপরযুক্ত হাদিসের ভিত্তিতে শিয়ারা হযরত আলী (রা.)কে সর্বপ্রথম ও প্রধান খলিফা মনে করে। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.)কে পরিপূর্ণ খলিফা বানাননি; বরং উপস্থিত সময়ের জন্য সাধারণ খলিফা বানিয়েছিলেন। যেহেতু হযরত আব্দুল্লাহ

ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)কে নামাজের ইমামতীর খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। সুতরাং শিয়াদের এ দাবি একেবারে অনর্থক। তবে এই হাদিসে হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা ফোটে উঠেছে।

لَايُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَايَبْغَضُهُ مُؤْمِنٌ رواه احمد والترمذى.

"মুনাফিকরা আলী (রা.)কে ভালোবাসবে না। আর মুমিনরা আলী (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না। (আহমদ ও তিরমিযী শরিফ)

ওপরযুক্ত হাদিসদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা রাখা এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করা এবং তাঁর খেলাফত মেনে নেয়া ও স্বীকার করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য কর্তব্য।

وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ وَالْاَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّوْنَ.

অর্থা, (১) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) (২) হযরত উমর ফারুক (রা.) (৩) হযরত উসমান জিন্নুরাইন (রা.) (৪) হযরত আলী (রা.) উক্ত চার খলিফাকে "খোলায়ে রাশেদিন" আল-মাহদিয়ীন অর্থাৎ, সঠিক পথের অনুসারী খলিফা ও হেদায়ত প্রাপ্ত ইমাম বলা হয়। কোনো কোনো মুহাদ্দিছগণ হাসান ইবনে আলী (রা.) কে ও খোলাফোয়ে রাশেদিনের মধ্যে গণ্য করেছেন। তাঁদেরকে "খোলাফায়ে রাশেদিন আল-মাহদিয়িন" উপাধিতে ভূষিত করার কারণ হলো, তাঁরা কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেলাফতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আঞ্জাম দিয়েছিলেন। সেহেতু তাকে "খেলাফত আলা মিনহাজুন্নাবুওয়ত বলা হতো। আর এ কারণেই নবী তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ.

"তোমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য হলো, আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাত যথাযথভাবে পালন করা এবং আকড়িয়ে ধরা।"

অতএব একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, খোলাফায়ে রাশেদিনের খেলাফতকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া এবং তাঁদেরকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত খলিফারূপে বিশ্বাস করে তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাপোষণ করা খাঁটি মুমিনের ঈমানী কর্তব্য।

পক্ষান্তরে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেলো, যারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত উসমান জিননুরাইন (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে থেকে কোনো সাহাবি (রা.)-এর খেলাফতকে অস্বীকার করে

অথবা তাঁদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করে তারা বিভ্রান্তি, ভ্রষ্টতা এবং কুফুরিতে লিপ্ত রয়েছে। যেমন খাওয়ারিজ, শিয়া, রাওয়াফিজ এবং তাঁদের অনুসারিরা।

আশারায়ে মুবাশ্বারাহ সম্পর্কে আকিদা

وَاَنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِيْنَ سَمَّاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلٰى مَاشَهِدَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، وَهُمْ اَبُوْبَكْرٍ (رَضِىَ) وَعُمَرُ (رَضِىَ) وَعُثْمَانُ (رَضِىَ) وَعَلِىٌّ (رَضِىَ) وَطَلْحَةُ (رَضِىَ) وَالزُّبَيْرُ (رَضِىَ) وَسَعْدٌ (رَضِىَ) وَسَعِيْدٌ (رَضِىَ) وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ (رَضِىَ) وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ (رَضِىَ) وَهُوَ اُمَنَاءُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

অনুবাদ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দশজন সাহাবির নাম উল্লেখ করে তাঁদের জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন, আমরা তাঁর এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাঁদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করি। কেনোনা, তাঁর উক্তি সত্য। তাঁরা হলেন আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.), তালহা (রা.), জুবায়ের (রা.), সাদ (রা.), সাঈদ (রা.), আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) তাঁরা হলেন এই উম্মতের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের সবার ওপর সন্তুষ্ট হোন।

وَاَنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِيْنَ سَمَّاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ.

অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ বিশেষভাবে এই দশজন সাহাবি সম্পর্কে জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করেন, যে দশজন সাহাবি সম্পর্কে বিশেষভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বা সংবাদ দ্রুব-সত্য, এতে সন্দেহের কোনো লেশ মাত্র নেই। এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য। একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দশজন সাহাবিকে সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন,

اَبُوْبَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ. (رواه الترمذى)

"আবু বকর জান্নাতে, উমর জান্নাতে, উসমান জান্নাতে, আলী জান্নাতে, তালহা জান্নাতে, জুবায়র জান্নাতে, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতে, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস জান্নাতে, সায়ীদ ইবনে যায়েদ জান্নাতে এবং আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ জান্নাতে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

নোট : একথা মনে করা অত্যধিক ভুল হবে, শুধু এই দশজন সাহাবিই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত, অন্য কোনো সাহাবির জন্য এই সুসংবাদ নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে সমষ্টিগতভাবে সমস্ত সাহাবা (রা.) সম্পর্কে জান্নাতের অঙ্গিকার করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলেছেন, وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى "আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সাহাবিগণের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।" কিন্তু এই দশজন সাহাবি (রা.)-এর মর্যাদা সমস্ত উম্মতের সামনে বিশেষভাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁদের নাম ধরে জান্নাতের সুবসংবাদ দিয়েছেন। আর এই সুসংবাদটি একই মজলিসে প্রকাশ করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে নয়, এই দশজন ব্যতীত আর কেউ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত নন।

সাহাবা সম্পর্কে মন্দ মন্তব্য করা যাবে না

وَمَنْ اَحْسَنَ الْقَوْلَ فِىْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِيْنَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ، وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْخَيْرِ وَالْاَثَرِ وَاَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُوْنَ اِلَّا بِالْجَمِيْلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوْءٍ فَهُوَ عَلٰى غَيْرِ السَّبِيْلِ.

অনুবাদ : আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রা.), নিষ্কলুষ সহধর্মিণী ও পূত-পবিত্র নির্মল সন্তানগণ সম্পর্কে উত্তম-শুভ মন্তব্য করলো, সে নেফাক-মুনাফিকী থেকে বিমুক্ত হলো। প্রথম যুগের

সালফে সালেহিন ও তাঁদের সঠিক অনুসারী পরবর্তীকালের আলিমগণ যাঁরা হলেন কল্যাণ ও ঐতিহ্যের প্রতীক এবং ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী, চিন্তাবিদ, যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা করতে হয়। আর যে তাঁদের সম্পর্কে কটুক্তি বা বিরূপ মন্তব্য করে সে ভ্রান্ত পথের অনুসারী।

وَمَنْ اَحْسَنَ الْقَوْلَ فِىْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الخ.

অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ বলেন, যে ব্যক্তি বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রা.) এবং তাঁর নিষ্কলুষ সহধর্মিণী ও পূত-পবিত্র নির্মল সন্তান-সন্তুতী সম্পর্কে সুধারণা রেখে, তাঁদের শুভ আলোচনা করবে, সে নিঃসন্দেহে নেফাক-মুনাফিকী থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ পবিত্র কোরআন-সুন্নায় বিভিন্নভাবে সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়েছে। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত উম্মতকে তাঁর সাহাবা সম্পর্কে অশুভ আলোচনা করতে নিষেধ করেছেন, যেমন তিরমিযী শরিফের একটি হাদিসে বলেছেন,

اَللهَ اَللهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَاتَتَّخِذُوْاهُمْ غَرَضًامِنْ بَعْدِىْ.

"আমার সাহাবা (রা.) সম্পর্কে মন্তব্য করার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় করো। আমার ইন্তেকালের পর তাদের সমালোচনার লক্ষ্য বস্তু বানাবে না।"

তাই সত্যিকারের মুমিনদের জন্য কর্তব্য হলো, আল্লাহর কোরআনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ ও নিষেধকে যথাযথভাবে পালন করা। সুতরাং যারা সাহাবা (রা.) সম্পর্কে সুধারণা রেখে তাঁদের শুভ ও গুণ আলোচনা করবে, তারা নেফাক-মুনাফিকী থেকে মুক্তি পাবে। পক্ষান্তরে যারা সাহাবা (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কীয় আয়াত এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের প্রতি তোয়াক্কা না করে সাহাবা (রা.) সম্পর্কে অশুভ মন্তব্য, মন্দ আলোচনা করবে, তারা নেফাক ও মুনাফেকীর পরিচয় দেবে। কারণ তাদের এ কাজ একথার প্রমাণ দিচ্ছে, তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর হাদিস বিশ্বাস করেনি। সেহেতু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তাদের সত্যিকারের মুমিন গণ্য করেননি।

وَاَزْوَاجُهُ الطَّاهِرَاتُ الخ : অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুন্যত্মা, নিষ্কলুষ সহধর্মিণী পূত-পবিত্র নির্মল সন্তান-সন্তুতিগণ সম্পর্কে সুধারণা রেখে তাঁদের শুভ ও গুণ আলোচনা করবে, সে নেফাক ও মুনাফিকী থেকে মুক্তি পাবে এবং মুক্ত থাকবে। কারণ নবী করিম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَحِبُّوْا أَهْلَ بَيْتِيْ لِحُبِّيْ আমার সঙ্গে ভালোবাসা থাকার কারণে আমার আহলে বাইত সহধর্মিণী সন্তান-সন্তুতীগণকে ভালোবাস। (তিরমিযী শরিফ)

ওপরযুক্ত হাদিসে আহলে বাইত বলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুন্যত্মা ও নিষ্কলুষ সহধর্মিণী এবং পূত-পবিত্র ও নির্মল সন্তান-সন্তুতি হযরত ফাতেমা, হাসান, হুসাইন এবং আলী (রা.)কে বোঝানো হয়েছে। মুসলিম শরিফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ি থেকে বাইরে তাশরিফ নিয়ে যাচ্ছেন। সে সময় তিনি কালো একটি রুমী চাদর চড়ানো ছিলেন। এমন সময় তিনি সেখানে হযরত হাসান, হুসাইন, ফাতেমা ও আলী (রা.)-এর সবাইকে চাদরের ভেতর লুকিয়ে নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন :

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

"আল্লাহ তায়ালা কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের পূত-পবিত্র রাখতে, হে আহলে বাইত।"

কোনো বর্ণনায় আছে, এ আয়াত তেলাওয়াত করার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِيْ.

"হে আল্লাহ, এরাই আমার আহলে বাইত।"

অতএব কোরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামের অনুসারী হওয়ার দাবিদার হয়ে যারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইত সম্পর্কে কুধারণা রাখে অথবা অশুভ মন্তব্য করে, তারা মুনাফিক বলে গণ্য হবে। যেহেতু তারা কর্মক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহ অমান্য করেছে। যেমন খাওয়ারিজরা।

পক্ষান্তরে যারা আহলে বাইতের মুহব্বত ও ভালোবাসার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করে অন্যান্য সাহাবা (রা.)সহ সমস্ত সাহাবা (রা.) সম্পর্ক অশুভ মন্তব্য, সমালোচনা ও গালমন্দ করে তারাও মুনাফিক বলে গণ্য হবে। কারণ তারা আহলে বাইত ব্যতীত বাকী সমস্ত সাহাবা (রা.) সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদিস সমূহের প্রতি তোয়াক্কা করেনি। যেমন রাওয়াফিজ ও শিয়া সম্প্রদায়।

وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ الصَّالِحِيْنَ السَّابِقِيْنَ الخ

অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানের জন্য কর্তব্য হলো, প্রথম যুগের সলফে সালেহিন এবং তাঁদের অনুসারী পরবর্তীকালের

আলিমগণ, যারা হলেন কোরআন, হাদিসে-বিশারদ, ধর্মজ্ঞানে পারদর্শী চিন্তাবিদ, তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করা। যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

خَيْرُ أُمَّتِيْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ (متفق عليه)

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আমার যুগের উম্মত। অতঃপর যারা এদের সঙ্গে মিলিত হয়, অতঃপর যারা এদের সঙ্গে মিলিত হন।"

(বুখারী ও মুসলিম)

ওপরযুক্ত হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা, তাবেয়িন ও তাবে তাবেয়িন (তিন) যুগের শ্রেষ্ঠত্বের সুসংবাদ দিয়েছেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম ও আম্বিয়ায়ে মুজতাহিদিন ও মুহাদ্দিসিন ও মুফাসসিরিন শামিল রয়েছেন। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী দু'যুগের আইম্মায়ে মুজতাহিদিন ও মুহাদ্দিসিন সম্পর্কে অশুভ মন্তব্য বা সমালোচনা করা যাবে না এবং সর্বযুগের হাক্কানি উলামায়ে কেরাম অর্থাৎ, হাদিস্ বিশারদ, ফেকাহবিদ, তাফসিরবিদ ও সত্যিকারের ইসলামি চিন্তাবিদগণের গুণ আলোচনা করা এবং তাদের অশুভ আলোচনা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ.

"নিশ্চয় আলিমগণ আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণের উত্তরাধিকারী।"

(আবু দাউদ শরিফ)

অন্য হাদিসে বলেছেন,

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ.

"একজন ফকীহ্ শয়তানের কাছে হাজার আবিদের চেয়ে (ভারী) কঠিন।"

ওপরযুক্ত হাদিসদ্বয় এবং আরো অনেক হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, সত্যিকারের প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ওয়াজিব হলো, সর্বযুগের হাক্কানি আলিমগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তাদের গুণ ও শুভ আলোচনা করা।

وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوْءٍ فَهُمْ عَلٰى غَيْرِ السَّبِيْلِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আম্বিয়া, সাহাবা, তাবেয়িন, তাবে তাবেয়িন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন তথা হাক্কানি উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য বা সমালোচনা করবে, সে সঠিক পথ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

আল্লাহর ওলিদের সম্পর্কে আকিদা এবং নবী ও ওলির মধ্যে পার্থক্য

وَلَا نُفَضِّلُ اَحَدًا مِنَ الْاَ وْلِيَاءِ عَلٰى اَحَدٍ مِنَ الْاَ نْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَنَقُوْلُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ اَفْضَلُ مِنْ جَمِيْعِ الْاَ وْلِيَاءِ وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ.

অনুবাদ : আর আমরা কোনো এক ওলিকে কোনো একজন নবীর (আ.) ওপর প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি না। বরং আমরা বলি, কোনো একজন নবী সমস্ত ওলি থেকেও শ্রেষ্ঠ। আমরা তাদের কেরামত বা অলৌকিক ঘটনাবলী এবং বিশ্বস্ত লোকদের মাধ্যমে পরিবেশিত তাদের বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলো বিশ্বাস করি।

وَلَا نُفَضِّلُ اَحَدًا مِنَ الْاَوْلِيَاءِ عَلَى الْاَ نْبِيَاءِ الخ.

অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ আল্লাহর কোনো ওলিকে আল্লাহর কোনো নবী (আ.)-এর ওপর প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন না এবং তারা বলেন, আল্লাহর কোনো একজন নবী সমস্ত ওলিগণের চেয়ে অত্যধিক শ্রেষ্ঠ। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে :

প্রথমতঃ আল্লাহর নবীগণ নবুওতের আগে এবং পরে নিষ্পাপ থাকেন। তাঁদের থেকে কোনো ধরনের গুনাহ সংঘটিত হয় না এবং হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে ওলিগণ ওলায়তের আগে এবং পরে নিষ্পাপ হন না। বরং গুনাহগার লোকও কোনো সময় ওলি হতে পারে এবং ওলি থেকেও কোনো ধরনের গুনাহ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর একথা সর্বজন মান্য, নিষ্পাপ ব্যক্তি, পাপীর চেয়ে অত্যধিক শ্রেষ্ঠ, অতএব নবীগণ (আ.) ওলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয়তঃ নবুওত-রেসালত কোনো মানুষ তার চেষ্টা, সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে না; বরং আল্লাহ তায়ালা নিজেই নবী ও রাসূল মনোনীত নির্বাচিত করেন। পক্ষান্তরে ওলায়ত বা ওলি হওয়া মানুষ তাঁর চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। আল্লাহর মনোনিত ও নির্বাচিত পদবি ও উপাধি, মানুষের চেষ্টা সাধনায় অর্জিত পদবি ও উপাধি। থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হয়ে থাকে। অতএব একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, নবী রাসূল (আ.)গণ ওলিদের থেকে শ্রেষ্ঠ।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর নবী, রাসূল (আ.) গণের অনুসরণ ও অনুকরণ করা উম্মতের ওপর ওয়াজিব। নবীর (আ.) ইত্তেবা-অনুসরণ ও অনুকরণ ছাড়া

কোনো উম্মত নাজাত পাবে না। পক্ষান্তরে কোনো ওলির ইত্তেবা-অনুসরণ ও অনুকরণ করা মুসলমানের ওপর ওয়াজিব নয় এবং এর ওপর কোনো মুসলমানের নাজাতের ভিত্তিও নয়। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত সত্য, যার অনুসরণ ও অনুকরণের ওপর মানুষের নাজাতের ভিত্তি, তিনি শ্রেষ্ঠ হলেন, ওই ব্যক্তি থেকে যাদের অনুসরণ ও অনুকরণের ওপর কোনো মানুষের নাজাতের ভিত্তি নয়। অতএব এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেলো, নবীগণ (আ.) ওলিদের থেকে শ্রেষ্ঠ।

ওলিদের কেরামত সম্পর্কে আকিদা

وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنَ الْكَرَامَاتِ الخ.

অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ আল্লাহর ওলিগণ থেকে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাবলীকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন। যেহেতু ওলিগণের কেরামত বা অলৌকিক ঘটনাবলীর কথা পবিত্র কোরআন-সুন্নায় বিদ্যমান আছে এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তাওয়াতুরের পদ্ধতিতে নকল হয়ে আসছে। এগুলো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। যেমন পবিত্র কোরআনে কোরআনে উল্লেখ রয়েছে, হযরত সুলাইমান (আ.)-এর এক সাহাবি "আছিফ রবখিয়া" চক্ষুর পলকের মধ্যে বিলকিছ রাণীর সিংহাসন এক মাসের দূরত্ব থেকে সুলাইমান (আ.)-এর কাছে পৌঁছিয়ে ছিলেন। আর হযরত মারইয়ামকে অমৌসুমের ফল আহারের জন্য দেয়া হতো। প্রশ্নকারীর জবাবে তিনি বলতেন, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে। হযরত উমর (রা.)-এর চিঠির মাধ্যমে নীল নদে পানি প্রবাহিত হওয়া। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) ষাট হাজার মুজাহিদ নিয়ে দিজলা নদী পার হওয়ার সময়ে নদীটি স্থল পথের মতো হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে। সেহেতু এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা সত্যিকারের মুমিনগণের জন্য একান্ত কর্তব্য। পক্ষান্তরে মু'তাযেলিরা ওলিগণের কেরামত অস্বীকার করে। তাদের পক্ষে বাস্তবে কোনো দলীল প্রমাণ নেই। তাদের এ অস্বীকৃতি কোরআন-সুন্নাহ ও বাস্তবতার পরিপন্থী, যেহেতু তাদের এ অস্বীকৃতি কোরআন-সুন্নাহ ও বাস্তবতার পরিপন্থী সেহেতু তাদের একথা পরিত্যক্ত, গ্রহণ যোগ্য নয়। প্রশ্ন হতে পারে ওলি কে এবং কেরামত কি?

জবাব : ওলি, শব্দের অর্থ নিকটবর্তীও হওয়া এবং বন্ধুও হওয়া। আর শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ, আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসায় এমনভাবে ডুবে

যাওয়া, পৃথিবীতে কারো ভালোবাসা এর ওপর প্রবল হয় না। তার মন সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকে। সে যাকে ভালোবাসে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে, যাকে ঘৃণা করে আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করে। আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করেন এবং তার অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে। তাকে আল্লাহর ওলি বলা হয়। আর ওপরযুক্ত গুণের অধিকারী লোকদের হাত থেকে যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকায় পায় তাকে কেরামত বলে।

কোনো ঈমানদার লোকের নবুওতের দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য তার হাত থেকে যে সব অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ হয় তাকে মু'জিযা বলা হয়। আর কোনো অমুসলিমের হাত থেকে কোনো অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হওয়াকে 'ইস্তে দরাজ' বলা হয়।

আর যে ব্যক্তি গোপন বিষয়াদির মাধ্যমে অলৌকিক কোনো কিছু করে ফেলে আর সে বলে, এগুলো আমার ক্ষমতায় করেছি আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। তাকে যাদু বলা হয়।

وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানগণ আল্লাহর ওলিগণের এই সব বর্ণনাগুলো বিশ্বাস করেন, যা বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য সূত্রে নকল হয়ে তাদের কাছে পৌঁছছে। কারণ পবিত্র কোরআন-সুন্নায় আল্লাহর ওলিগণ এবং তাঁদের থেকে অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে এবং আকাইদের কেতাবেও এ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং ওলিগণের কেরামত সম্পর্কীয় ঘটনাবলী অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই।

কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে আকিদা

وَنُؤْمِنُ بِاَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ وَنُزُوْلِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ وَخُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَنُؤْمِنُ بِطُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوْجِ دَابَّةِ الْاَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا.

অনুবাদ : আমরা কেয়ামতের নিদর্শন সমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখি। (১) দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া। (২) আকাশ থেকে ঈসা (আ.)-এর অবতরণ করা। (৩) পশ্চিম আকাশ দিয়ে সূর্যোদয় হওয়া। (৪) ইয়াজুজ মাজুজ নামের একদল

লোক বের হওয়া। (৫) দাব্বাতুল আরদ্ব (জমিনের জীব) নামে এক বিশেষ জন্তুর স্বীয় স্থান থেকে বহির্গত হওয়া।

وَنُؤْمِنُ بِاَشْرَاطِ السَّاعَةِ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ কেয়ামতের নিকটতম পূর্বাংশের প্রতি ঈমান-বিশ্বাস রাখেন। যেহেতু এগুলো পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। সেহেতু এর প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য। যেমন হযরত হুজাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْاقَبْلَهَا عَشَرَ اٰيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُوْلَ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ، وَيَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَثَلٰثَةَ خُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَاٰخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ اِلٰى مَحْشَرِهِمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ فِى الْعَاشِرَةِ وَرِيْحٌ تُلْقِى النَّاسَ فِى الْبَحْرِ.

(رواه مسلم)

"সে পর্যন্ত কেয়ামত হবে না, যে পর্যন্ত তোমরা দশটি নিদর্শন না দেখবে। (১) দুম্র নির্গত হওয়া। (২) দাজ্জাল বের হওয়া। (৩) দাব্বাতুল আরদ্ব- অদ্ভুত একটি জীবের আবির্ভাব হওয়া। (৪) পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হওয়া। (৫) ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-এর অবতরণ করা। (৬) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া। (৭) তিনটি ভূমি ধসার ঘটনা ঘটবে– (ক) পশ্চিমে, (খ) আগে, (গ) আরব উপদ্বীপে। (৮) একটি অগ্নিকুণ্ড ইয়ামান থেকে বের হবে, এমন অবস্থায় সব মানুষকে তাড়িয়ে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে। অন্য বর্ণনায় আছে, (৯) এমন তুফান প্রবাহিত হবে, সব মানুষকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। (মুসলিম শরিফ)

ওপরযুক্ত নিদর্শনগুলো পৃথকভাবে হাদিসের কেতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। সুতরাং এর প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য।

خُرُوْجُ الدَّجَّالِ : দাজ্জাল বের হওয়া সম্পর্কে আলোচনাকালে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَاللهِ لَا يَخْفٰى عَلَيْكُمْ اَنَّ اللهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ وَاَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَمَامِنْ نَبِىٍّ اِلَّا اَنْذَرَ قَوْمَهُ الْاَعْوَرَ الدَّجَّالَ اخ.

"আল্লাহর কসম, তোমাদের কাছে একথা গোপন নয়, আল্লাহ তায়ালা কানা নন। আর নিঃসন্দেহে মাসীহ দাজ্জাল তার ডান চক্ষু কানা, তার চক্ষুটি ফুলা

আঙ্গুরের মতো। অন্য বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক নবী (আ.) গণই স্বীয় সম্প্রদায়কে কানা দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন।" (মুসলিম শরিফ)

نُزُوْلُ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ : ঈসা ইবনে মারইয়াম আসমান থেকে অবতরণ করা সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَيُوْشِكَنَّ اَنَّ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ.

"ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ। অতিসত্বর তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মারইয়াম একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসেবে অবতরণ করবেন।"

خُرُوْجُ يَاْجُوْجَ مَاجُوْجَ : ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْ جُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ.

"যখন ইয়াজুজ মাজুজকে বন্ধন খোলে দেয়া হবে, আর তার প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।"

طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا : কেয়ামতের আগে পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْكَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا.

"যে দিন আপনার পালনকর্তার কোনো নিদর্শন আসবে সে দিন এমন কোনো ব্যক্তির ঈমান ফলপ্রসূ হবে না, যে আগ থেকে ঈমান আনে নি। অথবা স্বীয় ঈমান অনুযায়ী কোনোরূপ সৎকর্ম করেনি।" (সূরা আনআম)

ওপরযুক্ত আয়াতে বোঝা যাচ্ছে, কেয়ামতের কোনো কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর কোনো কাফিরের কিংবা কোনো ফাসেকের তওবা কবুল হবে না। কিন্তু এ নিদর্শন কোন্‌টি? কোরআনে পাক তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে পরিষ্কার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

ثَلٰثٌ اِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْكَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْاَرْضِ. (رواه مسلم)

"তিনটি নিদর্শন যখন বের হবে, তখন এমন কোনো ব্যক্তি ঈমান ফলপ্রসূ

হবে না, যে এর আগে ঈমান আনেনি। কিংবা ঈমান অনুযায়ী কোনো সৎকর্ম করেনি। (১) পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় হওয়া। (২) দাজ্জাল বের হওয়া। (৩) অদ্ভুত জীব বের হওয়া। (মুসলিম শরিফ)

خُرُوْجُ الدَّابَّةِ : কেয়ামতের আগে অদ্ভুত জীব বের হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ.

"যখন প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব বের করবো, সে তাদের সঙ্গে কথা বলবে। دابة শব্দের 'তানবিনে' এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, জন্তুটি অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট হবে। আরো জানা যায়, এই জীবটি সাধারণ জন্তুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মুতাবেক জন্ম গ্রহণ করবে না। বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে।

হাদিস থেকে একথা বোঝা যায়, এর আবির্ভাব কেয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শন সমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে যখন ওপরোল্লেখিত নিদর্শনগুলোকে কেয়ামতের নিকটতম নিদর্শনরূপে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন এগুলোর প্রতি ঈমান তথা বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ঈমানী কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এতে কোনো মুসলমানের দ্বিমত থাকতে পারে না।

গণক, জ্যোতিষ এবং কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী, কোনো কিছুর দাবিদারদের সম্পর্কে আকিদা

وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا وَلَا مَنْ يَدَّعِيْ شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ.

অনুবাদ : আমরা কোনো গণক বা জ্যোতিষকে বিশ্বাস করি না এবং এমন কোনো ব্যক্তিকেও বিশ্বাস করি না, যে আল্লাহর কেতাব, নবীর সুন্নাত ও উম্মতে মুসলিমার ঐক্যমতের বিপরীত কিছু দাবি করে।

নোট : 'কাহেন'– ওই ব্যক্তিকে বলে, যে ভবিষ্যতের গোপনী কোনো কিছুর সংবাদ দেয় এবং গোপন বিষয়াদি জানার দাবি করে।

'আররাফ'– ওই ব্যক্তিকে বলে, যে চোরাই মালের পরিচিতিসহ সন্ধান দিয়ে থাকে এবং হারানো বস্তু প্রাপ্তির স্থান বলে দেয় এ ধরণের আরো অনেক বিষয়াদি। (মিশকাত)

وَلَانُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا وَلَا مَنْ يَدَّعِيْ شَيْئًا. : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ গণক এবং জ্যোতিষকে বিশ্বাস করেন না এবং ওই ব্যক্তিকেও বিশ্বাস করেন না, যে কোরআন-সুন্নাহ এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমতের পরিপন্থী কোনো কিছুর দাবি করে। কারণ, গণক, জ্যোতিষ গোপন ও অদৃশ্য বিষয়াদির সংবাদ দিয়ে থাকে। আর পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছেন,

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللهُ.

"তুমি বলে দাও, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও জমিনের কেউ গাইব বা গোপনীয় কিছু জানে না।" (সূরা নমল)

এ আয়াত প্রমাণ দিচ্ছে, কোনো মানুষ এমনকি নবী (আ.)গণও নিজ ক্ষমতা বা দক্ষতার মাধ্যমে কোনো গাইব বা গোপন কোনো কিছু জানেন না। তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে গাইব বা গোপনের যে সব অদৃশ্যের খবর দিয়েছিলেন, তারা জানেন বা জানতেন।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ اَتٰى عَرَّافًا فَسَئَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلٰوةُ اَرْبَعِيْنَ اليه. (مسلم)

"যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসবে, অতঃপর তাকে কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, তার চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল করা হবে না। (মুসলিম)

অন্য হাদিস বলেছেন,

مَنْ اَتٰى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ اَوْاَتٰى اِمْرَاَتَهُ حَائِضًا اَوْاَتٰى فِيْ دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসবে, অতঃপর এর কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, মাসিক ঋতু অবস্থায় তার স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করবে অথবা পায়খানার রাস্তা দিয়ে সঙ্গম করবে। নিঃসন্দেহে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ দীন থেকে মুক্ত হয়ে গেলো। (ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিসদ্বয় একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ দিচ্ছে, যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতিষের কথা

বিশ্বাস করবে, তার ঈমান ও আমলের মারাত্মক ক্ষতি হবে। অতএব সত্যিকারের মুমিনগণের জন্য উচিত কোনো গণক বা জ্যোতিষের কাছে না যাওয়া এবং তার কথা বিশ্বাস না করা।

وَلَامَنْ يَدَّعِىْ شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ الخ. অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ ওই ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করেন না, যে এমন বিষয়াদির দাবি করে যা পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী। যেমন কেউ দাবি করলো, সে নিঃসন্তান মানুষকে সন্তান-সন্তুতি দিতে পারে অথবা মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারে অথবা সে নবী বলে দাবি করে ইত্যাদি।

ওপরযুক্ত দাবিসমূহের কোনো এক দাবিতে কোনো মুমিন কোনো মানুষকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারে না। যেহেতু এসব দাবি পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী। কারণ কোরআন-সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যমে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, এক আল্লাহ ব্যতীত কোনো নবী, ওলি, গাউছ-কুতুব কেউ অথবা সবাই মিলে কোনো নিঃসন্তান মানুষকে সন্তান দান এবং মৃতকে জীবিত করতে পারবে না এবং একথা প্রমাণিত, শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো নবী নেই এবং কোনো ধরনের নবী আসবে না।

মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত থাকা কর্তব্য, পরস্পর দলাদলি করা বিভ্রান্তি

وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا اَوْ عَذَابًا.

অনুবাদ : আমরা মুসলিম জামাআতকে সত্য ও সঠিক মনে করি এবং এতে বিভেদ ও দলাদলি (সৃষ্টি করা) ভ্রান্ত ও শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য করি।

وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে সব মুসলমান সম্মিলিত থাকাকে সত্য ও সঠিক কর্তব্য বলে বিশ্বাস করেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে সমস্ত মুসলমানকে সম্মিলিত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا.

"তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান)

ওপরযুক্ত আয়াতে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন। অতএব সব মুসলমানের জন্য একতাবদ্ধ থাকা একান্ত কর্তব্য।

وَالْفُرْقَةُ زَيْغًا وَعَذَابًا : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলিকে বক্রতা এবং শাস্তি মনে করেন এবং এর থেকে দূরে থাকেন। কারণ, সত্যিকারের মুসলমানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো পরস্পর সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে থাকা, দলাদলি বা বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না করা। পক্ষান্তরে যারা স্বীয় অন্তরের বক্রতার কারণে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে উম্মতের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা এবং দলাদলি সৃষ্টি করে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে তাদের নিন্দা করেছেন এবং মুসলমানদের তাদের মতো হতে নিষেধ করেছেন,

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ.

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর পরস্পর মতবিরোধ করেছে।" (সূরা আলে-ইমরান)

অন্য আয়াতে বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا، لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ،وَاَمْرُهُمْ اِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.

"নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তায়ালার কাছে সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে।" (সূরা আনআম)

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মতো হয়ো না। তারা আল্লাহর পরিষ্কার নির্দেশ পাওয়ার পর শুধু কুসংস্কার ও কামনা বাসনার অনুসরণ করে ধর্মের মূলনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের মাধ্যমে আজাবে পতিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার অর্থ ধর্মের মূলনীতি সমূহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধোঁকা ও

সন্দেহে লিপ্ত হয়ে ধর্মের কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেয়া অথবা কিছু বিষয় এ থেকে বাদ দেয়া।

প্রশ্ন হতে পারে, আইম্মায়ে মুজতাহেদিনের মধ্যে তো অনেক মতবিরোধ হয়েছে। এতে তারা কি ওপরযুক্ত নির্দেশ অমান্য করেন নি? এবং নিন্দনীয় মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার আওতায় কি পড়েন নি?

উত্তর : প্রথমতঃ আয়াতে যে বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধ থেকে নিষেধ দিয়ে নিন্দা করা হয়েছে তা সে সমস্ত বিরোধ, যা দীনের মূল নীতিতে করা হয় অথবা স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে দীনের শাখা-প্রশাখায় করা হয়। আয়াতে প্রকৃষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি আসার পর বাক্যটিই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেনোনা, দীনের মূলনীতি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। কিছু শাখা প্রশাখাও এমন সুস্পষ্ট হয়ে থাকে, যাতে সার্থপরতা না থাকলে মতবিরোধের অবকাশ নেই। কিন্তু যে সব শাখা-প্রশাখা অস্পষ্ট সে সম্পর্কে কোনো আয়াত বা হাদিস না থাকার কারণে অথবা আয়াত ও হাদিসের বাহ্যিক তায়ারুয বা পরস্পর বিরোধ থাকার কারণে যদি ইজতেহাদে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আয়াতে উল্লেখিত নিন্দার আওতায় পড়ে না।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক মতভেদই নিন্দনীয় নয়; বরং যে মতভেদ প্রবৃত্তির তাড়নার ভিত্তিতে কোরআন-সুন্নাহ থেকে দূরে সরে চিন্তা করা হয়, তা-ই নিন্দনীয়। কিন্তু যদি কোরআনের নির্ধারিত সীমার ভিতরে থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিজের যোগ্যতা ও মেধার আলোকে শাখা-প্রশাখায় মতভেদ করা হয়, তবে সে মতভেদ অস্বাভাবিক নয়, ইসলাম তা নিষেধ করে না। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং ফেকাহবিদ আলিমগণের মধ্যকার মতভেদ ছিলো এমনি ধরনের। আর এমন মতভেদকে রহমত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অবশ্য যদি এসব শাখা বিষয়কেই দীনের মূল সাব্যস্ত করা হয়, তবে তা-ও নিন্দনীয়।

সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহেদিনের মধ্যে যেসব ইজতেহাদি মতবিরোধ রয়েছে সেসবগুলোই কোনো না কোনো পর্যায়ের ওপরযুক্ত আয়াতের সঙ্গে সম্পর্কহীন। অতএব সাহাবায়ে কেরাম ও আয়িম্মায়ে মুজতাহেদিনের মতবিরোধ রহমত ছিলো।

আল্লাহর দীন সম্পর্কে আকিদা

دِيْنُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَاحِدٌ، وَهُوَدِيْنُ الْاِسْلَامِ قَالَ اللهُ تَعَالٰى اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ، وَقَالَ تَعَالٰى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِ، وَالتَّقْصِيْرِ، وَالتَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيْلِ، وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الْاَمْنِ وَالْيَاسِ.

অনুবাদ : আসমান এবং যমীনে সর্বত্রই আল্লাহর দীন এক। আর তা হলো দীনে ইসলাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।" (সূরা আলে ইমরান)

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"এবং আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (সূরা মায়েদা)

এই দীনে ইসলাম অতিরঞ্জন ও সংকোচন, তাশবীহ ও তা'তীল জবর ও কদর এবং নিশ্চিন্ততা ও নৈরাশ্যের মধ্যবর্তী এক ধর্ম।

دِيْنُ اللهِ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَاحِدٌ الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ এই আকিদা বিশ্বাস পোষণ করেন, আসমান এবং জমীনে আদিকাল থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পছন্দনীয় এবং সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত একই ধর্ম যার নাম হলো ইসলাম। কেনোনা, দীনের অর্থ হলো, আনুগত্য স্বীকার করা, অনুগত হওয়া। আর সমস্ত মাখলুক সৃষ্টিগত ও বিধানগতভাবে এই দীনে ইসলামের অনুগত। এই মাখলুক মানুষ, জিন, ফেরেশতা বা অন্য কিছু হউক সবাই এর অনুগত। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ. (سوره ال عمران)

"আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সব্রাই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাঁরই অনুগত হয়েছে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। (সূরা আলে-ইমরান)

دين-দীনের আরেক অর্থ রীতি বা পদ্ধতি। কোরআনের পরিভাষায় দীন সে সব মূলনীতি ও বিধি-বিধানকে বলা হয়, যা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সব নবী (আ.)গণের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে সে দীনই প্রবর্তন করেছেন, যার নির্দেশ ইতিপূর্বে নূহ (আ.) ও অন্যান্য নবীগণকে দেয়া হয়েছিলো।

اِسْلَام-ইসলাম শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর আনুগত্য হওয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক নবী (আ.)-এর যুগে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং তাঁদের আনিত বিধি-বিধানের আনুগত্য করেছেন, তারা সবাই মুসলমান এবং মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিলো এবং তাঁদের ধর্মও ছিলো ইসলাম। এ অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই হযরত নূহ (আ.) বলেছিলেন,

وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"আমাকে মুসলিম হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা ইউনুছ)

এবং ইব্রাহীম (আ.) নিজেকে এবং স্বীয় উম্মতকে উম্মতে মুসলিমা বানানোর দোয়া করেছিলেন,

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ.

আর হযরত ঈসা (আ.)-এর সহচরগণ বলেছিলেন, তুমি সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ । মোটকথা প্রত্যেক নবী (আ.)-এর আমলে তাঁর আনিত দীনই ছিলো দীনে ইসলাম এবং এটাই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম, অন্য কোনো ধর্ম নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ. سورة العمران)

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে কখনো তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" ওপরযুক্ত আয়াতে من (যে

ব্যক্তি) শব্দের উদ্দেশ্য ব্যাপক। তাই এর অর্থ হবে : সর্বকালের, সর্বস্থানের ও সর্ব বিভাগের যে ব্যক্তিই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করবে। সেই ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সুতরাং ইসলামই মানুষের ধর্ম। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা একমাত্র ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ ধর্মরূপে ঘোষণা করেছেন এবং তিনি এর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম। হযরত আদম (আ.)-এর যুগ থেকে সত্য ধর্ম, আল্লাহর নিয়ামতের অবতরণ ও প্রচলন আরম্ভ করা হয়েছিলো এবং প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের অবস্থানুযায়ী এ নেয়ামত থেকে আদম সন্তানদের অংশ দেয়া হচ্ছিলো, আজ যেনো সেই ধর্ম ও নেয়ামত পরিপূর্ণ আকারে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মতকে প্রদান করা হলো।

وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيْرِ অর্থাৎ, এই দীনে ইসলাম, দীনে মুহাম্মদী সম্পূর্ণ মধ্যপন্থী একটি ধর্ম। যাতে মূসা (আ.)-এর দীনের মতো غُلو কঠোরতার ব্যাপারে স্বীমা লঙ্ঘনের কোনো অবকাশ নেই এবং ঈসা (আ.)-এর দীনের মতো تَفْرِيْط নম্রতার ব্যাপারেও সীমা লঙ্ঘনের কোনো অবকাশ নেই। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ "তোমরা দীনের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করো না।" (সূরা নিসা)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ "তোমরা সীমা অতিক্রম করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না।" (সূরা মায়েদা)

وَالتَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيْلِ : অর্থাৎ, ইসলামে আল্লাহর সাদৃশ্য নির্ণয় করা এবং তাঁকে অক্ষম বা অকেজো সাব্যস্ত করার কোনো পথ নেই।

اَلتَّشْبِيْه : সাদৃশ্য নির্ণয় করা, আল্লাহর সঙ্গে কোনো সৃষ্টির অথবা কোনো সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহর সাদৃশ্য প্রতিপাদন বা নির্ণয় করাকে তাশবীহ বলা হয়ে থাকে। যেমন খৃস্টান কর্তৃক ঈসা (আ.)কে আল্লাহর সঙ্গে ইহুদ কর্তৃক উযাইর (আ.)কে আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য করা এবং আল্লাহর কোনো গুণকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা, যারা এই মতে বিশ্বাসী তাদের 'মুশাব্বিহা' বলা হয়।

তাদের এই মতবাদ একেবারে ভ্রান্ত। যেহেতু এটা পবিত্র কোরআনের পরিপন্থী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "আল্লাহর সাদৃশ্য কোনো কিছু নেই।"

اَلتَّعْطِيْلُ : অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার যেসব গুণাবলী পবিত্র কোরআন ও হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত তা অস্বীকার করা । যারা এই অভিমত পোষণ করে তাদের 'মুআত্তিলা' বলা হয়। এরা বাতিলপন্থী, পথভ্রষ্ট। যেহেতু তাদের এই মতামতটি পবিত্র কোরআন-হাদিসের পরিপন্থী। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا : আল্লাহর গুণাবলী সম্পন্ন অনেক নাম রয়েছে, সে সব নামে তোমরা তাঁকে ডাকো।

وَالْجَبْرُ وَالْقَدْرُ : 'জবর' অর্থাৎ, বান্দাকে একেবারে অক্ষম বা বাধ্য মনে করা। 'কদর' অর্থাৎ, বান্দাকে সর্ব বিষয়ের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান মনে করার অবকাশ ইসলামে নেই। বরং ইসলাম একটি মধ্যমপন্থী ধর্ম। অর্থাৎ, বান্দা সম্পূর্ণ অক্ষম নয় এবং সম্পূর্ণ ক্ষমতাবানও নয়। বরং শুধু কাজ সম্পাদন করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করেছেন। এটাই ইসলামের স্বীকৃত আকিদা-বিশ্বাস।

জাবরিয়্যাহ : ওই সম্প্রদায়কে বলা হয়, যারা এ আকিদা রাখে, মানুষ পাথরের মতো অক্ষম নয়, তাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই এবং কর্মক্ষমতা বা কোনো কিছু উপার্জনের শক্তিও নেই। এ সম্প্রদায় ও পথভ্রষ্ট কারণ তাদের এ আকিদা পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ.

"মানুষ সে কাজের জন্যে নেকি পাবে, যা সে স্বেচ্ছায় করে এবং সে কাজের জন্যে শাস্তি ভোগ করবে, যা সে স্বেচ্ছায় করে। ওপরযুক্ত আয়াত জাবরিয়্যাদের আকিদার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়ে গেলো।

কাদরীয়্যাহ : এই সম্প্রদায়কে বলা হয়, যারা এই আকিদা পোষণ করে, বান্দা তার কাজ কর্মের স্রষ্টা, এতে আল্লাহর কোনো হাত নেই এবং তাকদির বলতে কিছুই নেই। এ সম্প্রদায়ও পথভ্রষ্ট কারণ তাদের এ আকিদা পবিত্র কোরআন সুন্নাহর পরিপন্থী। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এবং তোমাদের কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন।"

وَالْاَمْنُ وَالْاِيَاسُ : অর্থাৎ, আল্লাহর আজাব ও গযব থেকে একেবারে নির্ভীক, নিশ্চিন্ত হওয়া, অথবা আল্লাহর রহমত ও দয়া থেকে একেবারে নৈরাশ হওয়ার কোনো স্থান ইসলামে নেই। বরং ইসলাম একটি মধ্যপন্থী ধর্ম হিসেবে তার নির্দেশ হলো এই, প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে আল্লাহর আজাব ও গযবের ভয়-ভীতি রাখা এবং আল্লাহর রহমত ও দয়ার আশা রাখা। কারণ যারা আল্লাহর আজাব ও গযব থেকে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ.

"আল্লাহর তায়ালাড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে।" (সূরা আরাফ)

আর যারা আল্লাহর রহমত থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে যায়, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَلَا تَيْاَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللهِ اِنَّهٗ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ.

"আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ নিরাশ হয় না।" (সূরা ইউসুফ)

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নির্ভীক্যবাদী মুরজীয়্যাদের আকিদা বিভ্রান্তিকর হওয়ার প্রমাণ দিচ্ছে, যারা এ আকিদা পোষণ করে, বান্দার ঈমান থাকা অবস্থায় কোনো ধরনের গুনাহ তার কোনো ক্ষতি সাধন করে না। জান্নাত তার জন্য ওয়াজিব। আর দ্বিতীয় আয়াত সম্পূর্ণ নৈরাশ্যবাদী খাওয়ারিজ ও মুতাজিলাদের আকিদা বিভ্রান্তিকর হওয়ার প্রমাণ দিচ্ছে, যারা এ আকিদা পোষণ করে, কবিরা গুনাহগার বান্দা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে, কোনো দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না। তাকে জাহান্নামে দেয়া আল্লাহর ওপর ওয়াজিব।

সুতরাং এসব আকিদা ইসলাম বহির্ভূত প্রমাণিত হলো। তাই তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বহির্ভুত।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা

فَهٰذَا دِيْنُنَا وَاِعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَنَحْنُ بَرَاءٌ اِلَى اللهِ تَعَالٰى مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِىْ ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ.

অনুবাদ : এই হলো আমাদের দীন ও আমাদের আকিদা-বিশ্বাস যা আমরা প্রকাশ্যে ও অন্তরে পোষণ করি। আর আমরা আল্লাহর কাছে ওইসব লোকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করি, যারা ওপরযুক্ত বিষয়গুলোতে বিরুদ্ধমত পোষণ করে, যাদের কথা আমরা আলোচনা করেছি এবং প্রমাণাদিসহ বর্ণনা করেছি।

فَهٰذَا دِيْنُنَا وَاِعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا الخ : অর্থাৎ, উক্ত কেতাবের প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কোরআন-সুন্নাহর প্রমাণাদির মাধ্যমে যেসব কথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা বলে প্রকাশ করেছি এবং প্রমাণিত করেছি, তা-ই আমাদের দীন এবং আকিদা প্রকাশ্যে এবং আন্তরিকভাবে।

وَنَحْنُ بَرَاءٌ اِلَى اللهِ تَعَالٰى مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِىْ الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরোধী বাতিল সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি আমরা কোরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে আমরা প্রমাণিত করে আলোচনা করছি। কারণ, যারা কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী আকিদা পোষণ করে, তারা জালিম, আর আল্লাহ তায়ালা জালিমদের থেকে দূরে থাকা এবং সম্পর্কচ্ছেদ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

وَلَاتَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ.

"তোমরা জালিমদের সঙ্গে মিশবে না, (নতুবা) তখন জাহান্নাম তোমাদের স্পর্শ করবে"

পক্ষান্তরে নেককার, সত্যবাদিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ.

"হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর তোমরা সত্যবাদিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, সত্যিকারের মুমিনগণের জন্য কর্তব্য হলো সব বাতিল দলসমূহ থেকে দূরে থাকা এবং সত্যবাদিদের অন্তর্ভুক্ত হও।

সত্যের ওপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা কর্তব্য

وَنَسْئَلُ اللهَ تَعَالٰى اَنْ يُّثَبِّتَنَا عَلَى الْاِيْمَانِ وَيَخْتِمَ لَنَابِهٖ وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْاَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْاَرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِيَّةِ مِثْلُ الْمُشَبِّهَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدْرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الَّذِيْنَ خَالَفُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَحَالَفُوا الضَّلَالَةَ وَنَحْنُ بَرَاءٌ مِنْهُمْ وَهُمْ عِنْدَنَا ضَلَالٌ وَاَرْدِيَاءٌ وَبِاللهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيْقُ.

অনুবাদ : আর আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে এই প্রার্থনা করি, তিনি যেনো আমাদের ঈমানের ওপর অটল রাখেন এবং এরই ওপর আমাদের মৃত্যুদান করেন। আর তিনি যেনো আমাদের বিভিন্ন প্রবৃত্তিমূলক বিভেদ সৃষ্টিকারী ও বিভ্রান্তিকর মতবাদ থেকে রক্ষা করেন। যেমন মুশাব্বিহা, মু'তাজিলা, জাহমিয়াহ, জাবরিয়্যাহ কাদরীয়া ইত্যাদি ভ্রান্তদলগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরোধিতা করে ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ রয়েছে। তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ আমাদের দৃষ্টিতে তারা ভ্রান্ত ও নিকৃষ্ট। আল্লাহর কাছে সর্বাধিক নিরাপত্তা ও তাওফিক প্রার্থনা করি।

وَنَسْئَلُ اللهَ اَنْ يُّثَبِّتَنَا عَلَى الْاِيْمَانِ الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করে থাকেন, আল্লাহ তায়ালা যেনো তাদের ঈমানের ওপর সর্বদা অটল রাখেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দান করেন। যেহেতু তাদের একমাত্র ভরসার স্থল আল্লাহ সত্তা, তাদের নিজের ওপর কোনো ভরসা নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে তাঁর পুণ্যবান বান্দাদের একটি দোয়া শিখিয়েছেন :

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

"হে আমাদের পালনকর্তা সরলপথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত করো না এবং তোমার কাছে থেকে আমাদের রহমত ও অনুগ্রহ দান করুন। তুমিই সব কিছুর দাতা।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোনো দিন নেই। যা আল্লাহর দুই অঙ্গুলির মধ্যখানে নয়। তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, তাকে সৎপথে রাখেন এবং যখন ইচ্ছা করেন সৎপথে থেকে বিচ্যুত করে দেন। তিনি যথেচ্ছা ক্ষমতাশীল, যা ইচ্ছা তা-ই করেন। কাজেই যারা ধর্মের পথে কায়িম

থাকতে চায়, তারা সর্বদাই আল্লাহর কাছে অধিকতর দৃঢ়চিত্ততা প্রদানের জন্যে দোয়া করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রায়ই এই দোয়া করতেন, يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ "হে অন্তর আবর্তনকারী, আমাদের অন্তরকে তোমার দীনের ওপর দৃঢ় রাখো।" (মাআরিফুল কোরআন)

وَيَعْصِمُنَا مِنَ الْاَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ الخ : আর সত্যিকারের মুমিনগণ আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেন, আমাদের বিভিন্ন প্রবৃত্তিমূলক বিভেদ সৃষ্টিকারী বিভ্রান্তিকর মতবাদ থেকে রক্ষা করুন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের এ ধরনের দোয়া শিক্ষা দিয়ে পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ.

"আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন, যে সমস্ত মানুষের পথ, যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব অবতীর্ণ হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে"।

কেনোনা, সরল-সঠিক পথ ব্যতীত দীন-দুনিয়ার কোনোটিরই উন্নতি ও সাফল্য সম্ভব নয়। সুতরাং সরল পথ কোন্‌টি এবং ভ্রান্ত পথ কোন্‌টি তা জেনে নেয়া ও পরিচয় করা কর্তব্য। সরল পথের পরিচয় হলো এই, صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এই সমস্ত লোকদের পথ যাদের আপনি পুরস্কৃত করেছেন। তারা হচ্ছেন :

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ.

নবীগণ (আ.), সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও পুণ্যবান মুমিনগণ। সুতরাং ওপরযুক্ত চার স্তরের মানুষের পথই সরলপথের সীমারেখা। বলা হয়েছে, পরে শেষ আয়াতে নেতিবাচক ব্যবহার করে এর সমর্থন করা হয়েছে।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ.

তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গযব অবতীর্ণ হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (এ হলো আয়াতের শাব্দিক অর্থ) এ আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই, আমরা সেপথ চাই না, যা নফসানি (প্রবৃত্তি) উদ্দেশ্যের অনুগত হয় এবং

মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে ও ধর্মের মধ্যে সীমা লঙ্ঘনের প্রতি প্ররোচিত করে। সে পথও চাই না, যে পথ অজ্ঞতা ও মুর্খতার কারণে ধর্মের সীমারেখা অতিক্রম করে, বরং এদুয়ের মধ্যবর্তী সোজা সরল পথ চাই। যার মধ্যে না অতিরঞ্জন আছে, না কম-কছরী, ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, যা নাফরমানি (প্রবৃত্তি) প্রভাব ও সংশয়ের উর্ধ্বে। (মায়ারিফ সংক্ষিপ্ত) ওপরযুক্ত আলোচনার মধ্যে সব বাতিল দল থেকে পরিত্রাণ চাওয়া হয়ে গেছে, পৃথকভাবে এর নাম উল্লেখের প্রয়োজন মনে করি না।

পরিশেষে আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পেশ করা কর্তব্য

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালা আমাদের সায়্যিদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধর ও সমস্ত সাহাবি (রা.) গণের ওপর রহমত ও শান্তি অবতীর্ণ করেন। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক।

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا الخ : অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ তাদের নেক কাজ আরম্ভ ও সমাপ্তি লগ্নে আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করা উত্তম ও বরকতময় মনে করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

"তুমি বল, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি (অবতীর্ণ হউক) তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি।" (সূরা নমল)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"পবিত্র আপনার প্রতিপালকের সত্তা, তিনিই সম্মানিত ও পবিত্র, তা থেকে যা তারা বর্ণনা করে। পয়গাম্বরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্তে। ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতের প্রেক্ষিতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে আল্লাহর নাম এবং রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ, সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।

(রুহুল মায়ানী)

এবং দ্বিতীয় আয়াতের প্রেক্ষিতে মুফাসসিরগণ বলেন, উক্ত আয়াতে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে, মুমিনের জন্য কর্তব্য হচ্ছে তার প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ, ভাষণ ও বৈঠক আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা ও প্রশংসা করে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ সালাম পাঠ করে সমাপ্ত করা হয়।

সে মতে, আল্লামা কুরতুবী এক্ষেত্রে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজ সমাপনান্তে :

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

এই তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করতে একাধিক বার শোনেছি। এছাড়া কতিপয় তাফসির গ্রন্থে এ মর্মে হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কেয়ামতের পূর্ণমাত্রায় পুরস্কার পেতে চায়, তার প্রত্যেক বৈঠক শেষে এই আয়াত তেলাওয়াত করা উচিত। এ উক্তিই ইবনে হাতিম হযরত শাবির বাচনিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

(মাআরিফুল কোরআন ও ইবনে কাছির)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

সমাপ্ত